বিলাত ভ্রমণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত।

প্রকাশক— শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী।

মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১লা মার্চ্চ, ১৯২৯ সাল

মূল্য দুই টাকা মাত্র

প্রিণ্টার — শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

উৎসর্গ

দাদা,

আমার বারো বছর বয়সের কালে তুমি আমাকে বলেছিলে "তোকে বিলেত পাঠাবো।" আমাদের দরিদ্র-জীবনের মধ্যেও তুমি যে শক্তিবলে আমাকে ঐ আশার বাণী দিয়েছিলে, তোমার সে শক্তি এখনো আমাকে ব'লে দেয়—বড় কাজ করবার পক্ষে অর্থসম্পদ তুচ্ছ জিনিস।

দাদা, আমি কোন বড় কাজ করিনি ; তোমার শিক্ষা নিয়ে জীবনের পথে যে-ভাবে চলছি, তারই নিদর্শন এই 'বিলাত-ভ্রমণ' তোমার পারলৌকিক আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ক'রলাম। আশা আছে, সামান্য হলেও অনুজের এ কাজ তোমাকে তৃপ্তি দেবে।

অক্ষয়

ভূমিকা

আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্কুল কলেজের ছেলেরাই বিলাত গিয়ে থাকেন, তাঁরা যান ডিগ্রি আনতে। আর যান বড়লোকেরা, তাঁরা যান স্ফূর্ত্তি করতে। এ ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশ্যে অতি কম লোকেই গিয়ে থাকেন।

আমি পাঁচবার বিলাতে গিয়েছি, তবু আমার যদি সময় থাকত তবে সেখানে গিয়ে আরও দেখতাম, শিখতাম। ছেলেরা অনেকেই সেখান থেকে আসেন ইউনিভারসিটির বিদ্যার একটুকু গলধঃকরণ করে; এর চেয়েও দুঃখের বিষয় যে, কেউ কেউ আসেন একেবারেই 'বিলাত-ফেরতা' হ'য়ে; বিলাতের চাল-চলন পোষাক-পরিচ্ছদের একটা বিকট অনুকরণ তাদের মধ্যে দেখতে পাই মাত্র। ছাত্রদের বিলাত যাওয়ার সম্বন্ধে আরও কথা আছে, ভারতীয় হাই কমিশনার স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বার ডাঃ পরাঞ্জপে এবং বিহারের বর্ত্তমান ত্যাগী নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি এই অভিযোগ জানিয়েছেন যে, প্রায় দু'হাজার ভারতবাসী ছাত্র ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের নানা স্থানে অধ্যয়নার্থ প্রবাস করে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই বা ততোধিক ছাত্রই এ দেশ থেকে নিতান্ত কাঁচা শিক্ষা নিয়ে যায়। এই উপলক্ষে ভারতের এক কোটি টাকা প্রতি বছর ভারত থেকে চলে গিয়ে বিদেশে খরচ হয়। ঐ সব ছেলেরা স্বচ্ছন্দে ভারতের কলেজে পড়েই তাদের Education complete করে যেতে পারে।

অক্ষয়বাবু যখন আমার কাছে বিলাত-যাত্রার প্রস্তাব জানান, তখন

আমি তাঁকে বিলাত-ফেরতা যুবকদের অবস্থার কথা শুনিয়েছিলাম। এঁকে কর্ম্মী বলেও জানতাম, তাই বলেছিলাম, দেশে করবার মত কত কাজ রয়েছে, এসব ছেড়ে আবার সুদূর বিলাত যাবার সখ কেন ? কেবল কতকগুলো ঘরের টাকা পরকে দেওয়া হবে মাত্র।

তারপর তিনি বিলাত থেকে এলে জানলাম, লণ্ডনে বৃটিশ-এম্পায়ার একজিবিশনে তিনি তাঁদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের গহনার একটা ষ্টল করে ছ'মাসের মধ্যে বিশ হাজার টাকা রোজগার করে এনেছেন। তারপর আরও ছ'টি মাস ওদেশের বড় বড় শিল্প-বাণিজ্যের সহরগুলি ঘুরেছেন। এই বৃটিশ-এম্পায়ার একজিবিশনটি দেখা উপলক্ষ করেই তিনি যাত্রা করেছিলেন। আর এ সম্বন্ধে একটা শোনাবার মত কথাও আছে। প্রথমে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তাঁদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের হাতের কাজকর্ম্ম বৃটিশ-এম্পায়ার একজিবিশনে দেখাবার জন্যে সমস্ত যাতায়াত ব্যয় ও উপযুক্ত বেতন দিয়ে তাঁদের একজনকে নেবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু অক্ষয়বাবু এ সুযোগ উপেক্ষা করে নিজে স্বাধীনভাবে সেখানে গিয়ে ষ্টল করলেন। বাঙ্গালীর ছেলের গভর্ণমেণ্ট সাহায্যের প্রলোভন ত্যাগ—শক্তির পরিচায়ক; আর সেই শক্তি কার্য্যকরী হয়েছে তাও তাঁর ঐ একজিবিশনের কার্য্য থেকেই আমরা বুঝতে পারি। অত বড় একটা একজিবিশনে যোগ দেওয়ার ফল মাত্র ঐ বিশ হাজার টাকা উপার্জ্জন নয়; অভিজ্ঞতা লাভের মূল্যটা তার চেয়ে অনেক বেশী।

বাঙ্গালীর ছেলের এই বিলাত যাত্রাকে আমি বিশেষ রকম জয়যাত্রা বলতে চাই। বাঙ্গালী এ কাল পর্য্যন্ত বিলাতে টাকা ঢেলেই আসছে, কিন্তু অক্ষয়বাবু বাঙ্গলার শিল্প দিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসেছেন—এটা বাঙ্গালীর পক্ষে নতুন আদর্শ বটে।

তারপর অক্ষয়বাবুর ভ্রমণের কথা। আমি এই বইখানি পড়ে বুঝলাম,

বেশ একটা খাঁটি রকমের ভ্রমণ। বইখানায় ইংরেজ জাতির বর্ত্তমান Civilizationএর বাহ্যিক চাকচিক্যের কথা বাদ দিয়ে বিলাতের সাধারণ রীতিনীতির কথা লেখা হয়েছে। বিশেষতঃ তার মধ্যে আমাদের দেশের সম্মুখে ধরবার মত বিষয়গুলি বেশী করে ফুটে উঠেছে। এতে বাঙ্গালায় লেখা আর আর বিলাত-ভ্রমণ থেকে এখানা বেশ্ একটু স্বতন্ত্র রকমের হয়েছে। বিলাতের শিল্প-বাণিজ্যের দিকে আমাদের বাঙ্গালীরা কেউ মন দেন না; অক্ষয়বাবু যে সকল কলকারখানা দেখে এসেছেন তার অনেক বিবরণ তাঁর এই পুস্তকে লিখেছেন।

এই পুস্তকে ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতীপণা, পারিবারিক রীতিনীতি, বিলাতের খুটিনাটি ঘটনাবলী, বৃটিশ-এম্পায়ার একজিবিশন প্রভৃতি অংশগুলি খুবই কাজের কথায় পূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

অক্ষয়বাবু নিজে শিল্পী, অথচ সাহিত্যেও তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাই। তাঁর সম্পাদকতায় পরিচালিত 'মাতৃমন্দির' পত্রিকাখানির মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য ও দেশসেবার অনেক পরিচয় পেয়েছি। এই বিলাত-ভ্রমণ বইখানা তাঁর শিল্পবাণিজ্য প্রচার ও দেশ সেবার নিদর্শন। বইখানা দেখে সুখী হয়েছি। দেশের হাওয়া ফিরেছে, এ রকম বইয়ের আদর হবে।

বাঙ্গালীর ছেলে শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করুক, দেশ বিদেশ ঘুরে বাণিজ্য করে দেশের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করুক—এইটাই আমাদের দেশের আজকালকার বড় আদর্শ হোক;— এই-ই চাই।

সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

[কলিকাতা হইতে সুয়েজ খাল]

দ্বিতীয় অধ্যায়

[সুয়েজ হইতে লণ্ডন]

তৃতীয় অধ্যায়

[লণ্ডন সহর]

চতুর্থ অধ্যায়

[লণ্ডনের বিবরণ]

পঞ্চম অধ্যায়

[বৃটিশ-এম্পায়ার-একজিবিশনে]

ষষ্ঠ অধ্যায়

[স্কট্‌লণ্ড্]

সপ্তম অধ্যায়

[আয়র্লণ্ড্]

অষ্টম অধ্যায়

[শিল্প-বাণিজ্যের দেশ]

নবম অধ্যায়

[ওরিয়েন্ট্ লাইনের জাহাজে]

দশম অধ্যায়

আমার অভিজ্ঞতা]

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

[বৃটিশ-এম্পায়ার-একজিবিশন]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

বিলাত ভ্রমণ

প্রথম অধ্যায়

[কলিকাতা হইতে সুয়েজ খাল]

বিলাত যাত্রার সঙ্কল্প

আমাদের দেশের যুবকেরা বিলাতে যান কোন না কোন বিষয় অধ্যয়ন করবার জন্য; কিন্তু আমার বিলাত যাত্রার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, ওদেশের মানব-চরিত্র অধ্যয়নের জন্য। ইয়োরোপ জগতে কেন এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—ইয়োরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি কি গুণে সারা জগতে আধিপত্য বিস্তার করছে—এ প্রশ্নটা আমার বরাবরই একটা বড় সমস্যা হয়ে মনের ভিতর আবদ্ধ ছিল। তাই আমি ঐ দেশগুলির কিছু কিছু দেখে এলাম। ঐ সকল দেশ দেখে এসে, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডের সহর ও পল্লীগুলিতে একটি বৎসর ভ্রমণ করে আমি সেখানকার মানব-চরিত্র যতটুকু অধ্যয়ন করেছি—তার ফলে আমার ঐ সমস্যার সমাধান হয়েছে, আমি তৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু তথাকার মানুষের

উন্নতি-স্পৃহা এবং কার্য্যতৎপরতার সঙ্গে আমাদের দেশের অসাড় জীবনের দিন দিন অধঃপতন বিষয়ক চিন্তা আমার ইয়োরোপ ভ্রমণের তৃপ্তিকে জ্বালা দেয়।

আমি বিলাতের অনুকরণের পক্ষপাতী নই; এমন কি, বিলাতের অনুকরণে আমাদের দেশে যে উচ্চ শিক্ষার ধারা চলেছে এরও পক্ষপাতী নই। কাজেই আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যে দু-একজন যাঁরা বিলাত ভ্রমণ লিখেছেন, তাঁদের লেখা থেকে আমার লেখা একটু স্বতন্ত্র ধরণের হবে। আমি উচ্চশিক্ষার দিকটাকে একেবারে বাদ দিয়ে বিলাতের সাধারণ কথা, নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের খুটি-নাটি কথা যা আমাদের দেশের সাধারণের জানা আবশ্যক বলে মনে করেছি, তারই কিছু কিছু উল্লেখ করব। এ থেকে পাঠক পাঠিকাগণের বিলাতের স্বাভাবিক অবস্থা জানবার কিঞ্চিৎ সুযোগ হবে।

বিলাত যাত্রার ইচ্ছাটা যখন দিন দিনই প্রবল হয়ে উঠছিল, এমন সময় ১৯২৩ সালে লণ্ডন নগরে বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের সূচনা হয়। জগতের সমগ্র ইংরেজাধিকৃত ভূখণ্ড হতে ঐ একজিবিশনে শিল্পবাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় নানা দ্রব্য প্রদর্শনের বিরাট আয়োজন চলছিল। ঐ সময় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাদের ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কসের অলঙ্কার প্রস্তুত প্রণালী প্রদর্শনার্থ একটি কার্য্যকুশল লোক উক্ত প্রদর্শনীতে প্রেরণের জন্য অনুরোধ ক'রে আমাদিগকে পত্র দেন; এবং তার সমুদয় ব্যয় [illegible] উক্ত [illegible] বেতন গবর্ণমেণ্ট দেবেন এ কথাও জানান। কিন্তু সপ্ [illegible] একটু পরিবর্ত্তন করে উত্তরে জানালাম যে অলঙ্কার [illegible] প্রণালী প্রদর্শনের জন্য লোক প্রেরণের সুযোগ হবে না, তবে আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার বিক্রয়ার্থে, আমাদের নিজ ব্যয় [illegible]

তত্ত্বাবধানে ওখানে গিয়ে একটি ষ্টল করতে ইচ্ছা করি। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় আমি নিজে এই উপলক্ষে বিলাত যাওয়া স্থির করলাম।

যাত্রা

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাস হতে এর আয়োজন আরম্ভ হল। পাস্‌পোর্ট বের করা, জাহাজের টিকিট কেনা প্রভৃতির জন্য দুটি মাস কেটে গেল, পরে সিটি লাইনের "City of Exeter" নামক জাহাজে ১৯শে মার্চ্চ তারিখে যাত্রা ক'রে খিদিরপুর ডক থেকে জাহাজে উঠলাম।

১৯শে মার্চ্চ (১৯২৪) তারিখে সন্ধ্যার সময় জাহাজ খিদিরপুর ডক্ থেকে ছেড়ে রাত্রিতে মেটেবুরুজের নিকট থেমে রইল। রাত্রিতে মনে মনে বিলাত যাত্রার সার্থকতার জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করলাম।

২০শে মার্চ্চ সকালে জাহাজ ছেড়ে দিল। ২ টায় সাগরের মুখে গঙ্গার দক্ষিণ পারে মেদিনীপুরের কুলে আট্‌কে রইল। ভাটায় কম জলে জাহাজ চলা অসুবিধাজনক তাই জোয়ারের অপেক্ষা করছিল। নিকটে আরও দু'খানি জাহাজ বাঁধা ছিল, সন্ধ্যায় আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিল, সারা রাত চলতে থাকল। সন্ধ্যা হ'তে না হতেই চাঁদ উঠেছিল। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাগরের মাঝে জাহাজ চলা বেশ চমৎকার নূতন লাগছিল। রাত্রে মাঝে একবার প্রবল বাতাস বয়েছিল।

২১শে মার্চ্চ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম কোন দিকে কুল কিনারা নাই, একবারে গাঢ় নীল জলরাশির মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, জাহাজ খুব বাইরের পথ ধরে চলেছে। ডাইনে উড়িষ্যার কুল কিনারা কিছুই দেখা গেল না। কে জানে কুল থেকে কতদূর দিয়ে চলেছি।

বঙ্গোপসাগর ও জাহাজ

চারদিকে অনন্ত সাগর, উপরে অনন্ত আকাশ, সারাদিন জাহাজ একইভাবে চলছিল। আশ্চর্য্য এই যে, আগে ভেবেছিলাম সমুদ্রের দৃশ্য আর বেশী কি দেখব, একটি দিন দেখলেই দেখার সখ মিটে যাবে, দেখা পুরোণো হয়ে যাবে; কিন্তু কি বলব, সারাদিন দেখলাম, দেখা আর পুরোণো হল না, যত দেখলাম, ততই ভাল লাগলো—বড়ই প্রশান্ত মধুর দৃশ্য।

সমুদ্রের জল সূর্য্যের কিরণের তারতম্যে সকাল, মধ্যাহ্ন, বিকাল এক এক সময় এক এক বর্ণের হয়, সকালে কৃষ্ণ নীল, মধ্যাহ্নে উজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর গাঢ় নীল, বিকালে পাতলা রকমের নীলবর্ণ। আবার আকাশের অবস্থানুসারেও সমুদ্রের দৃশ্যের পরিবর্ত্তন দেখলাম। সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্য্যকিরণসম্পাতে আকাশ সাগর একত্র হয়ে এক মনোমুগ্ধকর লোহিত বর্ণ ধারণ করল। এক এক স্থানের সাগর মনের এক এক রকম অবস্থা এনে দিচ্ছিল। আমরা দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে চললাম, আর দু'টি দিন পরে জাহাজ মান্দ্রাজ বন্দরে পৌঁছবে। তার পর সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত এই একই দিকে, ডানে মান্দ্রাজ প্রদেশ আর বাঁয়ে অনন্ত সাগর দেখে চলতে হবে। আজ সম্ভবতঃ আমরা পুরীর কাছ দিয়ে চলেছি, কিন্তু কোন দিক কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সাগর দেখে দেখেই দিনটা কেটে গেল।

জাহাজখানি বেশ বড়; বারো হাজার টন্ অর্থাৎ সওয়া তিন লক্ষ মণ মাল টানে। সর্ব্ব প্রধান তিন জন কর্ম্মচারীর পদ—কমাণ্ডার, চিফ্-অফিসার, আর সার্জ্জন; তারপর চিফ্-ষ্টুয়ার্ড, পার্সার, মেয়ে-ষ্টু[illegible] পর ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারী আছে। অ[illegible] চলেছি সর্ব্বশুদ্ধ দুই শতের কিছু বেশী—তারমধ্যে বাঙ্গালী আ[illegible]

একজন ছিল ইহুদী, বাকী সব ইংরাজ। ক্যাবিনের ভিতর গরম বলে সারাদিন আমরা সকলেই ডেকের উপর থাকতাম। সাগরের নির্ম্মল স্নিগ্ধ হাওয়ায় ডেকের ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ারে বসে বেশ আনন্দে কাটতো।

২১শে মার্চ্চ শনিবার ভোরে উঠেই আবার চারদিকে সমুদ্র দর্শন। আজ আমরা বঙ্গোপসাগর ছেড়ে ভারত মহাসাগরের সীমায় এসে পড়েছি, রাত্রিদিন একইভাবে জাহাজ চলছে। সুদীর্ঘ এক একটা মৃদু ঢেউসমন্বিত চারদিকের সাগর-দৃশ্য বিন্ধ্যাচলের উপরের উঁচু নীচু পাহাড়ে' জমির মত মনে হচ্ছিল। জাহাজখানি অতি ধীরে দুলছিল। চল্‌তে গেলে গা যেন একটু টুলুটুলু করে। সাহেবরা কেউ কেউ আমাকে ভয় দেখাল— যদি আমরা ঝড়ে পড়ি তখন দেখবে কি অবস্থা হয়। সারা জাহাজে লোকগুলোকে তখন লুটোপাটী খেতে হবে। নীচের ডেকের উপর ৮।১০ হাত উঁচু হয়ে ঢেউ উঠবে। এক ধরণের ছেলে আছে—ভূতের গল্প শুনলে মায়ের কোলে মুখ লুকোয়; আর এক ধরণের ছেলে আছে, ভূতের কথা শুনলে ভূত দেখতে চায়—ভূত দেখবার আশা করে অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে মশানে, তালপুকুরের পাড়ে ঘুরে বেড়ায়। আমি কিন্তু শেষের ধরণের ছেলে। আমি আশা করছিলাম, যদি পথে একটা ঝড়ের মধ্যে পড়ি তবে ভারি মজা দেখতে পাব।

আজ দূরে সাদা সাদা উঁচু বাদামের নৌকার সারির মত চিহ্ন দেখতে পেয়ে মনে ভারি কৌতূহল হল। জাহাজের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, মাদ্রাজ প্রদেশের পাহাড় শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। এগুলি ভিজাগাপটম্ থেকে কোকনদ পর্য্যন্ত স্থান। চার পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই পাহাড় [illegible] আমাদের দৃশ্যের অন্তর্গত থেকে আমাদের আনন্দ দিয়েছিল। জাহাজ [illegible]ন ২৫০ মাইল ক'রে অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০॥০ মাইল বেগে চলছে, [illegible] সকালে আমরা মাদ্রাজ পৌছব।

মান্দ্রাজ বন্দর

২৩শে মার্চ্চ রবিবার ভোরে জেগেই জাহাজে বাঁশী দিতে শুনলাম, উঠে দেখি দূরে কুয়াশার মধ্য দিয়ে মিটি মিটি আলো দেখা যাচ্ছে, বুঝলাম মান্দ্রাজে এসেছি। ক্রমে সকাল হল, দূর থেকে মান্দ্রাজ সহরটি যেন সমুদ্রের উপর ভেসে আছে বলে দেখাচ্ছিল। ক্রমে তীরের দিকে যেতে সহরটী পরিষ্কার হয়ে ফুঠে উঠল। দেখতে দেখতে আমাদের জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে পাথরের প্রাচীরে বেষ্টিত, হারবারের মধ্যে এসে পড়ল। জাহাজ প্রবেশের জন্য এক পার্শ্বে খানিকটা ফাঁক আছে। হারবারটি প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ। উপর দিয়ে রেলগাড়ী সারি সারি রয়েছে। বড় বড় ট্রেণ মাঝে মাঝে সাজানো, ঐ সব ট্রেণের গাড়ী থেকে জাহাজে মাল তোলা হচ্ছে। তীরে মাঝে মাঝে জাহাজ রয়েছে। অল্পক্ষণেই আমাদের জাহাজখানি বন্দরের কূলে বাঁধা হল। শোনা গেল জাহাজ তিনদিন এখানে থেকে মাল তুলবে। এখানকার হারবারটী খুব বড়, উপরেই প্রকাণ্ড হারবার-আপিস, তার উপরে প্রকাণ্ড ঘড়ি রয়েছে। কলিকাতার সময় থেকে মান্দ্রাজের সময় ৩৩ মিনিট স্লো, আমি মান্দ্রাজ টাইমে ঘড়ি মিল করে নিলাম। বেলা ১০ টায় একাকী মান্দ্রাজ সহর দেখতে বের হলাম। বিদেশে বড় সহরে নূতন উপস্থিত হয়ে প্রথমে বড় অসুবিধা বোধ হয়েছিল, এ অসুবিধা অনেকবার ভোগ করেছিলাম। রিক্সা-ওয়ালারা এসে ধরল, রিক্সা নিলাম না। সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তা, তার ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে বড় বড় আপিসগুলির দৃশ্য চমৎকার। আমি সেই রাস্তায় উঠে ট্রাম লাইন দেখতে পেলাম। প্রথমেই ট্রামে না উঠে বরাবর দক্ষিণদিকে রাস্তা ধরে খানিকটা চলতে চলতে লোকের কাছে সহরের বিবরণাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করে নিলাম, রাস্তার উপরেই সারি সারি বড় বড় বাড়ীগুলি—ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক, কাষ্টম হাউস, মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক,

জেনারেল পোষ্টাপিস, রেলওয়ে আপিস, হাইকোর্ট প্রভৃতি পর পর সাজানো, বড়ই চমৎকার দৃশ্য।

মান্দ্রাজ মিউজিয়ম

প্রথমেই মিউজিয়মটি দেখতে গেলাম। সেখানে যা দেখলাম তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করব। মাটীর পাত্রে প্রাচীনকালের কবর, প্রাচীন-কালের ফাঁসির নানা প্রকার যন্ত্র, তার এক একটী যন্ত্র প্রকাণ্ড আকারে খাঁচা করা, লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ বক্ষস্ত্রাণ বহু প্রকার। দাক্ষিণাত্যের নানা জাতীয় ঘর বাড়ী, ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত দেব মূর্ত্তি, পিতলের ঢালাই করা পাত্র ও ছোট ছোট খেলনা, দক্ষিণ ভারতীয় অলঙ্কার প্রাচীনকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত, মহীশুরের চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্য্য, সামুদ্রিক জীবজন্তু বহু প্রকার, কচ্ছপের খোলস, প্রকাণ্ড ঝিনুক, শঙ্খ, কড়ি, শামুক অসংখ্য প্রকারের দেখা গেল। মৎস্য বহু প্রকার, বিশেষতঃ—সাপের মত চিতল মাছ, সাপের মত মাগুর মাছ, অতি অদ্ভুত রকমের টেপা, কাকড়া চিংড়ী এত বড় ও এত রকমের কলকাতার যাদুঘরে নাই। কার্পাস বিভাগ বিশেষ দেখবার বিষয়, নানাজাতীয় কার্পাস, নানা রকমের তাঁতের ফটো, কাপাস বনের ফটো, মেয়েরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চরকা কাটছে তার ফটো, এ সব দেখে এদেশের চরকা কাটা ও কাপড় বোনা সম্বন্ধীয় অনেকটা নিদর্শন পাওয়া গেল। বাঁশের ঝুড়ী, খেজুর পাতার পেটেরা অতি চমৎকার—এসব মেয়েদের হাতের প্রস্তুত। কলকাতার যাদুঘরে যে সকল শস্য রয়েছে তার দ্বারা ভারতের কৃষি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা লাভের আশা নাই। কিন্তু এখানকার মিউজিয়মের ধান, কলাই, ফলমূল, হলুদ, আদা, মসলা এমনভাবে সজ্জিত রয়েছে, যাতে দেখামাত্র কৃষি সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা হয়। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরাদি ও তার কারুকার্য্য

জগতে অতুলনীয়। মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্, ত্রিচিনাপলি, তাঞ্জোর, কুম্বার্করম, চিদাম্বরম্, তিরুভানামলি, মহীশুর, কোকনদ, কঞ্জাভরম প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত মন্দিরগুলির কারুকার্য্যের নমুনা এবং মন্দিরের ফটোগুলি খুব আনন্দের সহিত দেখলাম।

এদিন এই মিউজিয়ম দেখা শেষ করেই জাহাজে ফিরে এলাম। জাহাজে অবিরাম দুইটী ট্রেণের মাল তোলা হচ্ছিল। আমাদের এই জাহাজখানিকে হারবারের তীরে বেঁধে মাল বোঝাই করবার জন্য তিন শত পাউণ্ড অর্থাৎ চারি হাজার টাকার উপর দৈনিক ভাড়া দিতে হচ্ছে। কি ভয়ানক ব্যাপার!

মান্দ্রাজের বিবরণ

পরদিন আহারাদির পর আবার সহর দেখতে গিয়ে ট্রামে করে সহরের পশ্চিমের দিক শেষ পর্য্যন্ত দেখে সন্ধ্যায় জাহাজে ফিরে এলাম। দেখলাম জাহাজের সিঁড়িতে নোটীশ দেওয়া হয়েছে—২৫শে মার্চ্চ সকাল ৮টায় জাহাজ ছাড়বে।

বাংলায় যেমন সহরে মেয়েদের একেবারেই বের হতে নাই, মান্দ্রাজে তেমন নয়, এখানে মেয়েরা বেশ চলে ফিরে বেড়ায়। প্রত্যেক ট্রামের শেষের বেঞ্চখানা মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা। সেই বেঞ্চে লেখা আছে Reserved for Ladies only. কলকাতার তুলনায় মান্দ্রাজে সবই একটু হালকা রকমের, ট্রামগাড়ীগুলি দেখতে কলকাতার মত সুন্দর নয়। দীর্ঘ একখানি করে ট্রাম চলে, দুধারে কাপড়ের পরদায় বেশ শক্ত আঁটা। ট্রামে মেয়েদের রিজার্ভ করা বেঞ্চ দেখে আমার মনে হচ্ছিল—কলকাতার ট্রাম কোম্পানীকে আমাদের মেয়েদের জন্য ফার্ষ্ট ক্লাসের দুইখানি বেঞ্চ

রিজার্ভ করে দিতে অনুরোধ করবো। তাঁরা সহজে না শুনলে এঁর জন্য সংবাদপত্রে লেখালেখি করে কার্য্য সাধনের চেষ্টা পেতে হবে। *

মান্দ্রাজের মেয়ে

জাহাজে এসে দেখলাম একদল মান্দ্রাজী মেয়ে, সঙ্গে একটা পুরুষ, জাহাজে আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসে এসে কয়েকটি যাত্রী মেম সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। তারা সকলেই ইংরাজীতে কথা বলছিল। বোধ হয় আগেই তাদিগকে দেখা করবার জন্য সংবাদ দেওয়া ছিল। মান্দ্রাজী মেয়েরা রঙ্গিন কাপড় পরা। আমার ধারণা ছিল মান্দ্রাজের মেয়েরা বুঝি কাছা দিয়ে কাপড় পরে। কিন্তু দেখলাম তা নয়। কলকাতায় যে সব মেয়েদের আমরা কাছা দিয়ে কাপড় পরা দেখি তারা বোধ হয় বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলের। মান্দ্রাজের মেয়েরা আঁটসাট্ রকমের ভদ্র ধরণে কাপড় পরে। এত যে গরম দেশ তবুও গরীব-মহৎ, ভদ্র-চাষা, ছেলে-বুড়ো সব মেয়েদের গায়ে একটী করে জামা আছে। মেয়েরা বেশ সাদা সিদে ভাবে পুরুষদের সঙ্গে কথা কয়। বয়স্থা মেয়েদের প্রায় সকলেরই দেখলাম চুলের খোপায় ফুল পরা, বেশ টুক্‌টুকে লাল ছোট ফুলগুলি খোপায় তাদের সুন্দর মানিয়েছে। গায়ের রং বাঙ্গালী মেয়েদের চেয়ে একটু কালো, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের চেয়ে মান্দ্রাজী মেয়েরা সকলেই বেশ বলিষ্ঠ ও সুগঠন। মান্দ্রাজে কয়েকটা বড় বড় প্রসূতি-ভবন আছে তার একটা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত। এখানে গরীব স্ত্রীলোকদের সন্তান প্রসব করবার জন্য ভাল বন্দোবস্ত আছে। অবৈধ গর্ভবতী হতভাগিনীরাও অনেকে এখানে স্থান

*. পরে আমাদের মাতৃমন্দিরের পক্ষ হইতে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীকে অনেক লেখালেখির পর কলিকাতার কয়েকটি লাইনে মেয়েদের জন্য পৃথক স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পায়। তাদের গর্ভজাত শিশু সন্তান পালনের ব্যবস্থা আছে। মান্দ্রাজ একটু গরীব দেশ হলেও উড়িষ্যার মত গরীব নয়।

২৫শে মার্চ্চ মঙ্গলবার সকাল ৮টায় জাহাজ ছাড়বে, কাজেই জাহাজের কেউ আর নীচে নাবল না। জাহাজ ছাড়তে ১০টা বেজে গেল। জাহাজ ছাড়া বড় সোজা কথা নয়, কত যে তার শিকল কাছি টানতে হয়, কত যে কলকব্জা আঁটতে হয়—এতটা কাজ মাত্র এই দু'ঘণ্টার মধ্যে করে নেওয়া বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক।

ক্রমে হারবারের বাইরে জাহাজ এল, অসংখ্য জেলে সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে মাছ ধরছিল। পুরীতে মান্দ্রাজী জেলেদের মাছ ধরতে দেখেছি, তারা বিরাট বড় আকারের দড়িজাল টেনে মাছ ধরে কিন্তু এখানে নৌকায় কেউবা কাঠের ডোঙ্গায় সমুদ্রের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরছে দেখা গেল। এখানে মাছের কারবার খুবই বড় রকমের।

মান্দ্রাজ ছেড়ে জাহাজ দূরে গেলে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত সহরটাকে সাগরে ভাসা সহরখানি বলে বোধ হচ্ছিল। তার পর মান্দ্রাজের তীর ভূমিতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় শ্রেণী দেখা দিতে আরম্ভ হল। একটা দু'টা করে ক্রমে বত্রিশটা পাহাড় সাগর তীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে আমাদের চোখে পড়ল। বেলা ২টায় জাহাজ অনন্ত সাগরে মিশে গেল।

জাহাজে অবস্থান

আমাদের জাহাজখানি অনন্ত সাগরের মাঝ দিয়ে চলতে থাকুক, এই অবকাশে জাহাজের ভিতরের আর আর কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি। মান্দ্রাজ থেকে অনেকগুলি সাহেব মেম জাহাজে উঠেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে দু'একটা কথা হতে না হতে কলকাতার প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে তাদের

পারিবারিক সম্বন্ধের মত ভাব হয়ে গেল। জাহাজে কোনরূপ কষ্টই নাই, আহারের বন্দোবস্তও বেশ। সকাল ৭টায় চা আর তার সঙ্গে সামান্য বিস্কুট কলা কমলা প্রভৃতি; ৯টায় রুটী আর ডিম, মাছ মাংসাদি নানা-রকম জিনিষ। দেখলাম জাহাজে বড় বড় ভেট্‌কি মাছ আর ভেড়ার মাংসই প্রধান খাদ্য। বেলা ১টায় ভাত, বিকাল ৪টায় চা, রাত্রি ৯টায় রুটীর সঙ্গে মাছ মাংসাদি। রাত্রি ১০টার পর ঘুমান, ভোর ৬টায় ওঠা। যত প্যাসেঞ্জার তার অর্দ্ধেক পুরুষ, অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক; ছেলে-পিলেও তদনুযায়ী। খাবার সময় ঘণ্টা পড়ে, অমনি সকলে খাবার ঘরে যায়। প্রায় সব জিনিষগুলোই আধা সিদ্ধ রান্না হয়, তার কারণ এই যে এদের স্বাস্থ্যের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য। জিহ্বায় আস্বাদন ভোগ করা এদের আহারের উদ্দেশ্য নয়।

জাহাজে অনেক রকম খেলার বন্দোবস্ত আছে। আমি সে সব খেলার নাম বলতে পারবো না; এই সব খেলার সরঞ্জামগুলিও জাহাজী ধরণের। সেগুলি দড়ি কাছি বালতি দাঁড় বৈঠার মত। সকালে জাহাজের একটী লোক এসে ডেকের উপর খড়ি দিয়ে খেলার ঘর এঁকে রেখে যেত। রোজই খেলার ঘর আঁক্‌তে হত, কারণ জাহাজের ডেকের উপর রোজ সকালে পরিষ্কার করে ধোওয়া হয়। সাহেব মেম সবে মিলেই নানারকম ছুটোছুটী খেলে, ডেকের উপর দৌড়াদৌড়ি করে; খেলবার যথেষ্ট খোলা যায়গা আছে। ছেলেপিলেগুলো সারাদিন দোলায় ছলতো, ছুটোছুটী করতো। কোন গণ্ডগোল নাই, বেয়াদপি নাই, মারামারি নাই। তিন বছরের একটী ছেলে বলছে—আমি বনের বাঘ। অমনি সে হামা-গুড়ি দিয়ে বাঘ হল। বাঘ, বলেই সব ছোট ছোট ছেলেদের তাড়া করল, তারা ছুটে পালাতে আরম্ভ করল, বার বৎসরের একটী ছেলে এসে একটা বড় বসবার মোড়া এনে উঁচু করে বল্‌ল, কেমন বাঘ তুমি দেখব, আমি বাঘ

ধরব—বলেই মোড়া দিয়ে তাকে চেপে ধরল। আমি মনে করলাম এইবার ছেলেটী কেঁদে ফেলবে—কিন্তু খানিকটা সময় মোড়ার নীচেই চাপা পড়ে চুপ করে থেকে, ভয়ঙ্কর রবে হা-লু-ম করে উঠেছে। আমরা সবে হেসে অস্থির; বাঘের জাত বটে।

সন্ধ্যায় নাচের আসর হল। বাজনা আরম্ভ হতেই চারদিক থেকে সবে ছুটে এসে মেয়ে-পুরুষ মুখো-মুখী হয়ে হাত ধরাধরি করে দলে দলে নাচতে আরম্ভ করল। যারা মান্দ্রাজ থেকে উঠেছে, তাদেরও অনেকে নাচে যোগ দিল। কার সঙ্গে কে নাচবে তার কোন নিয়মও বোধ হয় নাই। ধাঁ করে চমৎকার জোড় বেঁধে যায়।

এই রকম ডেকের উপর সাধারণের বসবার ঘরটীতে যখন কেউ একটু বাজনা আরম্ভ করে, আর কথা নাই অমনি ছুটে এসে মেয়ে পুরুষে জোড় বেঁধে নাচতে আরম্ভ করে।

সিংহল দ্বীপ

২৬শে মার্চ্চ বিকালে সিংহলের সমুদ্র-তীরের পাহাড়শ্রেণী অস্পষ্ট রকম দেখা গেল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তেমনই পাহাড়শ্রেণী। মান্দ্রাজ থেকে জাহাজ ছেড়ে আমরা এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে চলছিলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা দূরবীক্ষণ সাহায্যে সিংহলের তীরভূমি দেখে বড় আনন্দলাভ করলাম। দূরে পাহাড়ের শ্রেণী, তীরে বালির চড়া, তার নীচে ভারত মহাসাগরের প্রকাণ্ড ঢেউগুলি সন্ধ্যার সূর্য্য-কিরণে উজ্জ্বল শুভ্র রৌপ্য স্তরের মত দেখা যাচ্ছিল। সম্ভবতঃ আমাদের জাহাজ এখন সাগর তীর থেকে ২০ মাইল দূর দিয়ে চলছে। এ পর্য্যন্ত কলকাতা থেকে বের হয়ে মান্দ্রাজের পথে একবার কোকনদের নিকটে পাহাড় দেখা গিয়েছিল, তার-পর মান্দ্রাজ থেকে ছেড়ে এই সিংহলের পাহাড় দেখা গেল; এছাড়া এ

পর্য্যন্ত কোনখানেই তীরের কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় নি। জলপথে খুব সোজা লাইন ধরে চলে আসছি।

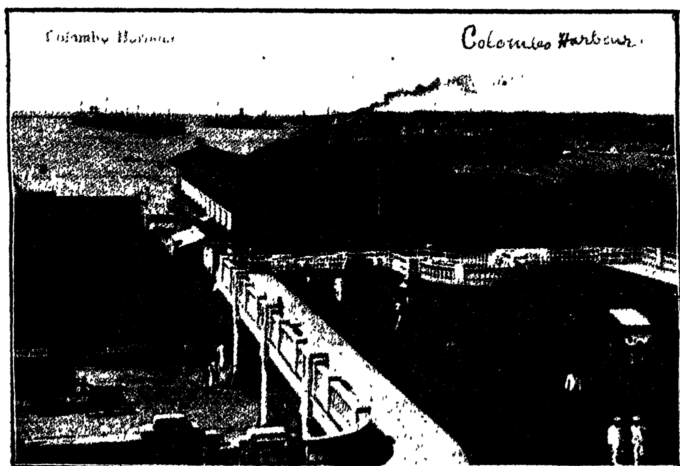
২৭শে মার্চ্চ সকালে উঠে আবার ডানে তেমনই সিংহলের পাহাড়-শ্রেণী দেখতে পেলাম,—তবে এবার একটু নিকটে। দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখলাম, অসংখ্য নারকেল গাছ দেখা যাচ্ছে। গত দিবস সন্ধ্যায়ও নারকেল গাছের শ্রেণীর মত বোধ হয়েছিল কিন্তু বড় অস্পষ্ট ছিল। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত একই ভাবে পাহাড় আর নারকেল গাছ দেখা গেল।

আমাদের জাহাজ দক্ষিণ ছেড়ে ক্রমে পশ্চিম-মুখী হল। বেলা ১১টায় জাহাজ উত্তর-পশ্চিম-মুখী হয়ে চল্‌তে লাগল। বুঝলাম, আমরা সিংহলের বাইর দিক দিয়ে অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিপরীত দিক দিয়ে ভারত মহাসাগর ঘুরে কলম্বো চলেছি। ভারতবর্ষ আমাদের কোন দিকে রইল এবং কলম্বো থেকে ছেড়ে আমরা কোন পথে যাব এই কথা নিয়ে একটা সাহেবের সঙ্গে আমার মতভেদ হল—দেখলাম সাহেবটির ভূগোলের জ্ঞান প্রকৃতই একটু কম, কিন্তু সুখের বিষয় পরে তিনি তাঁর এ ভুল বুঝলেন। পরিচয়ে জানলাম তিনি ঢাকার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এ পর্য্যন্ত এই অনন্তদিকব্যাপী সমুদ্রের মধ্যে আমার একটুও দিক-ভুল হয় নি; মানচিত্রের কথা স্মরণ করে মনে হচ্ছিল যেন পরিচিত পথ ধরেই চলছি।

দিক হারাই নি বলে বড়াই করলাম বটে কিন্তু এরই মাঝে এক দিন চাবির তোড়াটি হারিয়ে বসেছিলাম। কিছু হারিয়ে গেলে ষ্টুয়ার্ডকে বলতে হয়। আমি গিয়ে বলতেই ষ্টুয়ার্ড আমার চাবির তোড়াটী এনে দিল; কে যেন পেয়ে ষ্টুয়ার্ডের কাছে রেখে দিয়েছিল।

কলম্বো হারবার

বেলা ১১টায় কলম্বো সহরের পাশ দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। প্রথমে হারবারের জাহাজগুলির ধোঁয়া, পরে ক্রমে সহরের মন্দিরের চূড়াগুলি ও হারবার মধ্যস্থ জাহাজগুলি দেখা যেতে আরম্ভ হল। আশে পাশে আরও দু'একখানা জাহাজ রয়েছে। আমরা সকলেই দূরবীক্ষণ সাহায্যে আগে থেকে কলম্বো সহর দেখে নিলাম। বেলা ১২টায় কলম্বো-হারবারে জাহাজ প্রবেশ ক'রে ১টায় হারবার মধ্যে বাঁধা হল। তীরে ধরল না, তীরে ধরলে বেশী ভাড়া দিতে হয়। হারবার থেকে সহর অতি নিকটে।



কলম্বো হারবার

দেখলাম কলম্বোর সমুদ্রতীর অতি রমণীয়। যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তেমন ভিন্ন ভিন্ন গঠনের নানা প্রকার সুসজ্জিত সৌধশ্রেণী। হারবার আপিসটি সিংহলের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনে গঠিত। হারবার মধ্যে

নানা দেশীয় জাহাজ রয়েছে। সুন্দর ছোট ছোট মটর-বোট ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছে, নৌকার মাঝিগুলি খুব কালো রংয়ের। আমাদের জাহাজ তীর থেকে দূরে রইল। অনেক নৌকা, মটর-বোট সহরে লোক নেবার জন্য জাহাজের গায়ে এসে লাগল।

সারা দিন এখানে থেকে বহু পরিমাণে নারকেলের খোসার আঁশ আর নারকেল তেল বিলাত পাঠাবার জন্যে জাহাজে বোঝাই করা হল। মান্দ্রাজ থেকে অনেক চিনেবাদাম বোঝাই হয়ে এসেছিল।

সিংহলের বিবরণ

রামায়ণের বর্ণিত লঙ্কার বর্ত্তমান নাম সিংহল দ্বীপ, সুতরাং লঙ্কা নামটি স্মরণ হওয়া মাত্রই সেই স্বর্ণলঙ্কা, সেই প্রবল পরাক্রমশালী রাজা দশানন, সেই রাক্ষসপুরী প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণকে সেই সকল বিষয় জানবার কৌতূহল চরিতার্থ করতে অতি অল্পই সমর্থ হব। এখানকার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যা দেখেছি শুনেছি তারই কিঞ্চিৎ বর্ণন করছি।

ইতিহাসে জানা যায় দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলার সিংহবাহু রাজার পুত্র বিজয়সিংহ নিজের জাহাজে সৈন্যগণ সহ লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হয়ে এখানকার অধিবাসীদিগকে বশীভূত করে নিজের নাম অনুসারে এ স্থানের নাম সিংহল রাখেন। প্রাচীন ইতিহাসে বাংলার পক্ষে ইহা একটি গৌরবের বিষয় ছিল। এর দেড় হাজার বৎসর পরে ক্রমে পোর্টুগিজ ও দিনেমারদিগের অধীনে কয়েক শতাব্দী থেকে প্রায় একশত বৎসর হ'ল ইহা ইংরেজের অধীন হয়েছে। সিংহল আমাদের কলকাতা থেকে বারোশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কলকাতা থেকে জাহাজে কম লোকেই আসে। বর্ত্তমানে রেলপথ সুবিধা। মান্দ্রাজ থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের

নিকটবর্ত্তী ধনুষ্কোট বন্দর পর্য্যন্ত ট্রেণে, পরে জাহাজে সমুদ্র পার হয়ে আসতে হয়।

সিংহল আমাদের বাংলার মতই নদীবৃক্ষপূর্ণ দেশ। কোন কোন স্থান পাহাড় ও জঙ্গলময়। মানুষগুলি রামায়ণের বর্ণিত রাক্ষস-প্রকৃতির



সিংহলে তামিলী রথযাত্রা

নয়, ঠিক আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন। গায়ের বর্ণ বাঙ্গালী অপেক্ষা ঈষৎ কালো। এখানে দু'রকমের ভাষা প্রচলিত—সিংহলী এবং তামিল। ভারতবর্ষের মান্দ্রাজ ও তিতুকরিন অঞ্চল থেকে

বহু হিন্দু গিয়ে সিংহলে অনেক দিন বসবাস ক'রে ওদেশের লোককে তামিল ভাষা শিখিয়েছে এবং তারা এখানকার অধিবাসী হয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে হিন্দু-পূজা পার্ব্বণাদি করে থাকে।

সিংহলবাসীরা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়দিগের অধীনতায় বাস করে অনেকে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হয়ে গিয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের পরিচ্ছদ অতি সাদাসিদে ধরণের। পুরুষেরা সকলেই লুঙ্গি পরে, গায়ে চাদর বা ঢিলে খাটো জামা। মেয়েদের পরণেও এক প্রকার লুঙ্গি, গায়ে আঁটা-সাঁটা জ্যাকেট। পুরুষদের লুঙ্গির নাম সারেঙ্গা আর মেয়েদের লুঙ্গির নাম ক্যাম্বয়। বাংলার পরিচ্ছদ অপেক্ষা সিংহলের পরিচ্ছদ অনুন্নত ধরণের হলেও কাজকর্ম্ম করবার পক্ষে ইহা বাংলার পোষাক অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। এখানে আহারে জাতিভেদ একেবারেই নাই। অধিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিন্ন অনেক মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান আছে; আহারাদির স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জ্ঞান কারও নাই। সকলেই সকলের ছোঁয়া অন্ন জল গ্রহণ করে। ভাত ডাল রুটি খাদ্যাদি প্রায়ই বাংলার মত, তবে এরা অত্যধিক ঝাল খায়। শুটকী মাছের প্রচলন অত্যন্ত বেশী। শুটকী মাছ চূর্ণ করে এক প্রকার মসলা প্রস্তুত করে খায়। রান্নায় নারকেল তেল, গায়ে মাখতেও নারকেল তেল ব্যবহার করে।

সিংহলের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী সমতল ভূমিগুলি নারকেল বৃক্ষে পূর্ণ। অনেক মসলা এখানে উৎপন্ন হয়। বহু হস্তী জঙ্গলে বাস করে। নিম্ন জমিতে ধান্য এবং উচ্চ পাহাড়ে' জমিগুলিতে চা উৎপন্ন হয়ে থাকে। কয়েকটি পার্ব্বত্য অঞ্চল থেকে মূল্যবান জহরৎ প্রস্তর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যবর্ত্তী মান্নার উপসাগর হতে প্রচুর পরিমাণে মুক্তা পাওয়া যায়। এখানে খনিতে কিছু কিছু স্বর্ণও পাওয়া যায়।

রামায়ণে যে একে স্বর্ণলঙ্কা বলা হয়েছে—সে বোধ হয় তখনকার লঙ্কার ঐশ্বর্য্যের কথা মনে করে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশ যেমন ইংরেজ রাজত্বের একান্ত পক্ষপাতী ছিল, সিংহলবাসীরাও তদ্রূপ ইংরেজ-ভক্ত ছিল। বর্ত্তমানে এরা বড় বড় সভাসমিতি গঠন করে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এখানে সাধারণ কথাবার্ত্তা বলবার মত ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন বাংলা দেশ অপেক্ষাও বেশী।

এখানকার এক শ্রেণীর বৃদ্ধেরা দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী। দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের ক্ষ্যাপা বাউলদের মত। যুবকদের বেশ মান্দ্রাজীদের মত। যদিও এই দেশটি খুব বড় নয়, তথাপি ধনশালী লোকের সংখ্যা বাংলা অপেক্ষা বেশী। বাংলার ন্যায় বিলাসিতাও সিংহলী যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

সিংহল বৃটিশগবর্ণমেণ্টের ক্রাউন-কলোনির অন্তর্গত একটি দ্বীপ। ইহার পরিমাণ ২৫৪৮১ বর্গমাইল। জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র। বাংলার অনুপাতে শিক্ষিত ধনীর সংখ্যা বেশী। এখানকার টাকা আমাদের দেশের টাকার মূল্যের তুল্য, কিন্তু পয়সা অপেক্ষাকৃত ছোট ও কম মূল্যের। পয়সার নাম সেণ্ট (Cent), একশত সেণ্টে এক টাকা হয়। দশ সেণ্ট, পঁচিশ সেণ্ট, পঞ্চাশ সেণ্ট মূল্যের রৌপ্য মুদ্রাগুলি যথাক্রমে আমাদের দেশের রূপার দুয়ানি সিকি আধুলির তুল্য। সেণ্ট নামক তামার পয়সাগুলির উপর দেশের প্রধান উৎপন্নের চিহ্নস্বরূপ নারকেল বৃক্ষ অঙ্কিত আছে।

এখানকার বনে জঙ্গলে দলে দলে হাতী বিচরণ করতে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে হিংস্র জন্তু ও সাপের প্রাদুর্ভাব আছে।

মহিলাদের রীতি নীতি যতদূর দেখেছি, তাতে বাংলার সঙ্গে তুলনা

করে তাদের উন্নত বলতে পারা যায়; এরা বড় স্বাবলম্বনপ্রিয়। কলম্বোতে মেয়েদের হাতের প্রস্তুত সূক্ষ্মশিল্পের বস্ত্র, লেশ প্রভৃতি দ্রব্য ইংরেজরা অত্যন্ত আদরে কিনে থাকে। মেয়েদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ। আমি একটি মেয়ের চুল দণ্ডায়মান অবস্থায় হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়তে



সিংহলী-মেয়ে লেশ বুনিতেছে

দেখেছি। সম্ভবতঃ প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ নারকেল তেল ব্যবহারেই সিংহল-মহিলারা দীর্ঘকেশা হয়ে থাকেন।

সিংহলী মেয়েরা অনেকেই লেখাপড়া জানে, নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও লেখাপড়া শিখে থাকে। অনেক বাড়ীতে দাসী বা ঝী-রা পর্য্যন্ত লেখাপড়া জানে। বাংলার মত নারীর অবরোধ প্রথা এখানে নাই। মেয়েরা লেশ-বোনা প্রভৃতি কুটির-শিল্প সম্বন্ধীয় অনেক কাজ করে অর্থোপার্জ্জন করে

থাকে। সূক্ষ্ম সেলাই, জরির কাজ, অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা জানেন। ডুম্বারা ব'লে চমৎকার লতা-ফুলের সূতার কাজ করা এক প্রকার বস্ত্র মেয়েদের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। মেয়েরা খড়ের প্রস্তুত টুপী বড় সুন্দর করে থাকে। কলম্বোতে একটি স্ত্রীলোকের নিজের হাতের তৈরী চমৎকার লেশ কিনেছিলাম, তারই ফটো পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

নারকেল তেল বিদেশে রপ্তানি করে সিংহলবাসীরা অনেকেই বহু অর্থশালী হয়েছে। এই সমস্ত কার্য্যে নারীরাই বেশী সাহায্য করে থাকে। তৈল প্রস্তুত ব্যতীত নারকেল সম্বন্ধীয় আরও অনেক কাজ আছে, তাও মেয়েরা করে।

প্রতি পূর্ণিমা দিবসে বৌদ্ধ মহিলারা পানশিল বলে এক প্রকার ব্রত করে থাকেন। তাঁরা ঐ দিন পবিত্র শুভ্র বস্ত্র পরিধান করেন, এবং সমস্ত দিবস উপবাস থেকে বুদ্ধের ধ্যান করে থাকেন। বৌদ্ধনারী জীবিত মাছ মারেন না, ডিম ভাঙ্গেন না।

সিংহলের ইংরাজী নাম সিলোন, রাজধানীর নাম কলম্বো; কলম্বো একটি উল্লেখযোগ্য সামুদ্রিক বন্দর। ইংরেজের তত্ত্বাবধানে কলম্বো বন্দরটি অতি রমণীয় রূপে গড়ে উঠেছে। বহু দেশ-বিদেশের জাহাজ কলম্বো বন্দরে এসে থাকে।

কলম্বো সহরটি পৃথিবীর বড় বড় সহরের মত সুন্দর করে গঠিত। এখানে বহু ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীর সুন্দর সুসজ্জিত দোকান আছে। সহরটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গতিবিধির জন্য ট্রামওয়ে আছে। সহরটিতে এতই বিভিন্ন দেশীয় লোকের গতিবিধি যে, এখানকার রিক্সাওয়ালারা অনেকে ইয়োরোপের তিন-চারটি ভাষা এবং ভারতবর্ষের তিন-চারটি ভাষায় কথা বলতে পারে। কলম্বো সহরে অনেক ভাল ভাল মণিমুক্তার দোকান আছে। ঐ সমস্ত জিনিস আমাদের দেশে আনতে

Custom-duty অর্থাৎ বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হয়। আমি আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের জন্য ঐ সকল মণিকারদের কয়েকটি কারবারের সহিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করে এসেছি।

কলম্বোর সমুদ্রতীরটি বড়ই সুন্দর; যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তেমনই আবার ইংরেজের তৈরী কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের প্রভাব। ইয়োরোপের অনেক সৌন্দর্য্যময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরের সঙ্গে তুলনায় এর সৌন্দর্য্য কম নয়। এখানকার সিনামন-গার্ডেন উল্লেখযোগ্য দর্শনীয়। সিনামন গার্ডেনএর মানে দারুচিনির উদ্যান হলেও উদ্যানটি নানা জাতীয় বৃক্ষে পূর্ণ। এই সিনামন-গার্ডেনের অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া পার্কের মত নানা জাতীয় সুদৃশ্য বৃক্ষাদি পূর্ণ উদ্যান নাকি সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডে আর নাই।

দারুচিনি, বৃক্ষের ছালমাত্র। উদ্যানের দারুচিনি বৃক্ষগুলি বহু পুরাতন হয়ে যাওয়ায় উহার ছালে বিশেষ সুগন্ধ থাকে না। আমরা যে দারুচিনি ব্যবহার করি, ওখানে উহার পৃথক আবাদ আছে। গাছ পাঁচ-ছয় ফিট দীর্ঘ হলেই তার গা থেকে ছাল বের করা হয়। সিংহলের বহু পল্লীতে দারুচিনির বাগান আছে।

কলম্বো মিউজিয়মে যে সকল প্রাচীনকালের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে আমাদের হিন্দু দেবতা গণেশ-মূর্ত্তি দেখেছি, এতে মনে হয় রামায়ণের যুগের পর হতে সিংহলে শক্তিপূজক হিন্দুদের রাজ্য ছিল; মহারাজ অশোকের পর হতে তৎপুত্র মহেন্দ্র কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

কাণ্ডী সিংহলের একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। এই সহরটি সিংহলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত; ইহা পরম রমণীয় পর্ব্বতমালায় পূর্ণ। হিন্দু ও বৌদ্ধরাজত্বে ইহা সিংহলের রাজধানী ছিল। বহু বিদেশী পর্য্যটক এই স্থানটি দর্শন করতে এসে থাকেন। কাণ্ডীতে বুদ্ধদেবের বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। শঙ্করাচার্য্যের সময় হতে ভারতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধদের উপর

উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। এই সময় বহু বুদ্ধ-ভক্ত ভারতের বাইরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করেন। শ্রাবস্তীর রাজকন্যা হেমমালা বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক তাঁর উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হলে তিনি বুদ্ধের একটি দন্ত স্বীয় কবরী মধ্যে লুকিয়ে সিংহলে পলায়ন করেন। বুদ্ধের এই দন্ত কাণ্ডীর মন্দিরে স্বুবর্ণ-পাত্রে রক্ষিত আছে; এজন্য এই মন্দিরটির নাম দন্তমন্দির। এই দন্তমন্দিরটি সিংহলের স্থাপত্য বিদ্যার চমৎকার নিদর্শন। কাণ্ডীর দন্তমন্দিরের নাম সভ্য জগতের সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত। কলম্বো অপেক্ষা কাণ্ডীর উষ্ণতা কম বলে বহু ইংরেজ এখানে বাস করেন। অনেক বিদেশী লোক এই স্থানটী দর্শন করতে এসে থাকেন।

অনুরাধাপুরা নামক স্থানটি দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিংহলের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে তার বহু ধ্বংসাবশেষ ও উৎকৃষ্ট বৌদ্ধ মন্দিরাদির নিদর্শন রয়েছে।

অনেক পণ্ডিতের মতে নিউরাইলিয়া নামক পর্ব্বতময় স্থানটিতে রাবণের রাজধানী ছিল। ইহা বর্ত্তমান রাজধানী কলম্বো থেকে ১৩৫ মাইল পূর্ব্বে। স্থানটি পরম রমণীয়। বর্ত্তমানে এই স্থানটিতেই সিংহলের গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস অবস্থিত। এখানে সীতাগিরি নামে একটি পর্ব্বত আছে, তারই নিকটে রাবণের অশোক বন ছিল, এইখানেই জনকনন্দিনী সীতা বন্দিনী ছিলেন। সীতাগিরি পর্ব্বতের নিম্নে এখনও অশোক বৃক্ষশ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। রক্তবর্ণ পুষ্পশোভিত অশোক বৃক্ষশ্রেণী ত্রেতাযুগের রামায়ণের বর্ণিত অশোক বনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাঠক পাঠিকাগণকে একটি কৌতূহলের সংবাদ শুনাব—নিকটেই একটি বিস্তীর্ণ স্থান রয়েছে, ঐ স্থানে বহুদূর পর্য্যন্ত কোন বৃক্ষাদি জন্মে না। কিংবদন্তী আছে যে ঐ স্থানটী হনুমান কর্তৃক দগ্ধ হয়েছিল। এরূপ কিংবদন্তীর মূল্য কি

তা রামায়ণের ভক্তরাই বলতে পারেন। সীতাগিরিতে একটী ঝরণা আছে, কথিত আছে সীতাদেবী এই জল পান করতেন।

রামায়ণের যুগের বিশেষ নিদর্শন সিংহলদ্বীপে এই দেখতে পাওয়া যায় যে, যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে তার নিকটেই দুর্গা মন্দির রয়েছে। এই দুর্গামন্দিরগুলি নাকি বিভীষণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। তারই নিকটে পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। ঐশ্বর্য্য-গৌরব সমন্বিত 'রক্ষোপুরী' বিনাশের হেতুস্বরূপ বিভীষণের উপর লঙ্কা-বাসীরা এখনও বীতশ্রদ্ধ।

সিংহল বা লঙ্কার বিষয় লিখতে গিয়ে যদি আমি রামায়ণ বর্ণিত রাক্ষসের কিঞ্চিৎ বর্ণন না করি তবে বিষয়টী অসম্পূর্ণ হবে। সিংহলের অনেক পর্ব্বতময় জঙ্গলে এখনও এক প্রকার অসভ্য জাতি দেখা যায়, এদের চক্ষু রক্তবর্ণ, মস্তকের কেশ কুঞ্চিত, গঠন কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। সম্ভবতঃ এরাই রামায়ণের বর্ণিত রাক্ষসবংশ। এই জাতীয় লোক অতি অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানের অধিকাংশ সিংহলবাসীই ভারতের নানা স্থান থেকে এখানে এসে বহুকাল হতে বসবাস করছে।

ভারতবর্ষ হতে সিংহলের অবস্থা অনেক বিভিন্ন ধরণের। আচার ব্যবহার রীতি-নীতিতেও অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। এই ভাবের বিভিন্ন দেশের অবস্থাগুলি জ্ঞাত হওয়ায় যে আমাদের কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ হয় তা নয়—এতে মনের প্রসারতাও বৃদ্ধি পায়।

রাত্রি ১২টায় জাহাজ কলম্বো থেকে ছেড়ে দিল। একটু দূরে এসে সুদীর্ঘ আলোক-মালা শোভিত লঙ্কাকে যেন সমুদ্রে ভাসমান আলোক-পুরীর মত পরম রমণীয় দেখাচ্ছিল, তখন মেঘনাদ বধ কাব্যের—

"ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা রত্নহারা।"

ইত্যাদি মনে পড়ছিল। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত আমরা লঙ্কাপুরীর সেই আলোক মালার দিকে চেয়ে রইলাম। পরে জাহাজ আবার অনন্ত সাগরে মিশে গেল।

মান্দ্রাজ থেকে এপর্য্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম এসেছি, সকালে উঠে দেখলাম আমরা ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলেছি। এবার আমাদের খুবই দীর্ঘ পাড়ী দিতে হবে। আরব সাগর আর লোহিত সাগর পার হয়ে ৩৪০০ মাইল পথ চলে তবে সুয়েজ খালে প্রবেশ করব।

আরব সাগর

২৮শে মার্চ্চ রাত্রিতে জাহাজ কলম্বো থেকে ছেড়ে ছয় দিন পর্য্যন্ত আরব সাগরে অবিরাম চলল। কলকাতা থেকে কলম্বো পর্য্যন্ত দৈনিক আড়াই শত মাইলের বেগে জাহাজ চলেছে, কোথায়ও কম জলের আশঙ্কা নাই। এখন চলছে দৈনিক সাড়ে তিন শত থেকে চারিশত মাইলের বেগে। এই ছয় দিনের বিশেষ সংবাদ কিছু নাই। একদিন ফার্ষ্ট ক্লাসে একটি দু'বছরের ছেলে নিউমোনিয়া জ্বরে মারা গেল। তাকে সুন্দর লাল রঙ্গের কাপড়ে মুড়ে একখানা বড় চৌকা কাঠের তক্তার উপর করে শিকলি বেঁধে ধীরে ধীরে সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হল। তার জন্য জাহাজে শোকের নিশান তোলা হল। আর একদিন রাত্রির ঘটনা এই যে, যাত্রী ও জাহাজের কর্ম্মচারী সাহেব-মেমেরা অনেকে মিলে নানা রং-বেরংএর কাগজের টুপী পরে খুব নাচ-গান করেছিল। একটি সাহেবের টুপী হয়েছিল মস্ত বড় একখানা কাগজের জাহাজ, একটি মেমের অদ্ভুত রকম টুপীর সঙ্গে উড়ছিল তিনটা রবারের ফানুষ। এই সব অদ্ভুত রকম সংএর সাজ! এ ছাড়া রোজই জাহাজে নাচ-গান কিছু কিছু হত।

এর মাঝে একদিন আমরা মিনিকয় নামক ভারত মহাসাগরীয় একটী

ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখতে পেয়ে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম; দ্বীপটি মাত্র তিন-চার মাইল দীর্ঘ বলে মনে হল। আমরা তার দু'মাইল তফাৎ দক্ষিণ হয়ে চলে এলাম। দূরবীক্ষণ নিয়ে সেই দ্বীপটিকে অনেকক্ষণ দেখেছিলাম। তারপর পথে আমরা দু'খানি জাহাজ মাত্র দেখেছি।

সাত দিনের দিন ৩রা এপ্রিল সকালে আরব সাগরের মাঝে ডাইনে পাহাড় দেখা গেল। তারপর বেলা দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বামে সকোত্রা দ্বীপের পর্ব্বতশ্রেণী বরাবর দেখলাম। সমুদ্র মাঝে পর্ব্বতশ্রেণী—এ দৃশ্য বড় সুন্দর!

এডেন বন্দর

পরদিন বিকালে আবার ডাইনে পর্ব্বত দেখা গেল। পর্ব্বতের নিম্নে সাগরতীরে সাদা সাদা কি দেখা যাচ্ছিল; অনেকেই দেখছিল, জিজ্ঞাসা করে জানলাম—এডেন বন্দর। বড় আনন্দ হল,—এই সেই আরব দেশের ইংরেজরক্ষিত এডেন। বিলাত যাবার অধিকাংশ জাহাজই এডেনে ধরে, কিন্তু আমাদের এখানে ধরবার কথা ছিল না। পর্ব্বতের পাদ-মূলে সমুদ্র-তীরে সহরটি খুব সুন্দর, আমরা তার প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূর দিয়ে চলেছিলাম। দূরবীক্ষণের সাহায্যে তীরে কয়েকখানা জাহাজ আর উপরে বড় বড় বাড়ীগুলি কিছু কিছু দেখতে পেলাম। পাহাড়ের খানিকটা উপর থেকে সাগর কূল পর্য্যন্ত বহুদূর ক্রমে ঢালু হয়ে সহরটি নেমেছে। ক্রমে ঢালু হয়ে নেমেছে বলে সহরের বড় বড় রাস্তা বাড়ী ঘর সমস্তই দেখা গেল। দূরবীণের দেখা, ঠিক যেন সহরের ছবি দেখলাম, যাহ'ক তবুও এডেনটা দেখা হল।

প্রতিদিন জাহাজ যেখানে আসে, সেইখানকার সময় জাহাজে ধরা হয়।

কলম্বো থেকে এডেন পর্য্যন্ত আসতে প্রতিদিন ঘড়ি পনর, কুড়ি মিনিট স্লো করা হয়েছে। এই রকমে আমরা ঘড়িতে দেখলাম কলম্বো থেকে এডেন পর্য্যন্ত আসতে এক সপ্তাহ মধ্যে ছ'ঘণ্টা আঠার মিনিট স্লো করা হয়েছে। এইভাবে কলকাতার সময়ের হিসাবে ধরলে দেখা যায়—কলকাতায় যখন সকাল ৬টা, মান্দ্রাজে তখন ৫টা ২৭, কলম্বোতে ৫টা ১৪, আর এডেনে তখন রাত্রি ২টা ৫৬ মিনিট। প্রত্যেক স্থানের দিবস ঠিক মধ্যাহ্নকে ১২টা ধরে সেই দেশের সময় নির্ণয় করা হয়। কলকাতা থেকে সূর্য্যকে এডেন পর্য্যন্ত আসতে প্রায় এক প্রহর সময় লাগে। কথাটায় একটু ভুল হল—কারণ সূর্য্য ত আর ঘোরে না—পৃথিবীই ঘোরে।

লোহিত সাগর

রাত্রিতে কখন যে আমরা বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী অতিক্রম করে লোহিত সাগরে পড়েছি তা জানতে পারিনি। দিবসে হলে ডাইনে আরব দেশ আর বামে আফ্রিকা মহাদেশ একই সময়ে দেখতে পেতাম। আশা রইল সুয়েজ খালে গেলে আফ্রিকা দেখতে পাব।

৫ই এপ্রিল সকালে আমরা লোহিত সাগরে এসে পড়েছি। লোহিত সাগরের জল যে লাল নয়, আর আর সাগরের মতই নীলবর্ণ এ সকলেই জানেন। কেউ কেউ বলেন এই সমুদ্রের তীরের বালুকা একটু লাল রংএর তাই লোহিত সাগর নাম হয়েছে। সেদিন খুব ভোরে উঠেই ডাইনে সমুদ্র মধ্যে মাঝে মাঝে পাহাড় দেখছিলাম। একটা খুব উঁচু পাহাড়ের উপর বাতি ঘর (Light House), তাতে তখনও বাতি জ্বলছিল; ঠিক ছয়টায় সূর্য্য উঠল, আর বাতি নিবিয়ে দেওয়া হল। বাতি ঘরের আলো অন্য আলো থেকে পৃথক করে বোঝাবার জন্য এমন কৌশলে

ঘোরান হয় যে, তাতে আলোটি একবার নিবছে একবার জ্বলছে বলে বোধ হয়।

লোহিত সাগরে মাঝে মাঝে দু'একখানা করে জাহাজ আসছে যাচ্ছে। সাতদিন অন্য প্রাণী দেখি নি, এদিন অনেকগুলি সাগর-পায়রা আমাদের জাহাজের পাছে পাছে চলে মাছ ধরতে লেগে গেল। ক্বচিৎ দু'একখানা সাগরগামী বড় নৌকা পাল তুলে চলেছে।

এতদিন বড় বড় সমুদ্র পার হলাম, সে সমস্ত সমুদ্র বেশ স্থির—কিন্তু লোহিত সাগরে এসে তুফান আরম্ভ হল; জাহাজের দোলানীতে আমার মাথা ঘুরছিল। নীচের ডেকে দোলানী একটু কম, তাই আমি নীচের ডেকে গিয়ে রইলাম। জাহাজের সমস্ত ছোট ছেলে মেয়ে গুলিকেও নীচে আনা হল। তার পর আর এক অসুবিধা দেখা দিল—যত বেলা বাড়তে লাগল ততই গরম বাতাস বইতে আরম্ভ হল। ডাইনে আরব, বামে আফ্রিকা, দুই দিকেই মরুভূমির দেশ, এর মাঝ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ভাবে লোহিত সাগর, কাজেই এই যে কুল-কিনারা দৃষ্টি শূন্য সাগরের মাঝ দিয়ে চলেছি, তবুও অত্যন্ত গরম হাওয়া। একে জাহাজের দোলানী তাতে আবার এই গরম হাওয়া, এই দুয়ে জাহাজের প্রায় লোকই অস্থির হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যায় বাতাস কমে গিয়ে গরমও একটু কমল। রাত্রিতে সমুদ্রের মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে সিগন্যাল ষ্টেসনের রঙিন বাতি দেখলাম।

এদিন রাত্রি ৯টার পর আমাদের সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জাররা চমৎকার অভিনয় করেছিল। সাহেবদের এ রকম অভিনয় আমি এই প্রথম দেখলাম। নাচ, গান, কথোপকথন, প্রহসন সবই সুন্দর। সেকেণ্ড ক্লাসের উপরের ডেকটি নানা বর্ণের পতাকায় সুন্দর করে সাজান হয়েছিল। জাহাজের সমস্ত লোক দেখবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। আশ্চর্য্য এই যে,

দশ জায়গার দশ জন বিদেশী মিলে এমন সুন্দর অভিনয় করল যে এর কোনখানে একটুকু ত্রুটী দেখলাম না। অভিনয় ব্যাপারে স্ত্রীলোকদেরই বেশী দক্ষতা দেখা গেল ; রাত্রি ১২টায় অভিনয় শেষ হল।

৭ই এপ্রিল একটু ঠাণ্ডা হাওয়া টের পাওয়া গেল। লোহিত সাগরের দক্ষিণাংশের গরম দেশ ছেড়ে গিয়ে উত্তরাংশে আমরা এখন ক্রমেই শীতের দেশে গিয়ে পড়ব। এ দিন আমাদের মধ্য-বাংলার অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত ছিল। পরদিন ৮ই এপ্রিল পৌষ মাসের মত শীত বোধ হল। শুনলাম শীতের দিনে এখানেই জাহাজের গায়ে বরফ পড়ে। এদিন থেকে আমি স্নানের জন্য প্রতিদিন এক বালতি গরম জল দিতে একটা লোক বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজে গরম জলেরও অভাব নেই, বরফ জলেরও অভাব নেই। যেখানে জাহাজ ধরে সেখান থেকে যথেষ্ট ভাল জল নেওয়া হয়। স্নান আহারাদিতে ভাল জল ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রের লোনা জলে কেবল জাহাজের ডেক্ প্রতিদিন ধোয়া হয়, আর কোন কাজ সে জলে হয় না। লোহিত সাগরের জল দেখলাম তীব্র লোনা।

লোহিত সাগরে নানা দেশের জাহাজ দেখা গেল। একখানা প্রকাণ্ড জার্ম্মান জাহাজ দেখলাম। বিকালে লোহিত সাগরের উত্তর সীমায় এসে পড়লাম। মানচিত্র দেখলে বোঝা যায় এই খানটা ক্রমে কেমন চাপা হয়ে চলেছে। আফ্রিকা আর আরব দু'ধারেরই পর্ব্বত শ্রেণী ধূঁয়ার মত দেখাচ্ছিল। ক্রমে আরও চেপে এসে দু'ধারের জমি নিকট হল— দু'ধারেই কেবল পর্ব্বত শ্রেণী। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দু'ধারের জমি এতই নিকট হল যে, এ অঞ্চলের স্থলভাগের অবস্থা অনেকটা বোঝা গেল। উপরে পাহাড় আর পাহাড়ে' জমি, আর সাগর কূলে প্রকাণ্ড বালির চড়া। এ সময় আমরা দুদিকে প্রায় ৫।৬ মাইল করে ১০।১২ মাইল প্রশস্ত স্থানের মাঝ দিয়ে চলছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছিল কিনারা মাত্র ১ মাইল দূর হবে।

এখানকার হাওয়া বেশ ঝর ঝরে। আরব সাগরে সূর্য্যোদয় দেখেছি, খুব খানিকটা উপরে না উঠলে আর সূর্য্য প্রকাশ পায় নি, যত এদিকে আসছি সূর্য্যোদয় ততই পরিষ্কার দেখছি। এখানে একেবারে লাল সূর্য্যটী সাগরের গা থেকে ফুটে ওঠে। সাগরে এ রকম সূর্য্যোদয় বড় সুন্দর দেখায়, অস্তও তেমনই সুন্দর। সূর্য্য অস্ত গেল, আমরা সুয়েজ খালের মুখে সুয়েজ বন্দরে এলাম।

সুয়েজ বন্দর

সন্ধ্যার পরই সুয়েজ বন্দরের সুবিস্তীর্ণ আলোকশ্রেণী দূর থেকে দেখা গেল। আমাদের জাহাজ খালের মুখে এসে ধরল। খালের মাশুলাদি সংক্রান্ত দেনা পাওনা মিটানর জন্য এখানে জাহাজ থামান হয়। এক রকম নূতন ধরণের নৌকা (Dehabieh) কয়েকখানা খুব উঁচু মাস্তুলে পাল বাঁধা, আমাদের জাহাজের দু'ধারে ভিড়ল। কতকগুলি সেই দেশীয় লোক সেই উঁচু মাস্তুল বেয়ে জাহাজের উপরের ডেকে উঠল। এরা নানা রকম সুন্দর সুন্দর রঙিন পাথরের মালা, হালুয়া নামে এক রকম চিনির বরফি, গালিচা, এদেশের দৃশ্য অঙ্কিত কার্ড প্রভৃতি বিক্রি করতে এসেছে। তাদের ভাব গতিক আর ব্যগ্রতা দেখে খুব ঠগ লোক বলে মনে হল।

জাহাজ ধরবার আগেই জাহাজের কর্ম্মচারীরা প্যাসেঞ্জারদের সাবধান করে দিয়েছিল যে, প্রত্যেকে যেন তাদের জিনিষ পত্র সাবধানে রাখে, নৈলে যারা আস্‌বে তারা চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। আমরা আগে অতটা সাবধান হবার দরকার বুঝি নি—কিন্তু এই সব বিক্রেতাদের দেখে জিনিষপত্র নিয়ে খুবই সাবধানে রইলাম। এখান থেকে ডাকে চিঠি দেবার সুযোগ ছিল কিন্তু চারিদিকের এই সব হৈ চৈ এর মধ্যে আমি

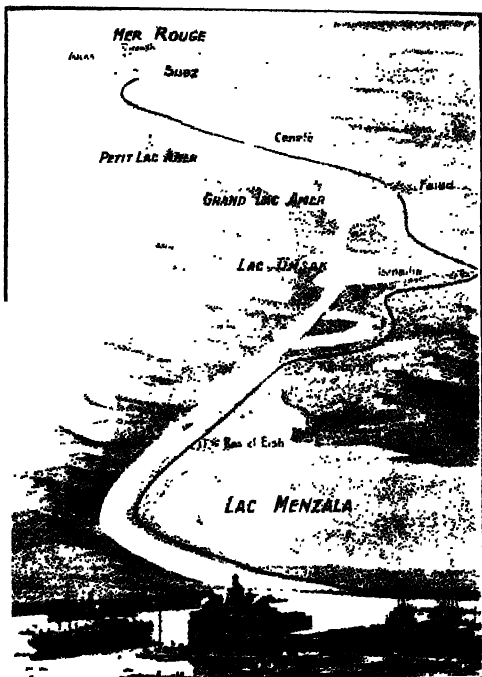
চিঠি পোষ্ট করতে পারলাম না। জাহাজ রাত্রিতে সুয়েজ খালে প্রবেশ করবে—দেখবার জন্য ডেকের উপরে গিয়ে জেগে রইলাম। জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার জিনিষপত্র সাবধানে আছে তো? আমার সঙ্গে দুইটি বাক্স ছিল। মূল্যবান জিনিষপূর্ণ বাক্সটী ও টাকা কড়ি জাহাজের ষ্টুয়ার্ডের কাছে সাবধানেই ছিল, কিন্তু একটী বাজে জিনিষের বড় বাক্স উপরের ডেকে শিকলে বাঁধা ছিল। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাবধানতায় উপরে গিয়ে সেই বাক্সের কাছে গিয়ে থাকলাম। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম এল না বটে কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রিতেও চারদিকে সুয়েজের দৃশ্যাবলী যা দেখছিলাম তাতে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম। এক রকম আলো জলের উপর দিয়ে দ্রুত যাতায়াত করছিল—তার কোনটা লাল, কোনটা নীল।

সুয়েজ খাল

রাত্রি বারোটায় জাহাজ ছেড়ে সুয়েজ খালে প্রবেশ করল। রাত্রির আধা অন্ধকারের ভিতর দু'ধারে কত কি দেখলাম, Signal-Light এর লাল নীল আলোগুলিই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। প্রবেশ পথে খালের খানিকটা স্থান দু'ধারেই পাথরে বাঁধা। অতি ধীরে খালের ভিতর দিয়ে জাহাজ চলল, আমি অনেকক্ষণ দেখলাম। তখন আর চোর চোট্টার ভয় নেই—পরে নীচে এসে ঘুমালাম।

৯ই এপ্রিল অতি ভোরে ঘুম থেকে উঠেই খালের দু'ধারে চেয়ে দেখলাম —দু'ধারই বড় বড় পাথরে ঢালু করে বাঁধা, উপরে সারি সারি বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা দু'ধারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। যত দূর দৃষ্টি চলে, দু'পাশেই বালি আর পাহাড়, মাঝে মাঝে দু'চারটি খেজুর গাছ। দেখলাম একেবারে নূতন রকমের দেশ।

গত রাত্রি বারোটায় জাহাজ স্যুয়েজ খালে প্রবেশ করেছে, আজ সারা সকাল বেলাটা খালের মধ্য দিয়েই চললাম। খালের অধিকাংশ স্থলই দুই শত ফিট মাত্র প্রস্থ, মাঝে মাঝে খানিকটা স্থান তিন চার শত ফিট হবে; কোন স্থানে ছোট হ্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব প্রশস্ত আকার ধারণ



পোর্ট-সৈয়দ হইতে স্যুয়েজ খালের দৃশ্য

করেছে। দক্ষিণ প্রান্তে স্যুয়েজ বন্দর আর উত্তর প্রান্তে ভূমধ্যসাগর তীরে সুবিখ্যাত পোর্ট-সৈয়দ বা সৈয়দ বন্দর পর্য্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে খালটি প্রায় একশত মাইল দীর্ঘ। স্থানে স্থানে Dredging machine দ্বারা

খালের মধ্য হ'তে মাটী তুলে খালের ধার থেকে দূরে ফেলা হচ্ছে। এই ড্রেজিং-মেশিনগুলি এক একটা জাহাজের উপর স্থাপিত।

সুয়েজ বন্দর থেকে সৈয়দ বন্দর (Port Syed) পর্য্যন্ত খালের পশ্চিম ধার দিয়ে রেল লাইন গিয়েছে। Kantara ষ্টেসন থেকে উত্তরে জেরুশালেম পর্য্যন্ত এই রেল লাইনের আর একটি শাখা লাইন গিয়েছে। এখান থেকে জেরুশালেম মাত্র ১২ মাইল পথ। এখানে এসেই সেই প্রাচীন য়িহুদী জাতির কথা মনে পড়ল, আর মনে পড়ল সেই জেরুশালেম-বাসী খ্রীষ্টের কথা। দু'ধারের দৃশ্যাবলীর মধ্যে পার্ব্বত্যপ্রদেশ, সমুদ্র, হ্রদ, উট, গাধা, মেষপাল উল্লেখযোগ্য ; এ সমুদয়ই খ্রীষ্টের জীবনমরণের কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত।

খালের তীরে এই খাল সংক্রান্ত আপিস এবং রেল-ষ্টেসনগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে Wind mill অর্থাৎ বায়ু চালিত কল দেখলাম। এই কল বেশী কিছু নয়, বাতাসের বেগে চারখানি প্রকাণ্ড পাখা ঘোরে ; এই ঘোরার শক্তির সাহায্যে খালের জল জমিতে সরবরাহ হচ্ছে। সেকালে এই কলের সাহায্যে গম পেষা, তেল প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হত। পাখা চারি খানি উঁচু স্তম্ভের উপর স্থাপিত।

পোর্ট-সৈয়দ

বেলা ১২টায় আমরা ভূমধ্যসাগর তীরে সৈয়দ বন্দরে গিয়ে পৌছলাম ; বন্দরটীর তিনদিকেই জল, যেন জলের উপর ভেসে রয়েছে। অনেকগুলি ছোট বড় জাহাজ তীরে লেগে আছে। খালের প্রান্তে ভূমধ্যসাগর তীরে এই খাল খননকারী ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার Lessepsএর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়েছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই খাল প্রস্তুত সম্পন্ন হয়।

মধ্যাহ্নের আহারের পর বিকাল তিনটায় আমরা সৈয়দ বন্দর দেখতে তীরে নামলাম। কলম্বোতে যেমন পাসপোর্ট দাখিলের গুরুতর ব্যাপার ছিল, এখানে তার কোন প্রয়োজন হল না।

প্রথমেই বড় ডাকঘর দেখতে পেয়ে দু'খানা লেখা চিঠি আর কয়েকখানা কার্ড লিখে পোষ্ট করলাম। সুয়েজ খালের চিত্রাঙ্কন করা নানা রকম সুন্দর কার্ড জাহাজে কিনেছিলাম তাতেই চিঠি লিখলাম। এখান থেকে ভারতে চিঠি পাঠাতে পোষ্টকার্ডে দুই আনা এবং এনভেলাপে তিন আনা মাশুলের টিকিট দিতে হয়। প্রথমে বড় বড় কয়েকটা রাস্তা ধরে চললাম। যেদিকে তাকাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকাশ্রেণী, তার কোন্‌টিতে যে কি হচ্ছে ভাল বোঝা গেল না। অনেক বাড়ীতেই সে দেশের ভাষা ছাড়া ইংরেজীতে ও ইয়োরোপের অনেক বিভিন্ন ভাষায় সাইনবোর্ড দেওয়া রয়েছে। এই পোর্ট-সৈয়দ বন্দরটি এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা—এই তিনটি মহাদেশের কেন্দ্রস্থল; নানা দেশের নানা ভাষী জাতির কাজ কারবার এখানে রয়েছে। কতকগুলি বড় বড় দোকান দেখলাম, ভিতর বাইরে নানা জাতীয় লোক চেয়ারে বসে আছে। সম্ভবতঃ তারা চা, দ্রাক্ষারস, সুরা প্রভৃতি পান করছিল। দোকানের সম্মুখ দিয়ে যেতেই আমাকে কেউ কেউ ডাকল, আমি কিন্তু সোজা রাস্তা ধরে চলে গেলাম।

জোচ্চোরদের কথা

পোর্ট-সৈয়দ কেমন জোচ্চোরের দেশ একটু দৃষ্টান্ত দিই,—

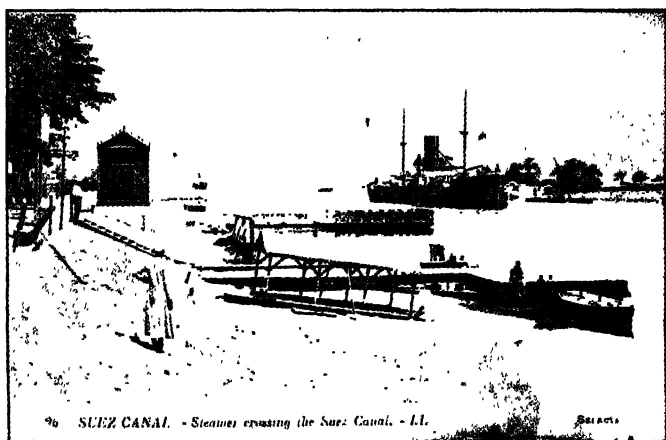
একটি ছোট্ট মুচীর ছেলে আমার পাছ ধর্‌ল। আমার জুতা বুরুসের দরকার নেই জানালেও সে পাছ ছাড়ে না, বল্‌ল—ওয়ান্ পেনী, ওয়ান্ পেনী। আমি বললাম আমার সময় নাই, সে আবার বল্‌ল—ওয়ান্ মিনিট,

ওয়ান্ মিনিট।" আমার জুতার বুরুসের দরকার না থাকলেও মাত্র এক পেনী (বিলাতী আনা) নেবে বলে জুতা জোড়াটী দিলাম; যা তা করে খুব শীঘ্রই দিল বটে, কিন্তু একটি পেনী দিতেই পেনীটি হাতে নিয়ে তাদের মিশরী ভাষায় কি আপত্তি আরম্ভ করল, তার কিছুই বুঝলাম না। আমি আর একটি পেনী তাকে দিয়ে ভাবলাম অব্যাহতি পাওয়া গেল। সে দুটী পেনী পকেটে ফেলে আবার সেই কিচির মিচির আরম্ভ করল। তার কথার অর্থ অনুমানে এই বুঝলাম, পেনীতে হবে না, পেনীর মূল্যে তাদের দেশের পয়সা চায়,—এটা তার দুষ্টামি মাত্র। আমি এই মুস্কিলে পড়ে তাকে আরও একটি পেনী দিলাম, তবু দেখি যে আমার পাছ ছাড়ে না। তখন তাকে শক্ত তাড়া দিতে সে হাসতে হাসতে সরে পড়ল। রাস্তায় অনেক Money Changer (অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকা বদল করে যারা আবশ্যক মুদ্রা দেয়) দোকান খুলে বসে আছে, তাদের কাছেও কিছু টাকাকড়ি ভাঙ্গাতে গেলাম না, পাছে কি দিতে কি দেয়।

সহরের বড় বাজারটির ভিতর প্রবেশ করে নানা জাতীয় ফলমূল, শাকসব্জী দেখলাম। ফলগুলির মধ্যে কিছু কিছু আমরা কলকাতার ফলওয়ালাদের দোকানে দেখে থাকি। কমলা লেবু প্রচুর—তবে তার খোসা মোটা, আর আমাদের দেশের মত সরস মিষ্টিও নয়। এখানে ভদ্র আর চাষা মেয়েরা সবাই কেনা বেচা করছে দেখলাম। এক শ্রেণীর ভদ্র স্ত্রীলোক দেখলাম চোখের নীচেয় নাকমুখ কালো কাপড়ে বাঁধা, বোধ হয় ওটা আমাদের ঘোমটার মত কোন একটা প্রথা।

সন্ধ্যা সাতটায় জাহাজ ছাড়বে তাই মন চঞ্চল ছিল, একটু এদিক-সেদিক দেখেই ফিরলাম। পথে আসতে অনেকগুলি জুয়েলারী দোকান দেখা গেল। তাতে সুন্দর সুন্দর রঙের পাথরের হার প্রভৃতি সাজান রয়েছে। খানিকটা দেখে শুনে আমাদের জাহাজের দিকে

ফিরলাম।' হারবারের মধ্যে সারি সারি জাহাজ রয়েছে, কূল দিয়ে বরাবর পাথরের সিঁড়ি বাঁধা, তাতে উপর থেকে জল পর্য্যন্ত ছাউনি করা। জাহাজে তুলে দিবার জন্য অসংখ্য পারের নৌকা তীরে রয়েছে। আমাকে উপর থেকে একটা মাঝি ডাক দিল, আমি তার উগ্র চেহারা দেখে তার নৌকায় পার হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম,—বললাম আমাদের জাহাজের কাছে



সুয়েজ খালে জাহাজ চলিতেছে

আরও নৌকা রয়েছে, ঐখানে গিয়ে পার হব। লোকটা এমন পাজি যে, আমার হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করল, আমি খুব রাগ করলাম, তবু ছাড়ে না; কয়েকটা লোক ভিড়ে গেল, আমি তাদের জানালাম এর নৌকায় আমি পার হব না। সে লোকদের বুঝিয়ে দিল যে, জাহাজ থেকে নামতে আমি তার নৌকায় বিনা পয়সায় এসেছি, এখন ফিরতে তাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য নৌকায় পার হতে যাচ্ছি। আমি তখন তাকে

খুব্ জোরের সঙ্গে বললাম—তোমার এই মিথ্যা কথার জন্য তোমাকে আমি শাস্তি দেওয়াব। তখন চারি পাশের দু'চারটি ভদ্রলোক তাকে জোর করে থামিয়ে রেখে আমাকে চলে যেতে বলল। বাপরে কি ভয়ানক জোচ্চোরের দেশ! আমি অন্য নৌকায় চড়ে জাহাজে এলাম। সন্ধ্যার পর জাহাজে এসে দেখলাম, সাহেবরাও উপরে গিয়ে আমারই মত কিছু কিছু ব্যবহার পেয়ে এসেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[সুয়েজ হইতে লণ্ডন]

ভূমধ্যসাগর

৯ই এপ্রিল রাত্রিতে পোর্টসৈয়দ থেকে ছেড়ে আমাদের জাহাজ ভূমধ্য-সাগরে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে দেখি ভারী ঠাণ্ডা পড়েছে, কুয়াসায় আকাশ ভরা, প্রবল বাতাস বইছে। ডেকের উপরের পর্দ্দা খুলে দেওয়া হল, শুনলাম বাতাস বাড়বে—তুফান হবে। জাহাজের Barometer (বায়ুমান যন্ত্র) সাহায্যে ঝড় বাতাসের খবর পূর্ব্ব হতেই পাওয়া গেল। যে তুফান হবে সেটী বড় ঝড় নয়, তবে সমুদ্রে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয়। বেলা এক প্রহরের সময় প্রবল বাতাস বইতে আরম্ভ হল, সমুদ্রের তুফানও ক্রমেই বেড়ে উঠল। জাহাজ আগে-পাছে, এপাশে-ওপাশে দুলছিল। অনেক ছেলেপিলে ও স্ত্রীলোক মাথাঘোরায় আর বমি করতে করতে অস্থির হল। আমারও গা অস্থির করছিল, আহারের সময় বয়ে গেল, আহার করতে ইচ্ছা হল না। বেলা তিনটার পর—অতিকষ্টে দু'টী ভাত নিয়ে বসলাম। দেশ থেকে গৃহিনীর দেওয়া কুলের আচার, আমসত্ব সঙ্গে ছিল তাই দিয়ে সামান্য দুটো খাওয়া গেল; সেই দুলতে দুলতেই খাওয়া। উঠে মুখ ধোবার আগেই অর্দ্ধেক আহার বমি হয়ে উঠে গেল। জাহাজে দুইটি

ইংরেজকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম, একজন রাজসাহীর মিশনারী ডাক্তার, আর একজন কলকাতা বিশপ কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল। আমার যে কোন একটু অসুবিধা হলেই এঁদের সাহায্য পেতাম।

জাহাজের কষ্ট

বিকালে তুফান আরও বাড়ল, জাহাজের দু'পাশ দিয়ে নীচের ডেকের উপর ঢেউএর জল আসছিল, এক একটা ঢেউ যেন ছোট ছোট এক একটা পাহাড়। সমস্ত লোকই উপর ছেড়ে নীচে এল, নীচেয় জাহাজ একটু কম দোলে। আমি সন্ধ্যার আগেই নীচের একটা অন্ধকার স্থানে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সেখানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, অতি কষ্টে আমাকে রাত্রি কাটাতে হল। দিনরাত্রির অবস্থাটা মনে করে ভাবলাম—কে জানে বিলাত যাত্রায় এত কষ্ট, এটা যদি ভবপারের যাত্রা হত তবু না হয় মনকে প্রবোধ দিতাম যে, আর জগতের দুঃখ কষ্ট ভুগতে হবে না। পরদিন সকালের একটা ঘটনা—ভয়ানক চীৎকার শুনতে পেলাম, দেখলাম ডাক্তারখানায় একজনের হাতে অস্ত্র করা হচ্ছে। দেখে আমার গত দিনের কষ্ট হালকা জ্ঞান হল।

পরদিনও সমুদ্রের একই অবস্থা। সন্ধ্যার পর বাতাস সামান্য কম পড়ায় কতকটা আরাম বোধ হল। এই দু'দিন লোকজনের অত্যন্ত দুরবস্থা গেল। তার পরদিন সমুদ্র একটু স্থির হল।

গ্রীস ও ইটালীর উপকূল

১১ই এপ্রিল সকাল হতেই আমরা ডাইনে ক্রীট দ্বীপ দেখলাম। এই ক্রীট দ্বীপের অতি প্রাচীন কালের এক নররাক্ষসের বিবরণ আমার মনে পড়ছিল। এখানকার এক দুর্দান্ত রাক্ষস রাজা গ্রীসের এথেন্স নগর

হতে রাজকর স্বরূপ মানুষ নিয়ে এসে উদর পূরণ করত। এটা গ্রীস দেশের অংশ, নিকটেই একটু উত্তরে গোটা গ্রীস দেশ। তার কোন কিছু চিহ্ন আমরা জাহাজ থেকে দেখতে পেলাম না।



সিসিলী-নারী

১২ই এপ্রিল সকালে আমরা বামে সিসিলী দ্বীপে এত্‌না আগ্নেয়-গিরিতে ধূম উদ্গীরণ হচ্ছে দেখলাম। ডাইনে অর্থাৎ উত্তরে ইটালী দেশ। সিসিলী ও ইটালীর মধ্যে খুব সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়ে অনেকক্ষণ জাহাজ চল্‌ল। অনেক স্থানে পদ্মা নদীর মত মাত্র প্রশস্ত। দু'ধারেই অত্যুচ্চ

পর্ব্বতশ্রেণী আর পর্ব্বতের নিম্নে সমুদ্রের ধার দিয়ে নগর পল্লী। বাড়ী ঘরগুলিকে পাহাড়ের গায়ে দূর থেকে যেন টুকরো কাগজ ছড়ান রয়েছে বলে বোধ হচ্ছিল। কোন কোন খানে জাহাজ খুবই নিকট দিয়ে চলছিল, তখন বাড়ীর গঠন বেশ পরিষ্কার দেখা গেল। মানুষের গতি অতি সামান্য-ভাবে লক্ষ্য করা গেল। বোটে লোকজন এপার ওপার হচ্ছিল, মাঝে মাঝে দু'একখানা ছোট জাহাজ ঘাটে বাঁধা রয়েছে। সিসিলী দ্বীপে মেশিনা সহরে বেতার টেলিগ্রাফের উঁচু পোষ্ট, এবং তীরে জাহাজ রয়েছে দেখলাম। আর একস্থানে যুদ্ধের সময়ের প্রস্তুত দুর্গ দেখা গেল। দু'একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বরফে মেঘে এক হয়ে রয়েছে। আজ ইয়োরোপের বসবাসের কতকটা আভাস পাওয়া গেল। বসতিগুলি সমুদ্রের দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে বলে জাহাজ থেকে বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছিল। বেলা ১২টায় ষ্ট্রম্বলি (Stromboli) নামে আর একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি সমুদ্র মধ্যে দেখলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, উপরে ধূম উদ্গীরণ হচ্ছে, নীচে বহু লোকজনের বসবাস। এই আগ্নেয়গিরিটার কোন কোন স্থানে ধূম উঠছে আর কোন কোন স্থানে গরম হাওয়া উঠে উপরের শীতল বাতাসে মিলে মেঘ হয়ে চলে যাচ্ছে। আগ্নেয়গিরিগুলিতে সব সময় ধূম উঠতে পারে, আমার এ ধারণা ছিল না। এ দিনকার এই দেখাশুনাগুলিতে জীবনে বিশেষ একটা নূতন ভাব এনে দিল।

শীতের দেশে এসে পড়েছি, ভয়ানক ঠাণ্ডা হাওয়া। কাপড় চোপড়ের সাধ্য নেই গরম রাখে। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘে এমন বিশ্রী ঢেকে যাচ্ছিল যেন সন্ধ্যা হয়েছে। কখন বা কুয়াসা, কখন দু'এক বিন্দু করে বৃষ্টি, এই মত দিনের মধ্যে নানা অবস্থা। দিনের পর দিন বিভিন্ন দৃশ্য, বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমাগত চলছি।

১৪ই এপ্রিল (বাংলা ১লা বৈশাখ ১৩৩১) সকালে আমরা বামে সার্দ্দি-

নিয়া ও ডাইনে কর্শিকা দ্বীপ অতি অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। সারা দিনটা কর্শিকার নিকট দিয়েই চললাম। এই ভূমধ্যসাগর মধ্যে যত দ্বীপ সবই কেবল পাহাড়-পর্ব্বতময়। কর্শিকার অত্যুচ্চ পর্ব্বতগুলির উপরে বরফ জমে সাদা হয়ে রয়েছে। কোন কোন খানে বরফের উপর মেঘ জমে আছে। আমাদের বাংলার সঙ্গে এ সব দেশের কোন অংশেও মিল নাই।

আমরা ফ্রান্স দেশের কাছে এসেছি, মার্সেলস বন্দর আমাদের সম্মুখে। কলকাতা থেকে সমুদ্রপথে এ পর্য্যন্ত এসেছি—কলম্বো পর্য্যন্ত ১২৬০ মাইল, সুয়েজ পর্য্যন্ত ৪৬৫০ মাইল, পোর্টসৈয়দ ৪৭০০ মাইল, এবং এই মার্সেলস পর্য্যন্ত এসেছি ৬২৪৬ মাইল। মার্সেলস্ থেকে জলপথে লণ্ডন ২০১০ মাইল। তাহলে কলকাতা থেকে লণ্ডন যেতে এ পথে জাহাজে ৮২৫৬ মাইল। সৈয়দ বন্দর থেকে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত সাতটি দিন চলবার পর ১৫ই এপ্রিল সকাল ৯টায় জাহাজ মার্সেলস্ বন্দরে এল।

মার্সেলস্ বন্দর

মার্সেল্স্ ফরাসীদেশের অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী একটী অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন বন্দর। সমুদ্রতীরে জাহাজ, বোট্, মালের আপিস প্রভৃতির বিশালতা দেখে একেবারে তাক্ লেগে গেল। ডকের ভিতর ছোট বড় অনেক মাল বোঝাই বোট্ এদিক ওদিক ছুটোছুটি কর্‌ছিল; সবগুলিই কলের বোট্। লোকজন কুলি মজুর সবই সাদা, তারাও কাজ করছিল কলের মত। আমার মনে হচ্ছিল যেন চারিদিকে 'বায়স্কোপ' দেখছি। উপরে ছোট বড় দু'রকম রেলগাড়ী, সদর রাস্তায় ট্রামগাড়ী; আর ছোট বড় নানাপ্রকার মালের মটর লরী চারিদিকে ছুটোছুটি কর্‌ছিল। গাড়ী

ঘোড়া, লোকজন, কুলী মজুর সকলেরই গতিবিধি অতি দ্রুত,—চারদিকেই যেন এক বিশাল কর্ম্ম-ব্যস্ততা।

জাহাজ ডকে ভিড়বামাত্র জাহাজের এজেণ্ট কুক কোম্পানী, কক্স কোম্পানী প্রভৃতির কর্ম্মচারীগণ আপন আপন পার্টির প্যাসেঞ্জারদের সাহায্য করবার জন্য জাহাজে এল। আমরা দশ-বার জন ইংলণ্ড যাত্রী মার্সেলস্‌এ নামলাম। বেলা দু'টার সময় প্যারিসের জন্য ট্রেণ ছাড়বে, এই অবকাশে সকাল বেলা আমরা মার্সেলস্ সহরটি দেখতে বের হলাম। প্রথমেই আমরা ডাকঘরে গেলাম। ডাকঘরের একটি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে ইংরাজী জানা কে আছেন? আপিসের একটি মেয়ে-কর্ম্মচারী অতিকষ্টে জানাল যে, ইংরাজী-জানা বর্ত্তমানে এখানে কেউ নাই। মেয়ে পুরুষে প্রায় সাত আট জন ফরাসী কর্ম্মচারী তখন ডাকঘরে কাজ করছিল, কিন্তু তাদের একজনও ইংরাজী জানে না শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। আমার ধারণা ছিল, ইংরাজীটা ইয়োরোপের সকল জাতিই ভালভাবে জানে; পরে জানলাম যারা বিদ্যা-ব্যবসায়ী অথবা যাদের ব্যবসায় সম্পর্কে ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাদের কেউ কেউ মাত্র ইংরাজী শেখে। ফরাসীদের ভাষার উচ্চারণ অনেকটা আরবীর মত। আরবী উচ্চারণের সঙ্গে আবার পারস্য আফ্‌গান উচ্চারণের আভাস পাওয়া যায়। আমাদের বাংলা থেকে যত উত্তর-পশ্চিম, ততই মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, ভাষা প্রভৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে অবশেষে ইংরাজীভাবে পরিণত হয়েছে।

আমাদের সময় সংক্ষেপ বলে এখান থেকে কোন চিঠিপত্র না দিয়েই সহর দেখতে চললাম। কলকাতা হাওড়া পোলের দক্ষিণে ষ্ট্রাণ্ড রোডের গঙ্গার ধার দিয়ে কয়েকটা বড় বড় মালগুদাম দেখা যায়, ঐ ধরণের গঠনে, পাথরের তৈরী পাঁচতলা, ছয়তলা প্রকাণ্ড মালগুদাম সব রাস্তার দু'ধারে দণ্ডায়মান—এক একটা পাঁচ সাত শত হাত লম্বা হবে; যতদূর

নজর চলে এই ভাবেই চলেছে। এটা পাহাড়ে' দেশ, তাই কোন কোনখানে সহর খুব উঁচুনীচু। উঁচু যায়গায় বাড়ীগুলো অপেক্ষাকৃত কম দীর্ঘ। সমুদ্রের তীরে একস্থানে যুদ্ধের গোলাগুলি প্রভৃতি সাজান রয়েছে।

এক ঘণ্টা সহর দেখে আহারাদি করে প্যারিস-লাইনের ট্রেণ ধরবার জন্য ষ্টেশনে যাত্রা করলাম। আড়াই মণ ওজনের দু'টি বড় ষ্টিল ট্রাঙ্ক আর ত্রিশ সের ওজনের একটা বিছানা-পত্রের মোট আমার সঙ্গে ছিল। একটি ফরাসী মুটে একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে ট্রাঙ্ক দু'টোর হাতল বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে, বিছানার মোট দু'টি দু'হাতে নিয়ে অনায়াসে জাহাজের উপর থেকে নীচেয় নাবিয়ে দিল। তার জন্য সে এক শিলিং (অর্থাৎ বার আনা) নিল। এখানে ফরাসী মুটের ভদ্রতার কথা একটু বলি। ষ্টীল ট্রাঙ্ক দু'টিতে জুয়েলারী অলঙ্কার ছিল বলে রেলকোম্পানী তা নিতে অস্বীকার করল। সে দু'টিকে আবার জাহাজেই লণ্ডনে পাঠাবার আবশ্যক হয়েছিল বলে জাহাজে তুলবার জন্য সেই মুটেকে খুঁজে আনলাম। সে পুনরায় জাহাজে তুলে দিয়ে এল কিন্তু তার জন্য কি দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুই নিল না। সে প্রকাশ করল, মালটা নামান যখন কাজের হল না তখন বিনামূল্যেই আবার তুলে দেওয়া তার উচিত। আমাদের দেশের মুটে হলে প্রত্যেক বারেই একটু-না-একটু ঝগড়া করতে হত। এদের মুটে মজুর পর্য্যন্ত ভাল প্রকৃতির মানুষ, এরা উন্নত হবে না কেন !

প্যারিস যাত্রা

বেলা ১টায় আমরা রেল ষ্টেসনে গিয়ে ট্রেণে চাপলাম। ট্রেণে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিন শ্রেণীর গাড়ী আছে। আমার তৃতীয় শ্রেণীতে গেলে কম খরচে হত কিন্তু সঙ্গী সাহেবদের সঙ্গে মিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটই কিনতে হল। আমরা যদিও প্যারিস চলেছি তবুও একেবারে লণ্ডন

পর্য্যন্তের টিকিট কিনলাম। মার্সেলস্ থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আশী টাকা ভাড়া লাগল। ফ্রান্স দেশের প্রচলিত মুদ্রার নাম ফ্রাঙ্ক; ৭০ ফ্রাঙ্কে ১ পাউণ্ড (১৫৲ টাকা)। ফরাসী গাড়ীগুলো খুব সুন্দর। গাড়ীর চারিদিকের দেওয়াল সুন্দর কারু-কার্য্য-শোভিত পরদায় ঢাকা, বসবার পুরু গদিগুলো কার্পেটে মোড়া। চার দিকের দেওয়ালে রেল কোম্পানীর প্রধান প্রধান স্থানের দৃশ্যাবলীর চমৎকার ছবি দিয়ে সাজান। বেলা দু'টায় ট্রেণ প্যারিস অভিমুখে রওনা হল।

আমাদের ট্রেণখানির নাম পি, এল্, এম, মেল অর্থাৎ প্যারিস-লিয়ন-মেডিটরেনিয়ান-মেল। ট্রেণ ছেড়ে দিতেই দেখলাম, আমরা উপর দিয়ে চলেছি। অনেকখানি পথ সহরের মাথার উপর দিয়ে ট্রেণখানি চল্‌ছিল, তাই সহরের দৃশ্যটি আমরা বেশ দেখতে পেয়েছিলাম। কয়েকটা ষ্টেসন গিয়েই ট্রেণ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চল্‌লো। আমরা উত্তর দিকে চলছিলাম, বামে একটি মনোরম পর্ব্বত শ্রেণী। পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে বরাবর ছোট ছোট পল্লী। পল্লীগুলির দৃশ্য অতি মনোহর। পল্লীবাসীদের অবস্থান, ঘরবাড়ী, বাগান প্রভৃতি দেখে বাস্তবিকই খুব আনন্দিত হলাম। আনন্দ—তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশ দেখে। ভাল করে দেখবার জন্য আমি গাড়ীর ভিতরে না থেকে বাইরে একধারে যে চলবার পথ আছে, সেখানে বস্‌লাম। সে পথ বেশ প্রশস্ত, একধারে একজন লোক বস্‌লেও লোকের গতিবিধির কোন ব্যাঘাত হয় না। সমস্ত গাড়ীই কাচের আবরণে ঢাকা, কারণ শীতের দেশ, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না।

পাহাড়ে' দেশ, দূরে নিকটে ছোট ছোট পাহাড়। মাঝে মাঝে গাড়ী পাহাড়ের এমন সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে চলছিল যে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। এই রকমে কখন পাহাড়ের নীচে দিয়ে, কখন

পাহাড়ের পাশ দিয়ে, কখন শস্যক্ষেত্র দু'ধারে রে'খে আমরা চল্‌ছিলাম। সারা পথেই কোথাও ফাঁক ফাঁক, কোথাও ঘন সন্নিবিষ্ট গৃহস্থ-ভবন। বাড়ীগুলি ছোট বড় নানা বৈচিত্র্যময়। সমস্ত বাড়ীর দেওয়ালই পাথরের বা পাথুরে মাটির; উপরে চারিদিকে ভাঁজ করা ঢালু পাথরের ছাদ। ফাঁকা জমিতে শস্যক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়ীগুলো অবস্থিত। বাড়ীর কোনখানে একটুও অপরিষ্কার নয়, একেবারে ছবিটির মত সাজান।

ফরাসী পল্লীচিত্র

স্ত্রী-পুরুষ সবাই জমিতে কাজ কর্‌ছে। সেই পাথরের জমিতে মেয়েরাও কোদাল ধ'রে কোপাচ্ছে। বড় বড় জমিগুলিতে পুরুষেরা ঘোড়ায় টানা এক রকম বড় লাঙ্গলে চাষ কর্‌ছে। এক টুক্‌রা জমিও পতিত নাই, কোন জমি শস্যে ভরা, কোনগুলিতে চাষ হচ্ছে। শস্যের গাছগুলি খুব ছোট, আমাদের দেশের ছোলা মসুর প্রভৃতি গাছের মত। ট্রেণে সাহেবদের কাছে এত ছোট শস্যের গাছের কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, শস্যের গাছ বড় কর্‌লে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি অনেক নষ্ট করে, কাজেই কম ফসল পাওয়া যায়। এই জন্যই এরা কৌশল করে গাছ ছোট রেখে ফসল বেশী পাবার ব্যবস্থা করেছে। কোন কোন ফসলের গাছের খুব ছোট অবস্থায়ই মাথা কেটে দেয়, তাতে গাছ আর উঁচু হতে পারে না এবং তার ফসল খুব বেশী পরিমাণে হয়। কোন কোন শস্যক্ষেত্রের মাঝে শস্যের গাছের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় ফলের গাছ দেখা গেল। এত পথ চলে কোথাও একটি অকেজো গাছ দেখলাম না। এক রকম সরু লম্বা ঝাউ গাছের মত গাছ দেখলাম; সেগুলোকে অকেজো গাছ বলেই মনে হল, পরে জানলাম আমাদের দেশের বাঁশের মত কাজ এই গাছের দ্বারা করা

হয়। প্রত্যেক গাছ, চারা, এমন কি ফসলের গাছটি পর্য্যন্ত সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ করে সাজান। এতে জমির মনোহর সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। মনে হয় এদের প্রত্যেক চারাটি যেন গোনা গাঁথা, নম্বর দেওয়া। স্ত্রী-পুরুষ চাষীদের পোষাক অত্যন্ত সাদা-সিদে কিন্তু বেশ কার্য্যোপযোগী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা জানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে কেবল বাবুগিরি করা চলে কিন্তু কেমন করে পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে শ্রমসাধ্য কাজ করা যায় তা এদেশের শ্রমিকদের কাজ দেখলে বোঝা যায়। আমাদের দেশে এটা নিতান্তই দুর্লভ কারণ ভদ্র ঘরের মেয়ে পুরুষ সাফ কাপড় পরে বসে কাটান, আর ছোট ঘরের লোকগুলো ময়লা কাপড় পরে শ্রমসাধ্য কাজ করে।

কি কঠোর পরিশ্রম করে যে ফরাসীরা এই পাথরের উপর চাষ করে সোণা ফলাচ্ছে তা দেখলে অবাক হ'তে হয়। পাথুরে জমিতে চাষ করছে, আবার উপরের পাহাড় কেটে উপরের জমি সমান করে ধাপ ধাপ সিঁড়ির মত করে তাতে চাষ দিয়ে ফসল ফলাচ্ছে। নীচে থেকে জল তুলে দিতে হয়। কেবল পরিশ্রমের গুণেই এরা মানুষের মত মানুষ হয়ে টিকে রয়েছে। দেশের ভদ্র, চাষা সকলেই পরিশ্রম করে।

ষ্টেসনে প্রায় স্ত্রী-পুরুষ সকল লোকেরই হাতে কাঁধে জিনিষের মোট। ষ্টেসনে মুটের হাঁকাহাঁকি নাই। স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই নিজের মোট নিজেই বহন করে নিয়ে চলেছে। যেগুলি অত্যন্ত ভারী মোট সেগুলি ছোট কলের গাড়ীতে করে ষ্টেসনের বাইরে এনে দিচ্ছে। শুনেছিলাম ফরাসী মেয়েরা নাকি খুব বিলাসী, কিন্তু এখানে বিলাসিতার লক্ষণ বেশী কিছু দেখলাম না, তবে পারিপাট্য বড় চমৎকার।

ট্রেণের দু'ধারে চাষের জমি, তার মধ্যে মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিজ্ঞাপনের বোর্ড টাঙান রয়েছে। চা, সিগারেট, মদ প্রভৃতির অনেক

কোম্পানির নাম দেখলাম, যারা আমাদের দেশে কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন গ্রামপথ দেখা যাচ্ছিল। সেগুলো বড়ই মনোরম। পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে—যেন এখনি তৈরী হয়েছে। খানিকটা যাবার পরে দেখলাম, রেল-লাইনের ধার দিয়ে একটি সুন্দর নদী সেই পাহাড়-পথে এঁকেবেঁকে চলেছে। নদীটিব উপরে প্রতি মাইলে সম্ভবতঃ দু'তিনটি করে সুন্দর পোল। এটি ফ্রান্সের সুবিখ্যাত রাইন নদী। ট্রেণ প্রায়ই পল্লীর ভিতর দিয়েই চলছিল, পল্লীপথেও মটরগাড়ী, মটর-সাইকেল প্রভৃতি বহু বহু দেখা গেল। বড় বড় পল্লীর ভিতর এক একটি উঁচু চূড়াওয়ালা গির্জ্জা দেখা গেল।

লিয়ন সহর

সন্ধ্যার আগেই ট্রেণ লিয়ন সহরে প্রবেশ করল। লিয়ন ফ্রান্সের একটি প্রধান সহর। সহরের মাঝখানে আমাদের ট্রেণ একটি পোলের উপর দিয়ে নদী পার হল। সেখানকার নদীমধ্যস্থ জাহাজশ্রেণী, দূরস্থ পৃথক পোলের উপরের জনতা আর ট্রামের শ্রেণী, সহরের সুদীর্ঘ রাজপথের পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ একেবারে আমাকে মুগ্ধ করে তুলল। অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ লিয়নের একটি ষ্টেসনে ধরল। এখানে ট্রেণ পনের মিনিট দাঁড়িয়েছিল। অনেক লোক এই অবকাশে প্লাটফরমে নেমে বৈকালের জলযোগ শেষ করে নিল। আমি মাত্র পাঁউরুটি মাখন ও দুটো কমলালেবু খেলাম। এই লেবুগুলো সম্ভবতঃ আফ্রিকা থেকে আসে। আমাদের দেশের শ্রীহট্টের লেবুর মত মিষ্টি নয় বটে, কিন্তু বেশ তৃপ্তিকর খাদ্য। এক একটি লেবুর দাম দেড় ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় পাঁচ আনা। এরপর ট্রেণ লিয়নের বড় ষ্টেসনটিতে গিয়ে ধরল। লিয়ন

আমাদের কলকাতার মত প্রসারিত না হলেও চার মাইলের ভিতর খুব আঁটা এবং খুব সুন্দর সহর। যেমন আমাদের দেশের তাজমহলের ছবি মনের পরদায় ফটো হয়ে রয়েছে, যেমন পরেশনাথ পাহাড়ের উপরের দৃশ্যটি মনে আঁকা রয়েছে, এই লিয়ন সহরের দৃশ্যও তেমনি মনের মধ্যে ছবি হয়ে রইল। আমাদের গাড়ীখানির দেওয়ালেও আর আর অনেক স্থানের ছবির সঙ্গে লিয়ন সহরের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা ছিল।

সন্ধ্যার পর আমাদের প্রত্যেকের শোবার জন্য সিট Reserve করা হল। প্রতি বেঞ্চে দু'জন করে শোবার বন্দোবস্ত। প্রত্যেকের স্থানের উপরে একটা কল ঘুরিয়ে Reserved মার্কা বের করে তাতে প্রত্যেকের নাম ও টিকিটের নম্বর লিখে দেওয়া হল। সারারাত্রি আমরা বেশ আরামেই ঘুমিয়ে কাটালাম। ভোর পাঁচটায় আমরা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরে উপস্থিত হ'লাম।

ট্রেণ ষ্টেসনে আসতেই সঙ্গী সাহেবেরা চা পান করল, আমি সামান্য কিছু খাবার খেলাম। নানা ধরণের খাবার জিনিস থরে থরে সাজান, আমার কাছে সবই নূতন, আমি দু'চার রকমের কেক মাত্র খেয়েছিলাম। প্যারিসের অনেক জিনিসের দাম সাধারণতঃ কলকাতার চারগুণ হবে তবু একে বড় দুর্ম্মূল্য বলব না, কারণ ইয়োরোপের সহর!

প্যারিস নগর

বেলা আটটায় আমরা প্যারিস সহর ভ্রমণে বের হলাম। সহযাত্রী বার-চৌদ্দ জন সহ মটরবাস Reserve করে সহরের ঠিক মাঝখানের প্রধান কয়েকটি রাস্তায় চলতে লাগলাম। প্যারিস পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর সহর। এর সৌন্দর্য্য ও বিশালতার কথা আমি আর কতটুকু বর্ণনা করতে

পারব ? যেদিকে তাকাই একেবারে সোজা রাস্তা আর দু'ধারে ঠিক একই রকমের বাড়ী। রাস্তাগুলো খুবই প্রশস্ত—বাড়ীগুলো পাঁচতলা, ছয়তলা আর খুব উঁচু। বড় বড় রাস্তার চৌমাথায় খুব খানিকটা ফাঁকা জায়গায় কোথাও একটা অপূর্ব্ব ধরণের সজ্জিত স্তম্ভ, কোথাও ফোয়ারা, কোথাও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আমাদের কলকাতার কারবারী আপিস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির বাড়ীগুলোই দেখাবার মত বড়, কিন্তু প্যারিসের হোটেল গুলোই বেশ প্রাধান্য প্রকাশ করছে।

আমাদের দ্রুতগামী বাসখানিতে সহরের বিভিন্ন স্থানগুলি দেখে ঐ দিনই আমরা লণ্ডন যাবার জন্য সহরের উত্তর সীমানার রেল-ষ্টেসনে ট্রেণ ধরলাম। পথে বর্ণনা যোগ্য বেশী কিছু মনে পড়ে না—কেবল খুব বড় বড় মাঠ,তার কোনটায় চাষবাস হচ্ছে, কোনটা কেবল গবাদি পশু চরবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। পথে একস্থানে যুদ্ধের সময়ের প্রস্তুত সেনা-নিবাস নির্জ্জন অবস্থায় পড়ে রয়েছে দেখা গেল, আর একস্থানে সৈন্যদের গোরস্থান দেখলাম। সেনা-নিবাসে এখন কিছুই নাই, ফাঁকা মাঠের মধ্যে অনেক-গুলো টিনের চালা ঘর রয়েছে মাত্র। গোরস্থানটিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে খুব ঘন ঘন মৃত সৈনিকের স্মৃতিস্তম্ভ। পথে কয়েকটা কাঠের কারখানা দেখলাম—কাঠ, তক্তা, নানারকমের বাক্স প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। পথে যত বাড়ী ঘর জিনিসপত্র গাছপালা দেখলাম তার কোনটাই এলোমেলো নয়, সবই সুন্দরভাবে সাজানো।

বেলা ১-৩৫ মিনিটের সময় ট্রেণ ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী ইংলিস চ্যানেলের উপকূলে বুলন (Boulogne) নামক ফ্রান্সের আর একটি সহরে এসে শেষ হল। এখানে নেবে আমরা ইংলিস চ্যানেল পার হবার জন্য একখানা সরু দীর্ঘ জাহাজে উঠলাম। এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই পার হয়ে আমাদের জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূলে ফোক্‌ষ্টোন্ (Folkestone) নামক বন্দরে উপস্থিত হল।

তৃতীয় অধ্যায়

[লণ্ডন সহর]

প্রথম পদার্পণ

১৬ই এপ্রিল তারিখে (১৯২৪) ইংলিস চ্যানেল পার হয়ে জাহাজ থেকে নেমে ইংলণ্ডের ভূমিতে পদার্পণ করেই একবার ভগবানকে স্মরণ করে মনে মনে বললাম—যিনি মূকের মুখে বাগ্মিতা ফুটাতে পারেন, যিনি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারেন, সেই সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীভগবান আমার সহায় হউন, যেন ইংলণ্ডের কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতা দেখাবার মত শক্তি পাই।

এ পর্য্যন্ত জাহাজে যে সকল ইংরেজের সঙ্গে একত্র এসেছি, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন পথে যাবেন, তাঁরা আমার নিকট বিদায় নিয়ে অন্য ট্রেণে উঠলেন। লণ্ডনে পৌছে কোথায় গিয়ে উঠব বিশেষ স্থির ছিল না, তবে তার জন্যে উদ্বিগ্নও ছিলাম না। এমন সময়ে একটি মান্দ্রাজী যুবককে পেলাম। তিনি ভিন্ন জাহাজে দেশ থেকে রওনা হয়ে এখানে পৌচেছেন, পড়বার জন্য লণ্ডনে চলেছিলেন। আমরা একত্রে ট্রেণে রওনা হলাম।

ট্রেণখানি সমুদ্রের ধার দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলল। পরে পথের দু'ধারে আমরা ইংলণ্ডের অনেক বিস্তীর্ণ প্রান্তর, গো-মহিষাদি পশুচারণের মাঠ দেখতে পেলাম। খুব দ্রুতগামী ট্রেণে আমরা চলেছি, ছোট ছোট ষ্টেসনগুলি ভ্রুক্ষেপে পার হয়ে দু'একটি ষ্টেসনে ট্রেণ ধরল। পরে ক্রমেই সহরের ঘন সন্নিবেশ দেখতে পেয়ে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তিতা অনুভব করলাম—

ক্রমেই সহরের ঐশ্বর্য্য ফুটে উঠল। তারপর লণ্ডনের সীমানার মধ্যে ক্রমে এসে পড়ায় সহরের গুরুত্ব অনুভব করতে লাগলাম, দেখতে দেখতে ট্রেণ একটি নদী পার হল। নদী এবং তার দু'ধারের দৃশ্য দেখে বুঝতে বাকী রইল না যে, এই সেই জগদ্বিখ্যাত টেমস্ (Thames) নদী। তার পর ট্রেণ সহরের ঘন সন্নিবিষ্ট বাড়ী ঘরের উপর দিয়ে কিয়দ্দূর গিয়ে ভিক্টোরিয়া ষ্টেসন নামক লণ্ডনের মধ্যবর্ত্তী একটি বিরাট ষ্টেসনে পৌছল।

মান্দ্রাজী যুবকটির থাকবার বাসা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভিক্টোরিয়া ষ্টেসন থেকে একখানি ট্যাক্সী করে আমরা উভয়েই তাঁর নির্দ্ধারিত স্থান ভারতীয় ছাত্রদের হোষ্টেলে (Indian Students' Hostel, Gawer Street) উঠলাম, সেখানে শুনলাম সিট (seat) খালি নাই, তাই আমার স্থান সেখানে হবে না। হোষ্টেলে কোন বাঙ্গালী যুবক আছে কিনা অনুসন্ধান করায় একটীমাত্র বাঙ্গালী যুবককে পেলাম। তিনি আমার সঙ্গের পত্র দেখে 22, Cromwell Roadএ গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ভারতীয় ছাত্রাবাসে নিয়ে গেলেন। সেখানে মাত্র তিন দিনের জন্য আমার স্থান হল। সেদিন বিকালে একাকী বেড়িয়ে সহরের অবস্থা একটু বুঝে নিলাম।

এই ছাত্রাবাসে থেকে তিন দিনের মধ্যে আমি আমার বিশেষ দু'টি কাজ সম্পন্ন করে নিলাম। একটি হচ্ছে--যে উদ্দেশ্য নিয়ে লণ্ডনে এসেছি অর্থাৎ বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের ষ্টল করা, সেই একজিবিশন বা প্রদর্শনীক্ষেত্র দেখে এলাম এবং আমাদের নিরূপিত ষ্টলের বন্দোবস্ত করে নিলাম। আর একটি কাজ—একটি উচ্চাঙ্গের হোষ্টেলে গিয়ে দু'সপ্তাহের জন্য বাসা নিলাম। বড় হোষ্টেলের আবশ্যক ছিল না, কিন্তু বিশেষ কিছু জানা না থাকার জন্য হঠাৎ যেমন জুটে গেল তেমন স্থানই নিয়ে নিলাম।

একাকী অত্যন্ত নূতনত্বের মধ্যে, এসে পড়ে যে অসুবিধা এবং উদ্বেগ

ভোগ করছিলাম, এই হোষ্টেলটিতে স্থান নিয়ে সে সব কেটে গেল। বেশ একটু নিশ্চিন্ত হলাম। একজিবিশনে আরও এক সপ্তাহ পরে কাজ আরম্ভ হবে, তাই এই একটি সপ্তাহ আমি আমার আবশ্যক কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের মোটামুটি অবস্থা ঘুরে-ফিরে একটু দেখে নিলাম।

লণ্ডনে প্রথম সপ্তাহ

লণ্ডন সহরটি দেখবামাত্রই আমার খুব চমক লেগে যায় নি, কারণ এর আগে প্যারিস দেখে এসেছি। প্যারিসের সেই অপূর্ব্ব সুন্দর সুদূর-দীর্ঘ প্রাসাদাবলী শোভিত রাজপথ এর চেয়েও সুন্দর; তবে যার জন্যে লণ্ডন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহর, সে সমস্ত গুরুত্ব আপাত-দৃষ্টিতে বোঝা যায় নি; পরে বুঝতে পেরেছি।

প্রথমতঃ যা যা নূতন রকম বলে লাগছিল সেইগুলি দু'একটা সংক্ষেপে উল্লেখ করি,—

প্রথমেই দেখলাম—অধিকাংশ বাড়ীগুলিরই সাধারণ জমির নীচে আর এক তলা আছে, যে বাড়ীটা পাঁচ তলা বলে দেখাচ্ছে সেটা প্রকৃতপক্ষে ছ-তলা। এ রকম নীচে একটি তলা থাকার জন্য সহর খুব উঁচু হয়ে অন্ধকার করতে পারে নাই। শুকনো পাথরের দেশ বলে নীচে সাঁতা (Damp) হবার ভয় মোটেই নাই।

আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলওয়ে এখানকার একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। সহরের ভিতরে যত রেলপথ, তার অধিকাংশই জমির নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে গিয়েছে। তার কোন কোন লাইন ৫০।৬০ ফিট বা তারও বেশী নীচে দিয়ে গিয়েছে। এই বেশী নীচু লাইনগুলি একটা গোলাকার প্রকাণ্ড চোঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছে, একে টিউব (Tube) রেলওয়েও বলা হয়। এই রকম সারা সহরের নীচে দিয়ে কোনটা পাশাপাশি, কোনটা বা একটার উপর দিয়ে cross করে আঁকা-বাঁকা পথে গিয়েছে। কমি-বেশী এক



উপর হইতে লণ্ডনের দৃশ্য

[৫৩ পৃষ্ঠা]

মাইল অন্তর ষ্টেসন, দু'এক মিনিটের মধ্যেই ধাঁ ধাঁ করে ষ্টেসনগুলি পার হয়ে যায়। ষ্টেসনে আধ মিনিট মাত্র ধরে, এর মধ্যেই লোকের ওঠা নাবা শেষ হয়ে যায়। মাটীর নীচে রেল ষ্টেসন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো বাতাস পূর্ণ, উপর নীচে ব্যবসায়ীদের সুদৃশ্য বিজ্ঞাপনে ঢাকা। লণ্ডনের বিজ্ঞাপনের কথা বলতে গেলে প্রকাণ্ড আকারের বই লিখতে হয়, সে কথা এখন থাকুক। এই টিউব রেল লাইনে চলতে হলে কলে (Lift) ওটা-নাবা করতে হয়, সে বেশ ছোট একখানি ঘরের মত, ৩০।৪০ জন লোক নিয়ে ওঠা নাবা করে। নীচের লাইনগুলিতে ঠাণ্ডা বা গরম কিছুই নাই, ভিতরে হাওয়া বাতাস বইবার বন্দোবস্ত আছে। ষ্টেসনের প্লাটফর্ম্মগুলিতে খুব আলো দেওয়া, সব গাড়ীতেই প্রচুর আলো। দূরবর্ত্তী স্থানে যাবার জন্যে উপরের ট্রাম বা বাসে না গিয়ে এই Underground ট্রেণেই বেশী লোকে চলাফেরা করে, কারণ এখানে সময়ের মূল্য অত্যন্ত বেশী। এই রকম কোন কোন খানে আবার ঘর বাড়ীর উপর দিয়েও রেল লাইন গিয়েছে। এ ভিন্ন ট্রামগাড়ী আর মটরবাসে সহরের সকল রাস্তা একে-বারে ভরা। সমস্ত ট্রাম ও বাসগুলিই দোতলা। শুনলে অনেকেই অসম্ভব বলে মনে করবেন যে, সহরের রেল লাইনে অনেক স্থলেই যাতায়াতে গড়ে দু' মিনিটে এক খানি ট্রেণ পাশ করে, আর মটর বাস কোন কোন রাস্তায় প্রতি মিনিটে যাতায়াতে কুড়ি পঁচিশ খানা করে চলে। তবে সব গুলিই সব যায়গায় ধরে না, রাস্তার পোষ্টে নম্বর দিয়ে নিয়ম করা আছে যে, কোন লাইনের গাড়ী কোনখানে ধরবে। লোক চলবার জন্য মটরগাড়ীও যথেষ্ট আছে, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীতে লোক চলে না। ঘোড়ার গাড়ীতে মাল, ময়লা টানে ; ঘোড়াগুলি খুবই বড় ও মোটাসোটা পায়ে লম্বা লম্বা লোমে ভরা। গরুর গাড়ী একেবারেই নাই।

ষ্টেসনে, রেল গাড়ীর ছাতে, গাড়ীতে, সব স্থানেই পথ চলবার মানচিত্র

ও নিয়মাবলী লেখা আছে। আর বিদেশী প্রত্যেক লোকের পকেটেই লণ্ডনের গাইড বই থাকে। বই দেখা ছাড়া পথ-ঘাট মনে রাখবার কোন উপায় নাই। আমি এক শিলিংএর একখানা পকেট লণ্ডন গাইড বই কিনেছিলাম, তাতে ৮০ পৃষ্ঠা রাস্তা-ঘাটের ম্যাপ, দু'খানি বড় sheet ম্যাপ, দেড়শত প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণ আর লণ্ডনের সাড়ে তেরহাজার ষ্ট্রীটের স্ূচী সহ লিষ্ট ছিল। লণ্ডনের গাইড বই ছোট বড় অনেক রকমের আছে।

লণ্ডনের রাস্তাগুলি খুব বড় বড় আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু প্যারিসের মত সোজা সুবৃহৎ রাস্তা লণ্ডনে বিশেষ দেখা যায় না। চার-পাঁচ তলা বাড়ীই বেশী, ছাত শ্লেট জাতীয় পাথরের টালীতে ঢালু করে তৈরী। অনেক যায়গায় কাচের ঢালু ছাত আছে। ঘরের চারিদিকের জানালা বড় বড় কাচের পরদায় ঢাকা। সেগুলি অনায়াসে উপরে তুলে দিয়ে জানালা ফাঁক করা যায়। খুব শীতের দেশ বলে ঠাণ্ডা বা বৃষ্টির হাওয়ার সময়ে কাচের আবরণে জানালা বন্ধ রাখে। সব বাড়ীতেই নীচের তলার ঘরের দেওয়ালে আগুন রাখবার স্থান আছে, সকালে ও রাত্রিতে আগুন জ্বালা হয়, শীতকালে সারা দিনরাত আগুন জ্বালা হয়। আগুনের ধোঁয়া চিমনি দিয়ে উপরে উঠে যায়। এই চিমনিতে উপরের ঘর কিছু গরম রাখে, এ ছাড়া ষ্টিমের বা গরম জলের পাইপ আছে, তার দ্বারাও অনেক ঘর গরম রাখা হয়।

টিলবেরী ডক্

আমি মার্সেল্‌স থেকে ট্রেণে প্যারিসের পথে সোজাসুজি লণ্ডনে এসেছি। আমার জুয়েলারী সংক্রান্ত জিনিষপত্র মার্সেল্‌স্ থেকে সেই জাহাজেই লণ্ডনে চালান দিতে হয়েছিল; কারণ বৃটিশ এম্পায়ার

একজিবিশনে নেবার জুয়েলারী জিনিস অর্থাৎ মূল্যবান অলঙ্কারাদি, মার্সেল্‌সে রেল কোম্পানী ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে আনয়ন করা মঞ্জুর করে নি। আমি লণ্ডনে পৌছে কয়েকদিন পরেই আমার মালের জাহাজ পৌছার সংবাদ পেয়ে সেই মাল জাহাজ থেকে আনবার চেষ্টা করলাম। জানলাম, লণ্ডনের টিলবেরী ডকে (Tilbery Dock) আমাদের জাহাজ এসেছে। ট্রেণে টিলবেরী রওনা হলাম। দেড় শিলিংএর একখানা থার্ড ক্লাশের টিকিট নিয়ে জানতে পেলাম, ডকটি বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রথমে দশ বার মাইল ট্রেণখানি সহরের বাড়ী ঘরের উপর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণে টেমস্ নদী এবং উত্তরে কয়েক মাইল গোচারণের মাঠ রেখে অবশেষে টিলবেরী পৌছল। আমি আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছে মালের বাক্স একজিবিশনে পৌছে দেবার জন্যে টমাস কুক কোম্পানীর মার্ফৎ গছিয়ে দিয়ে ডক্ দেখতে বের হ'লাম।

বিশাল আয়তন টিলবেরী ডক। খুব উঁচু একটা ওভার-ব্রিজের ওপর উঠেও ডকের আগাগোড়া দৃষ্টিগোচর হল না। দেশ দেশান্তরের বহু বহু জাহাজ, বহু দেশবাসী বহুভাষী নাবিক দেখলাম। এর মধ্যে ভারতীয় নাবিকও অনেক দেখলাম। চাট্‌গাঁর নাবিকদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করলাম। তাদের অনেকেই ইংরাজি জানে না। ফিরবার পথে একটা গেট-পুলিশের হাতে আটক পড়লাম। সে আমাকে অতি ভদ্রতার সঙ্গে তার ঘরে নিয়ে বসাল বটে কিন্তু বলে বসল—আপনাকে আটক করা হচ্ছে, কারণ আমি বুঝতে পেরেছি আপনি একজন জাহাজের কর্ম্মচারী, পালিয়ে যাচ্ছেন। তখন আমি তাকে তার ভুল বুঝিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গে একখানা পাসপোর্ট ছিল তাও তাকে দেখালাম। এতে সে আমার নিকট ক্ষমা চাইল এবং সসম্ভ্রমে বিদায় দিল। আমাদের দেশে পুলিশের হাতে আটক পড়লে প্রথমেই উভয়ের

মধ্যে যে অপ্রীতিকর ভাবের বিনিময় হয় এখানে তার কিছুই হ'ল না দেখে আমি মনে মনে এদেশবাসীকে এই প্রথম শ্রদ্ধার্পণ করলাম।

বাইরে এসে টিলবেরী রেল্-ষ্টেসনটিতে একটু বিশ্রাম করছিলাম, একটি মহিলা ছেলে কোলে করে ঘুরছিল। আমি তাকে বললাম—"ভাল আছ ত, কবে এখানে এলে ?" মহিলাটি উত্তর করল—"ওয়েটিং রুমে আসুন, আমাদের কথা শেষ করব।" সে আমাকে মেয়েদের ওয়েটিং রুমে নিয়ে গেল, পরে তার দু'কথাতেই বুঝলাম আমি ভুল করেছি; জাহাজের সহযাত্রী বলে যে মহিলাটিকে মনে করেছিলাম এ সে নয়। এই ভ্রমের জন্য আমাকে লজ্জিত হবারই কথা ছিল কিন্তু দেশের রীতি-গুণে আমাদের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে খানিকটা আনন্দেরই সৃষ্টি হল।

বাইরে এসে টিলবেরীর সদর রাস্তাটিতে এদিক-ওদিক একটু ঘুরলাম। লণ্ডন সহরের ভিতরে মুদী দোকানে চাল-ডাল বিশেষ দেখতে পাই নি। টিলবেরী এসে দেখলাম চাল-ডাল প্রভৃতি ভারতীয় ধরণের জিনিস সুন্দর-ভাবে সাজান র'য়েছে। সম্ভবতঃ ভারতীয় নাবিকদের জন্যই এরূপ আয়োজন। সকাল আটটায় বাসা থেকে প্রাতর্ভোজনের পর হোষ্টেল থেকে বেরিয়েছিলাম, বারটায় ফিরে এলাম।

হোষ্টেলে বাস

আমি যে হোষ্টেলটিতে ছিলাম সেটি গাওয়ার ষ্ট্রীটের (Gawer Street) উপর অবস্থিত, ত্রিতলে সদর রাস্তার দিকে আমার রুম। শোয়া আর প্রাতঃকালের সামান্য জলযোগের জন্য দৈনিক নয় শিলিং দিতে হত। সারাদিন নানা কাজে ঘোরাফেরা করতাম, তাই মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যার আহারাদির কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না। তখন পাউরুটি,

বিস্কুট, মাখন, কলা, আপেল, কমলালেবু প্রভৃতিই ছিল আমার প্রধান খাদ্য। সকালে ঘুম থেকে উঠেই জানালার পানে চেয়ে দেখতাম ঘোর ঘোর কুয়াসা, বেলা ন'টা পর্য্যন্ত প্রায় সেই মত। গাওয়ার ষ্ট্রীটটি ছিল খুব প্রশস্ত, নিরিবিলি ; প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যাপী রাস্তাটি, দু'ধারে একই ভাবের শ্রেণীবদ্ধ ধূসর রঙের চারতলা বাড়ী, গায়ে গায়ে মেশা। এদেশের সমস্ত বাড়ী ঘরই ধোয়াটে রঙের। এ সময় আমার আহারাদি আর চলা ফেরার জন্যে খুব কম করেও দৈনিক পনর শিলিং অর্থাৎ দশ এগার টাকা খরচ হচ্ছিল। এ ছাড়া বাজে খরচও অনেক। এত খরচ দেখে প্রথম প্রথম বড়ই ভাবনায় পড়লাম।

ইংরেজ পরিবারে বাস

দু'টি সপ্তাহ হোষ্টেলে থাকবার পর আমি চেষ্টা করে এখানকার একটি মধ্য-অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে থাকবার জন্য একটি সুন্দর বাসা পেলাম। চার তলার উপর সুন্দর ছোট পরিষ্কার একখানি ঘর, ভাড়া সপ্তাহে নয় শিলিং মাত্র। ঘরখানিতে পরিষ্কার একখানি খাট-বিছানা, একটি লিখবার টেবিল, একটি জামা কাপড় প্রভৃতি রাখবার আলমারী, একটি হাত মুখ ধোবার জল পাত্রাদি পূর্ণ পাথরের টেবিল, এইমত ছোট ছোট আসবাবে সজ্জিত ছিল। ঘরখানি পাবার পর থেকেই মনে হল আর আমি যেন বিদেশী নই—যেন এই সহরেরই একজন হয়ে গিয়েছি। গৃহস্থ পরিবারটি দু'টি দিনের মধ্যে সাহায্য সহানুভূতি দিয়ে আমাকে পরিবারেরই একজন করে গড়ে তুললেন। সংসারে লোক—কর্ত্তা, গৃহিণী, একটি বারো বছরের মেয়ে, একটি চার বছরের ছেলে—আর এক অতি বৃদ্ধা ছিলেন গৃহিণীর মা। কর্ত্তা ডাকবিভাগে চাকরী করতেন, গৃহিণী সংসারের কাজ

করতেন, মেয়েটি স্কুলে পড়ত, আর বুড়ী সারাদিন চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজ ও ভাল ভাল বই পড়তেন। মেয়েটির ডাকনাম ডলী, ভাল নাম ইমেলী ; সে আমাকে এখানকার চলিত কথা বলা শিখতে সাহায্য করত।

ঘরখানি পেয়েই আমি আমার বাঙ্গালী জাতির পরমাত্মীয় অন্নের সহিত নিত্য সম্বন্ধের ব্যবস্থা করে নিলাম। নিজে হাতে রান্না করে খেয়ে আমি বরাবরই তৃপ্তি লাভ করে থাকি, তাই দেশ থেকেই ছোট ষ্টোভ ও ছোট ছোট এ্যালুমিনিয়মের পাত্র সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ঐ ছোট ঘরখানিতে পাথরের টেবিলের উপরে ষ্টোভে করে রোজ সকালে ভাত রান্না করে খেতাম। এখানে রেঙ্গুনের আতপ চাউল এক পাউণ্ড অর্থাৎ আধসেরের দাম পাঁচ পেণি বা পাঁচআনা। মসুর ডাল, আলু, ডিম, মাখন, কপি, সিম প্রভৃতির আমাদের দেশের তিনগুণ বা চারগুণ দাম। আমি ভাতে ভাত করে বা ডাল, চাল, তরকারীতে মিশিয়ে সিদ্ধ করে মাখন যোগে পরম তৃপ্তিতে আহার করতাম।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ

সম্পূর্ণ নূতন দেশে এসে আমার নানাপ্রকার অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমাকে কোন বিষয়েই কিছু অসুবিধায় পড়তে হয় নাই—যেন অন্তরাল থেকে শ্রীভগবানের দৃষ্টি আমার উপর রয়েছে, এই ভাবটা বিশেষভাবে অনুভব করতাম। কর্ম্মের দেশ দেখে, মানুষের মত মানুষের দেশ দেখে আমার প্রাণের আনন্দ বেড়ে উঠল ; দেশের জল হাওয়ার গুণে এবং প্রাণের আনন্দের জন্যে আমার শারীরিক মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্যই অপেক্ষাকৃত ভাল হয়ে উঠল ; শরীরের ওজনও বাড়ল। ঘরে বাইরে প্রত্যেকের কাছে এমনই ভাল ব্যবহার পেলাম, দেশবাসীদের

পরস্পরের মধ্যেও এমনই ভাল ব্যবহার দেখলাম, যেন এই দেশের লোকের চরিত্র অধ্যয়ন করেই বিলাত আগমন সার্থক হল বলে মনে করলাম। বাস্তবিকও আমি যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম—এদেশবাসীদের চরিত্র অধ্যয়ন করাও তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় ছিল, তা প্রথমেই বলেছি।

পথ-ঘাটে যখন যাকে যে বিষয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করতাম তখনই সে সুন্দর ভাবে আমাকে সে বিষয় বলে দিত—শুধু বলে দিয়েই ক্ষান্ত হত না, আমি যে সে বিষয়টি ভালরূপ বুঝলাম, সে বিষয়ে আমার নিকট হতে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে তবে আমার নিকট থেকে বিদায় নিত। কখন কখন অযাচিত ভাবেও আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করে আমার উপকার করত। বস্তুতঃ বিলাতবাসীদের সরলতা, উদারতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখে আমি মুগ্ধ হ'লাম। একাকী বিদেশে সব দিকেই আমি এই মত অনুকূল অবস্থা পেয়ে—ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম।

দু'টি সপ্তাহ লণ্ডনে বাস করবার পরেই বিদেশ-বাস সম্পর্কীয় সকল অসুবিধাই আমার কেটে গেল। এই সময় থেকে এক্‌জিবিশনে আমাদের কাজ আরম্ভ করবার জন্য মনোযোগ দিলাম। এই বৃটিশ-এম্পায়ার-একজিবিশনটি হ'য়েছিল লণ্ডন সহরের প্রান্ত থেকে পাঁচ মাইল দূরে—ওয়েম্বলি পার্ক নামক সুবিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য-উদ্যানে। এরূপ বিরাট প্রদর্শনী নাকি একশো বৎসরের মধ্যে ইংরাজ রাজত্বে হয় নি, এবং অনেকে বলেছেন, এইটাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর কথা আমি পরে একটি অধ্যায়ে বলব। এখন বিলাতের খুটিনাটি কথাগুলিই বলতে থাকি।

ভারতীয় ছাত্রদের 'বিলাতীপণা'

প্রথমে আমি ভারতীয় ছাত্রাবাসগুলিতে গিয়ে সেখানকার ছাত্রদের সঙ্গে একবার দেখাশোনা ক'রলাম। তাদের সঙ্গে দেখাশোনা ক'রে যতখানি তাদের কাছ থেকে পাব আশা করেছিলাম, ততখানি কিন্তু পাই নি। দেখলাম তারা তাদের শিক্ষণীয় বিষয় নিয়েই ব্যস্ত, আর যেটুকু তাদের বাকী সময়, সেটুকু কেবল 'বিলাতীপণা' নিয়েই কাটিয়ে দেয়। আমি বেশী সুখী হ'তাম, যদি তাদের কাছে বিলাতের ভাল ভাল বিষয়ের আলোচনা শুনতে পেতাম, আর সেই সকল বিষয় দিয়ে আমাদের দেশ-গঠনের কিছু কিছু উপাদান পেতাম।

কলেজের বাঙ্গালী ছেলেদের প্রথমেই নজর পড়ল আমার চালচলন আর বেশভূষার উপরে। তারা দেখল, সভ্যদেশের আদব কায়দা আমার পোষাক-পরিচ্ছদ এবং কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে মোটেই ফোটে নি। আমার গায়ে ছিল গলা-ঢাকা কোট, তাতে কলার ছিল না, আর ওভারকোটের স্থলে ছিল 'বিবেকানন্দী' ধরণের একটা আলখেল্লা। মাথায় ছিল মান্দ্রাজী টুপী। ছেলেরা বল্‌ল—"আপনার ওই বেশভূষা নিয়ে এদেশে ব্যবসা করা চলবে না, এটা কেতা-দোরস্তর দেশ, সবই বাইরের চালচলনের উপর নির্ভর করে। আপনাকে অন্ততঃ তিনশো টাকার একটী 'সুট' (কোট প্যাণ্ট ওয়েষ্ট কোট ইত্যাদি) করতে হবে। জুতো সর্ব্বদা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রাখতে হবে, এদেশের লোকে প্রথমেই জুতোর ওপরে নজর ক'রে ভদ্র অভদ্র চেনে। তারপর, আপনার ও 'বিদিকিচ্ছি' লম্বা দাড়ী এদেশে চলবে না। গোঁফ দাড়ী পরিষ্কার ক'রে

চেঁচে ছুলে ফেলতে হবে, রোজ কামাতে হবে—নইলে এ দেশবাসীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করে জয়লাভ করতে পারবেন না।”

আমি মনে মনে ভাবলাম—এ যে বিরাট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা! মুখে তাদের বললাম—“এদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করবার সঙ্গে অতশত করবার খুব প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আর বাইরের চাল চলনের উপরেই কাজ কর্ম্মের কৃতিত্ব নির্ভর করে—এ কথাটাকে আমি বিশেষ মূল্য দিই না।” অবশ্য মুখে যতটুকু বললাম তার চেয়ে এই কথাগুলোর জোর ছিল আমার মনের মধ্যে অনেক বেশী। আমি তাদের বিলাতীপণায় ম’জে যাওয়া দেখে মনে মনে দুঃখিত হয়েছিলাম। এইখানেই বলে রাখি—একমাস পরে একজিবিশনে আমাদের জুয়েলারী ষ্টলটি যখন সুন্দরভাবে সাজানো হ’য়েছিল, যখন কার্য্যাধিক্য বশতঃ তিনটি ইংরাজ মহিলাকে কর্ম্মচারিণী রাখা হয়েছিল, যখন দলে দলে নানাদেশীয় লোকের উৎসুক দৃষ্টি আমাদের সুসজ্জিত ষ্টলটির উপর পড়েছিল, তখন কিন্তু ঐ সকল ভারতীয় ছেলেরাই ইংরাজ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে বাঙ্গালীর কাজ দেখিয়ে তৃপ্তিলাভ ক’রতো।

যাক্ সে কথা। ভারতীয় ছাত্রাবাসগুলিতে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহার-বিহারের ব্যয়বাহুল্য দেখে আমি মনে মনে অনেকবার দুঃখ অনুভব করেছি। ভারতের যত ছাত্র বিলাতে বাস করে, সকলেই বিলাত বাসীদের তত্ত্বাবধানে—হয় ছাত্রাবাসে, না হয় গৃহস্থ বাড়ীতে বাস করে। নিজেরা মিলেমিশে বোর্ডিং বা মেস করে থাকলে অনেকদিকে সুবিধা হয় আর খরচও খুব কম হয়—এ আত্মবোধটুকু এখনো কোন ভারতীয় ছাত্রের মধ্যে জাগে নি দেখে আমি আশ্চর্য্য বোধ করলাম। এ সম্বন্ধে চেষ্টা করতে আমি তাদের অনেক পরামর্শ দিয়েছি।

রেভারেণ্ড পেজ্

একটা ছাত্রাবাস আছে সহরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে Stamford Hillএর Amherst Parkটিতে। এটির তত্ত্বাবধায়ক Rev. W. Sutton Page. ইনি ভারতীয় ছাত্রদিগকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন, কারণ ইনি পূর্ব্বে বাংলায় শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। দু'এক দিনের পরিচয়েই তাঁর চিন্তার গভীরতায় আমি আকৃষ্ট হই। তারপর দেখলাম জগতের বহু ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত। তাঁর মুখে যে বাংলাভাষা শুনেছি অমন আর কোন ইংরাজের মুখে শুনি নি, একেবারে মাতৃভাষার মত আমার সঙ্গে বাংলায় বলতেন। তাঁর ছাত্রাবাসে আমেরিকা, চীন, জাপান, বর্ম্মা, সিংহল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পৃথিবীর অনেক স্থানের নানাবিধ উচ্চতত্ত্বের শিক্ষার্থী বাস করে। রেভারেণ্ড পেজ্ যেমন পণ্ডিত, তেমন অমায়িকও বটেন। সারা পৃথিবীর ছাত্র নিয়ে সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁর আনন্দে দিন কাটে। একদিন তাঁর আবাসে একটি তত্ত্বালোচনার সভায় আমি নিমন্ত্রিত ছিলাম। সভায় উপস্থিত হ'তেই পেজ সাহেব অনেক বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আমাকে পরিচিত কবে দিলেন। আমি নিজের দুর্ব্বলতার দিক দিয়ে একজন চীন দেশীয় পণ্ডিতকে ব'লছিলাম—"বলতে লজ্জিত হচ্ছি যে, আমি ইংরাজী ভাষায় কথা কইতে বড়ই কাঁচা"—কথাটি শুনবামাত্রই পেজ্ সাহেব আমাকে বললেন—"মিষ্টার নন্দী, আপনি কখন আর ও কথা ব'লবেন না, আপনি বেশ ইংরাজী জানেন।" এই যে পেজ্ সাহেবের মুখে এই কথাটি শুনলাম, এতে বাস্তবিকই আমার এই রকম যে একটা মনের দুর্ব্বলতা ছিল, তা সব কেটে গেল। যেন কি একটা জুজুর ভয় মন্ত্রের দ্বারা ঝাড়া হয়ে গেল। আর কখনও মুখে ত নয়ই, অন্তরেও ইংরাজী না জানার দৈন্য অনুভব করি নি।

রেভারেণ্ড পেজ্ অনেক সময় আমাদের ভারতবর্ষের কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকেন। আমাদের দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমি কোন দিকেই কোন কুল কিনারা দেখি না এই চিন্তা নিয়ে ইতিহাসের নজির দেখিয়ে একদিন প্রশ্ন কর্‌লাম—"ভারতের ভবিষ্যত উন্নতি সম্বন্ধে আপনি কি আশার বাণী শোনাতে পারেন ?" তিনি ব'ললেন—"ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ নাই। কালের ইতিহাসের কতটুকু অংশ আমাদের মানব সমাজে পরিজ্ঞাত ? সুদূর অতীতের কতটুকু খবর আমরা রাখি এবং সুদূর ভবিষ্যতের কতটুকু চিন্তাই বা আমরা করতে পারি।" কথাটা খুবই পণ্ডিতের মত হ'ল বটে, কিন্তু আমার তৃপ্তি হ'ল না। আমি চিন্তাটা আরও খাট করে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "ভারতের অন্য অন্য প্রদেশের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করে বাংলার ছেলেদের সততা, কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে দুর্ব্বল মনে হয় ; আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন ?" তিনি ব'ললেন—"তা-তো নয়-ই, বরং অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী ছেলেরা প্রতিভাশালী।"

বাংলায় বাসকালে পেজ সাহেব যে বাংলার ধাতটা ভাল করেই অনুভব করেছিলেন, অনেক ভাবেই তার নিদর্শন পাওয়া যায়। একদিন একজিবিশনে আমাদের বেঙ্গল কোর্টে গিয়ে এমন ঢাকাই-বাঙ্গালের কথার আবৃত্তি করেছিলেন যে, আমরা সবাই হেসে অস্থির হ'য়ে প'ড়েছিলাম। ঢাকার পাড়াগেঁয়ে চাষাদের কথার অবিকল অনুকরণ হ'য়েছিল। ধর্ম্ম-আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বাইবেলের উপদেশের অনুরূপ বাক্য আমাদের দেশের ধর্ম্মগ্রন্থেও আছে, এইকথা প্রকাশ ক'রতে গিয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ করতেই, দেখলাম, তিনি চৈতন্য-চরিতামৃত বিশেষ-ভাবে অধ্যয়ন ক'রেছেন। এক দিন রবিবারিক গির্জ্জা দেখতে গিয়েছিলাম, রেভারেণ্ড পেজ্ সেদিনকার আচার্য্যের কাজ ক'রেছিলেন।

দেখলাম, উপাসনার মধ্যে তিনি ভগবানের নিকট ভারতবাসীদের কল্যাণ কামনা ক'রলেন। আমি মাঝে মাঝে তাঁর আবাসে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে নানাভাবে আনন্দ উপভোগ ক'র্‌তাম।

ইংরেজ স্ত্রী

একজন বাঙ্গালীকে বন্ধুরূপে পেয়েছি, নাম—ডাক্তার দত্ত। কিছু-কাল পূর্ব্বে মিঃ গুপ্ত বলে লণ্ডন সহরে আমাদের অলঙ্কারের একজন ক্যানভাসার ছিলেন, ইনি ডাক্তার দত্তের বন্ধু। এই হিসাবেই ডাক্তার দত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। গুপ্ত তারপর লণ্ডনের বাইরে কোথায় কোন চিনির ফ্যাক্টরীতে চাকরী নিয়েছিলেন। ডাক্তার দত্ত ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে এসেছিলেন, অর্থ-সম্পদ হারা হয়ে বড় বিপদে পড়েন। পরে এক ইংরেজ মহিলার সাহায্যে ডাক্তারী বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং সেই মহিলার কন্যাকে বিবাহ করে স্বামী-স্ত্রীতে একটি ডিস্পেন্সারী চালাচ্ছেন। সাত বছরের একটি ছেলে হয়েছে—এই একটি মাত্রই সন্তান। ডাক্তার দত্ত বেশ ভাল মানুষ, ইংরেজ স্ত্রীটিও অতি শান্তশিষ্ট। সাধারণ দৃষ্টিতে ইং-বঙ্গের মিলিত এই দাম্পত্যজীবন বেশ এক রকমে কেটে যাচ্ছে বলে বোধ হয়। আমি মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে যেতাম, দেখতাম স্বামী রোগী দেখছেন, স্ত্রী কম্পাউণ্ডারের কাজ করছেন। কখন কখন একলা ডাক্তার দত্তকে ডিস্পেন্সারীতে পেয়ে আমাদের দু'জনার প্রাণ খুলে দিতাম। তিনি খুবই আমোদ প্রিয়—আমাকে একলা পেয়েই প্রাণ খুলে বাংলা গান শুনিয়ে তাঁর প্রাণের রুদ্ধ সঙ্গীতরসে একটু স্রোত বহাতেন। বাঙ্গালী আমি, নিরবচ্ছিন্ন কিচির-মিচির ভাষার দেশে এসে পড়ে তাঁর মুখে সরস মধুর বাংলা গান শুনে মুগ্ধ হতাম বটে—কিন্তু আর

এক দিকে ডাক্তার দত্ত এই বাংলার রসভরা প্রাণখানি এই ইংরেজ-মহিলার প্রাণে মিলিয়ে দিয়ে কি বিকট জীবন ভোগ করছেন, তাই ভেবে অভিভূতও হতাম। মনে হ'ত তাঁর প্রাণপাখী বাংলার ঘনশ্যাম নিবিড় কুঞ্জপানে ছুটছে—বাঁধা আছে কেবল বিদেশিনীর মোহলুব্ধ জালে আট্কে পড়ে। ছেলেটির মুখে শুনেছি, তার বাবা কখন কখন মধ্যরাত্রে বারান্দার এককোণে ব'সে পাগলের মত কি এক বিকট রব করেন, অর্থাৎ কিনা ঐ তাঁর বাংলা গান। বিদেশিনীর হাতে বাঁধা পড়ে ডাক্তার সাহেবের জীবনটা যে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে কেটে যাচ্ছে, তাঁর গভীর প্রাণের একথাটা আমি তাঁর কাছ থেকে আদায় করতাম। ইং-বঙ্গ সম্মিলিত দাম্পত্য জীবনের আরও অনেক গভীর তত্ত্বও তাতে বেরিয়ে পড়ত। ডাক্তার একদিন আমাকে ব'লছিলেন—"বলব কি নন্দী মশায়, আমার হাত কেটে একদিন রক্ত বেরিয়েছিল, মেমসাহেব দেখে তাজ্জব হয়ে বলেছিলেন—"এঁ্যা, ভারতবাসীর রক্ত ত তাদের গায়ের রঙের মত কাল নয়, এ যে আমাদেরই রক্তের মত লাল।" আমি ভাবলাম, এক দেশের সম্বন্ধে আর এক দেশের অভিজ্ঞতা এমনই বৈচিত্র্যময় বটে। ডাক্তার দত্ত আমার অনেক উপকার করতেন, সেটা শুধু আমাকে বলেই নয়, বাংলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে যে অভাব অনুভব করতেন, তারই কতকটা পূরণ করতেন বাঙ্গালীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে।

পপলারে ভারতীয় পল্লী

লণ্ডনের পূর্ব্ব প্রান্তে পপ্লার (Poplar) বলে একটা স্থানে অনেকগুলি ভারতীয় লোক বাস করে। এরা অনেকটা স্থায়ীভাবে লণ্ডনের অধিবাসী হয়ে গিয়েছে। এদের অধিকাংশই, পঞ্জাব, পেসোয়ার প্রভৃতি ভারতের

উত্তর পশ্চিম প্রান্তের লোক, বিশেষ শিক্ষিত নয় বরং অনেকেই অশিক্ষিত। এদের কারও কারও সহরে ভারতীয় রেশমী কাপড়, পাথরের মালা, হাতীর দাঁত, পিতলের খেলনা প্রভৃতির দোকান আছে—অশিক্ষিতেরা রেশমী কাপড়ের ফেরি করে। কেউ কেউ এখানকার নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ কন্যা বিয়ে করে' সপরিবারে বাস করছে। অশিক্ষিত লোকগুলিকে দেখে মনে হয়, কেউ কেউ ভারতবর্ষ থেকে জাহাজের খালাসী প্রভৃতি নিম্নতর কর্ম্ম নিয়ে লণ্ডনে পৌঁচেছে। এই পপলারের নিকটেই অনেকগুলি জাহাজের ডক আছে। আমি কয়েকদিন তাদের পাড়া দেখতে গিয়েছি। যদিও তারা অনেকেই হীন অবস্থার লোক, তথাপি ভারতীয় হিসাবে আমাকে খুবই আদর যত্ন করত। আমি আমার এই স্বদেশবাসীদের মধ্যে বেশ একটু কর্ম্ম-প্রবণতার সাড়া দেখে সুখী হয়েছিলাম।

একদিন সন্ধ্যায় তাদের একটি হোষ্টেলে গিয়ে দেখলাম, নিজেরা রান্না-বান্না করছে—সেই জাহাজের খালাসীদের মত মস্ত বড় তামার ডেক্‌চিতে ভাত ডাল রান্না হচ্ছে, তবে বিশেষ নোংরা নয়, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—এটা বোধ হয় এ দেশের শিক্ষার গুণে। যার যার কাজ থেকে এসে সন্ধ্যার পর সবাই একত্র হয়েছে, কোথাও জন কয়েক মিলে আড্ডা দিচ্ছে—কোথাও তাস খেলছে—কয়েকজন মিলে একটা ইংরেজ ঝিকে নিয়ে রং তামাসা করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। কয়েকটি অল্প বয়সের যুবক ছেলেকে দেখলাম—নিরিবিলি একপ্রান্তে গিয়ে মোমের বাতির আলোতে সামান্য ইংরেজী লেখাপড়া শিখছে। এরা সকলেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা অশুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলে। অবশ্য নিজেরা পরস্পর কথা কইবার সময় যার যার মাতৃভাষায় কথা কয়। বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটা তারা একেবারে দূর করেছে।

সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে একদিন অল্‌গেটের গরীবদের হাট দেখতে

গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকটি গরীব ভারতীয় লোকও বাজার করতে এসেছে দেখলাম। একজনের সঙ্গে আলাপ করতেই সে আমাকে পপলারে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইল। আমি ঔৎসুক্য বশতঃ রাজি হলাম। মটরবাসে করে আমাকে দু' মাইল দূরে তার বাড়ীতে নিয়ে পৌছল। তার ইংরেজ স্ত্রীটি একটু ভদ্র ধরণের, আমার চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমার সঙ্গে বেশ গল্প আরম্ভ করল। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বামী ইংরেজী জানে না---পাঁচটি শব্দের কথাটি দু'তিন শব্দে শেষ ক'রে কোনমতে ভাব প্রকাশ করে; এই রকম করেই স্ত্রীর সঙ্গেও কথা কয়ে সংসার করে। স্ত্রীটি স্বামীকে শুনিয়ে আমাকে বলছিল—দেখ আমার স্বামী কেমন নির্দ্দয়, আমি একটু পিয়ানো বাজানো ভালোবাসি—কিন্তু কত বলি, তবু আমাকে একটা পিয়ানো কিনে দেয় না। আমি ভাবলাম, মেয়েদের বায়নাগুলো অনেকস্থলেই অবস্থা ডিঙ্গিয়ে একটু উপরে চলে। পুরুষটি কিন্তু বেশ হিসেবী, নিজে সহরে গিয়ে রেশমী রুমাল, তোয়ালে ফেরি করে বিক্রী করে—আর স্ত্রীকে দিয়ে বাড়ীর কাছে রেশমী কাপড়ের ছোট একটি দর্জ্জি দোকান করে দিয়েছে। স্বামী ফেরিতে গেলে স্ত্রী দোকানে ব'সে দর্জ্জির কাজ করে। তারা ছোট একটি বাড়ী কিনে তাতেই বাস করছে, তার খানিকটা অংশ আবার অন্যকে ভাড়া দিয়েছে। ছ'বছরের একটি মাত্র ছেলে—বেশ মায়ের মত সাদা গায়ের রং তার, ইংরেজীতে সে আমার সঙ্গে বেশ আলাপ করল। পিতার ভাষা সে একটুও পায় নি। সংসারটিতে বিশেষ অশান্তির কোন লক্ষণ দেখা গেল না—লোকটা ব্যবসায়ী, তাই বেশ চলছে, কেরাণী হলে বোধ হয় বাবুগিরির চোটে সিকেয় হাঁড়ি ঝুলত। এই মত অনেক ভারতীয় লোক নানাভাবে পপলারে বসবাস করে। শিক্ষিত লোকেরা বিলাতে গিয়ে এদের সঙ্গে বড় একটা আলাপ পরিচয় করেন না—তাই এদের সংবাদ অনেকেই জানেন না।

ভারত সম্পর্কিত দু'চার কথা

লণ্ডনে ভারত সম্পর্কীয় বিষয়গুলির মধ্য থেকেই আমি কয়েকটি কথা বলেছি এবং আরও ছোটখাটো কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করব—

লণ্ডনের উত্তর প্রান্তে গোল্ডার্সগ্রীণ বলে একটা জায়গায় ভারতীয় প্রথায় শবদাহ করবার জন্য একটি শ্মশান তৈরী হয়েছে। লোহার ফ্রেমের উপর শব রেখে গ্যাসের চুল্লীর ভিতর নিয়ে দাহ করা হয়। শ্মশান বাড়ীটি সুবিস্তীর্ণ জমির উপর ফুলের বাগানে সুসজ্জিত, একদিকে তোরণ-দ্বার ও বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত অট্টালিকা এবং আর তিনদিকে উঁচু দেয়ালে ঘেরা। কুচবিহারের মহারাজা ৺নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের, তাঁহার দুই পুত্রের এবং আরও অন্যান্য ভারতীয় বিশেষ বিশেষ লোকের মৃত্যুর স্মৃতিচিহ্ন বিভিন্ন গৃহের দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে।

কয়েকজন ভারতীয় মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক ইয়োরোপের বড় বড় সহরে ধর্ম্ম প্রচার করে থাকেন,—লণ্ডনে তাঁদের দু'তিন জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; এঁরা লণ্ডনের এক প্রান্তে একটি মসজিদ করেছেন। সেখানে মাঝে মাঝে সভা করে সর্ব্ব সাধারণকে আহ্বান করেন। হাইড্ পার্ক কর্ণারে যে সকল বক্তৃতা ক্ষেত্র আছে সেখানেও তাঁদের ধর্ম্ম প্রচার করতে দেখেছি। ইয়োরোপবাসী সকলেই হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মের খবর বেশী রাখেন, কেন তা বুঝি না, বোধ হয়—মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজের সঙ্গে খৃষ্টান জাতির ধর্ম্ম ও সমাজের অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলে। আর, একটা স্বাধীন জাতির ধর্ম্ম অপেক্ষা পরাধীন জাতির ধর্ম্মকে একটু তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখা স্বাধীন জাতির রীতিও বটে—তাই বিলেতে মুসলমান ধর্ম্মের যেমন স্থান আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থানও তার চেয়ে কম নয়।

বুদ্ধদেব ও মহম্মদের জীবনী প্রত্যেক ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত জানে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা অনেকেরই নাই। হিন্দুর দর্শনের আদর—সে কেবল গুটিকতক উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

একটি ভারতীয় রেষ্টুরেণ্ট্

একটি ভারতীয় মুসলমান লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ অংশ পিকাডেলীতে একটি ভারতীয় রেষ্টুরেণ্ট অর্থাৎ হোটেল করেছে। এটির নাম তার নিজের নাম অনুসারে 'আবদুল্লা রেষ্টুরেণ্ট'। লোকটা উচ্চ শিক্ষিত না হলেও ভাল মানুষ বটে। যে সকল ইংরেজ ভারতে এসে মুসলমান বাবুর্চিদের হাতের নবাবী রান্না খেয়েছে—তারা দেশে গিয়ে সে স্বাদ ভুলতে পারে না, তাদের অনেকে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে এনে এই হোটেলটিতে খায়। আবদুল্লা প্রথমে বোধ হয় নিজেই হোটেলের রান্না করতো, এখন সে অনেক ইংরেজকে শিখিয়ে নিয়েছে—তাদের দিয়েই রান্না ও আর আর হোটেলের সব কাজ করায়। দেখলাম আবদুল্লা যুবক; চেহারাটা খুব ভাল না হলেও ভাল মানুষ। প্রথমে এদেশে এসে একটা ইংরেজের হোটেলে বাসন-কোসন ধোয়া চাকুরী নিয়ে পরে এ দেশের হোটেল চালাবার সমস্ত আদব কায়দা শিখে নেয়। তার পর একটা ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে তাকে নিয়ে এই রেষ্টুরেণ্ট খুলেছে। বেশ সুনাম হয়েছে—বেশ দু'পয়সা আয় করছে। এখন তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ভদ্র ভাবে চলে। ইংরেজ চাকর চাকরাণী রেখে হুকুম করে কাজ চালায়। বাইরে থেকে-য়া দেখেছি তাই লিখলাম, ভিতরের সুখ দুঃখের খবর জানি নে।

রীতি-নীতির বৈষম্য

বিলাতের রীতি-নীতির সঙ্গে আমাদের বৈসাদৃশ্যের বিষয়ে দু'একটী কথা এখানে উল্লেখ করব—

একটা হোটেলে একজন নিরামিষ-ভোজী মহিলার সঙ্গে আমার গল্প হচ্ছিল—তার কাছে জানলাম, নিরামিষ-ভোজীরা মাছ মাংস খায় না বটে কিন্তু ডিম খায়। ডিম যে মাছ মাংসের মতই আমিষ খাদ্য এই কথা আমি তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করবার পর তিনি আমাদের দেশের নিরামিষ ব্যবস্থা জানতে চাইলেন। আমি নানা নিরামিষ খাদ্যের সঙ্গে দুধ, ছানা, মাখনের উল্লেখ করতেই তিনি দুগ্ধাদিকে সম্পূর্ণ আমিষ বলেই আমাকে বোঝালেন। কথাটা আমার কাছে খুব নূতন লাগলেও অনেকাংশে যে সত্য তা স্বীকার করতে হল

ভারতীয় রীতিনীতির ধারা এদেশীয়দিগকে বোঝান বড়ই শক্ত। এ দেশে খেয়ে কখনও মুখ ধোয় না, অবশ্য চামচে দিয়ে খায় বলে খাদ্য দ্রব্য ঠোঁটে লাগে না। আমি একদিন একটি স্ত্রীলোককে শুনাচ্ছিলাম যে, আমাদের দেশে আহারের পর জল দিয়ে মুখ ধোবার ব্যবস্থা আছে। তবু স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"মুখ ধোও খাওয়ার আগে কি পরে ?" আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে ইয়োরোপ বাসীদের ধারণা অদ্ভুত রকমের। আমার প্রতি প্রশ্ন হত—ভারতীয় মেয়েদের নাকি কত কি সৃষ্টিছাড়া নিয়মে জীবন কাটাতে হয় ? মাথা মুখ চোখ কাপড় মোড়াই করে নাকি থাকতে হয় ? সাধারণের সম্মুখে নাকি স্বামীর সঙ্গে কথা কওয়া নিষেধ ? স্বামীকে নাকি কোন কিছু বলে সম্বোধন করতে নেই ? স্বামীও নাকি স্ত্রীকে কোন কিছু বলে ডাকে না ? আবার নাকি এক সংসারে বাস করতে হয় অথচ সারাজীবন কথা কইতে পারবে না, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এমন সম্বন্ধও পালন করে চলতে হয় ?

ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল অভিযোগের ভাল কিছু উত্তর যে আমি দিতে পারি নি, তা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই অনুমান করে নিতে পারেন।

একটি মহিলা একদিন গভীর দুঃখের সঙ্গে একটা কথা বলেছিলেন—কথাটা খুবই সাধারণ হলেও চিন্তা করবার বিষয় বলেই এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বল্লেন—"ভারতে বাসকালে আমি সেখানকার অনেক রীতি-নীতি পছন্দ করতাম, কিন্তু একদিনের একটি ঘটনা আমাকে বড়ই ব্যথিত করেছিল। মান্দ্রাজে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ গল্পাদির পর তাঁর কন্যার সঙ্গে আলাপ করতে একটি ঘরে গিয়ে দেখলাম কন্যা তখন আহারে বসেছে—হঠাৎ আহার পরিত্যাগ করল,—জানলাম আমি ঘরে প্রবেশ করার জন্যে তার আহার্য্য দ্রব্য অভক্ষ্য হয়ে গিয়েছে।" আমি নিতান্তই দুঃখিত হলাম, লজ্জিতও হলাম। সেই দিন মনে হল—এমন কুরীতি, এত ক্ষুদ্রতা, এমন মনের দুর্ব্বলতা যাদের মধ্যে, জগতে তারা কখনও বড় হতে পারে না। স্ত্রীলোকটি গভীর দুঃখের সঙ্গেই কথাটা বলেছিলেন।

এ দেশে বসে ভারতের সম্বন্ধে যা একটু গল্প শোনে তার মর্ম্ম বুঝতে না পেরে অনেকে অনেক রকম ভ্রান্ত মত পোষণ করে। এতে ভারতকে খাটো করা হয় দেখে দুঃখিত হয়েছি। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমরা নাকি বানর পূজো কর? বানর কি রকম দেবতা? পূজো করবার সময় সে কি করে? ঠিক হয়ে বসে থাকে তো, অথবা তাকে বেঁধে নিয়ে পূজো করতে হয়? সাপ দেবতাকে কি রকম পূজো কর? তাকে মেসমেরিজ (মন্ত্রমুগ্ধ) করে নাও, কি মেরে ফেলে তারপর পূজো কর?—এই রকম অনেক সত্য মিথ্যা জড়িত অদ্ভুত কথা ভারতবাসীর সম্বন্ধে ইংরেজের দেশে প্রচলিত আছে।

একদল অশিক্ষিত লোক রাস্তার ধারে আগুন পোয়াচ্ছিল, আমি পথ চলতে তাদের কাছে গিয়ে একটু হাত পা গরম করছিলাম, আমাকে জিজ্ঞাসা করল—ক'টা বিয়ে করেছ ? আমি সাদাসিদে ভাবে 'একটা' বলে উত্তর করতেই তারা হো হো করে হেসে ফেলল। কেউ কেউ বলল, একটা বিয়ে তোমার কখনো না--ভারতবাসী এক এক জনের অনেকগুলো করে স্ত্রী থাকে, আর তুমি বলছ কিনা একটা স্ত্রী তোমার! আমি অবশ্য আগুনে বেশ গরম হচ্ছিলাম কিন্তু তাদের কথায় আমার মন একটুও গরম হয়নি, কারণ আমাদের দেশে এরকম দোষ কোনোকালে নাই বলা তো চলে না, তবে বিভিন্ন দেশবাসীরা সেই দোষটাকে একটু জমকাল করে তুললে তাতে রাগ করবার আর কি আছে ?

এখানকার ন্যাচরাল হিষ্টোরিক্যাল মিউজিয়মে দেখেছি, নানাদেশীয় চিত্রিত মনুষ্য মূর্ত্তির সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু মূর্ত্তি বলে একটা কিম্ভূত-কিমাকার মূর্ত্তি রাখা হয়েছে—মূর্ত্তির মুখে লম্বা লম্বা চুল দাড়ী, গোঁফগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে অঙ্কন করা হয়েছে, তাতে মুখখানা একটা নরসিংহের আকার ধারণ করেছে—তার উপর মোটা মোটা সাদা রংএর তিলকের ছাপ। ভারতীয় হিন্দুদের পক্ষ থেকে এদের কর্ত্তৃপক্ষকে জানান উচিত, হয় ঐ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ভারতীয় হিন্দুমূর্ত্তির একটি আদর্শ (যেমন বালগঙ্গাধর তিলকের মূর্ত্তি প্রভৃতি) ঐ স্থানে রাখা হোক, নৈলে হিন্দু মূর্ত্তি কথাটা তুলে দেওয়া হোক।

মহাত্মার কথা

একদিন সহরের একটা জনাকীর্ণ ক্ষেত্রে কতকগুলি সমর বিভাগীয় ইংরেজের সঙ্গে আমার ছোটখাটো একটা বাকযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে চারিদিকে খুব লোক জমে গিয়েছিল। তারা বলছিল—ইংরেজ রাজত্বের অধীনে তোমরা নিশ্চয়ই বেশ শান্তিতে আছ।

আমি বললাম— প্রত্যেক জাতিই স্বাধীনতা ভালবাসে।

সৈন্যেরা— ইংরেজ যে তোমাদিগকে অনেক রকম শান্তিতে রেখেছে, তোমরা নিজেরা কি আর তেমন পারতে ?

আমি— পারতাম না কেন ? আমাদের ভালর ব্যবস্থাগুলি অবশ্য আমরাই ভাল বুঝি।

সৈন্যেরা— দেশ পরিচালনের জন্য দেশে খুব ভাল মানুষ চাই, যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা চাই, তোমাদের কেউ তেমন আছে কি ?

আমি— আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধির মত ভাল মানুষ, অমন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আজকাল সারা জগতে নাই, তা তোমরা শোন নাই কি ?

সৈন্যেরা— হো—হো, গান্ধি—গান্ধি তো অতি মন্দ মানুষ, অনর্থক ভারতের নিরীহ মানুষগুলি ক্ষেপিয়ে তুলছে।

আমি— ভারতের অধিকাংশ মানুষ যাঁর নামে মস্তক অবনত করে, সারা জগতের মনীষিগণ যাঁর আদর্শ মানবতায় মুগ্ধ, তাঁকে কখন মন্দ মানুষ ব'ল না, বললে পাপ হয়।

সৈন্যেরা— গান্ধি যদি দোষী না হবে তবে তাকে জেলে আটক রাখা হয়েছিল কেন ?

আমি— হাঁ দোষীই বটে, যিনি দেশবাসী ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের অন্তরের রাজা, বিদেশী রাজার কাছে তিনি অপরাধীই বটেন। তবে মহাত্মা গান্ধি আমাদের কতখানি অন্তরের রাজা—সে হিসাবে তিনি তোমাদের কাছে কতখানি অপরাধী, তা তোমরা অতি অল্পই জেনেছ, তাই জেলে দিয়েছিলে ; তাঁকে সম্যক যদি জানতে—তবে তাঁকে বোধ হয় ক্রুশে দিতে। 'ক্রুশ' কথাটায় আমি নিরপরাধ যীশুখৃষ্টের প্রতি শাস্তির কথাটাইই তাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম।

তারা সকলেই আবার হো হো করে হাসল। তখন সন্ধ্যা হয়েছে—

কন্‌কনে শীত, তারা আমাকে একটা মদের দোকানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলল,—চল ভাই, একটু গরম হওয়া যাক।

আমি বললাম— না, আমি ওসব খাই না।

তারা বলল— কেন ?

আমি বললাম— গান্ধি মহারাজের হুকুম।

আমাদের দোষ

আমাদের ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজদের সঙ্গে কথা কইতে যেমন একটু সঙ্কোচ ভাব দেখাই, উচিত কথা বলতেও ভয় করি, বিলাতে ও রকম করবার কিছুই দরকার হয় না। সোজাসুজি মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন ব্যবহার আবশ্যক তেমনই চলে। পরাধীন জাতি বলে কেউ কখন অবজ্ঞার চক্ষে আমাকে দেখেছে এমন মনে পড়ে না, বরং বিদেশী আগন্তুক বলে একটু বেশী সম্মান সহানুভূতিই তারা অনেকস্থলেই দেখিয়েছে।

ভারতের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বিষয়ক উপরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলাম বটে কিন্তু আমাদের দেশের বহু আবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় ওদের প্রত্যেকেরই জানা আছে। একটা মেটাল ফ্যাক্‌টরী (ধাতুদ্রব্যের কারখানা) দেখতে গিয়েছিলাম। দেখা শুনার পর মালিক আমাকে প্রশ্ন করলেন— "আপনাদের বাংলার তাপের পরিমাণ কত থেকে কত ডিগ্রী ?" আমি তখন খুব সঠিক উত্তর দিতে পারি নাই। এই শীতোষ্ণতার উপর দেশের বহু আবশ্যক বিষয়ের নির্ভর করে। ধাতুদ্রব্যের বর্ণ পরিবর্ত্তন, গালা মোম সাবান রবার স্যালুলয়েডের দৃঢ়তার তারতম্য, মাছ মাংস ঘৃত মাখন দুগ্ধাদি খাদ্য দ্রব্যের গুণ পরিবর্ত্তন, সূতা ও পশমী বস্ত্রের ব্যবহারের

পরিমাণ নির্ণয় প্রভৃতি অনেক ব্যবসাবাণিজ্যগত বিষয় নির্ভর করে এই দেশের শীতোষ্ণতার পরিমাণের উপর। *

আমাদের দেশে আমরা নিজের জ্ঞান নিয়েই তুষ্ট--বরং তাই নিয়ে আবার অহঙ্কারও যথেষ্ট। কিন্তু ইংরেজের জ্ঞানের অহঙ্কার নাই, শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায়, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় আজীবন তারা ছাত্রের মত।

একটা কথা পাঠকগণের স্মরণ রাখতে হবে, ভারতে সাধারণ ইংরেজগণের সঙ্গে আমাদের যে রকম সম্বন্ধ, তা নিয়ে ইংরেজ জাতটার বিচার করা চলবে না। আপন দেশে ইংরেজ চলে মানুষের মত—আর জয় করা দেশে চলে প্রভুর মত। এই প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধের ভিতর উভয় পক্ষই আমরা বিশ্বপ্রেম ভুলে যাই, প্রকৃত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলি।

* ইংলণ্ডের তাপের পরিমাণ—শীতকালে ৩০″ থেকে গ্রীষ্মকালে ৬০″ ডিগ্রি। স্কটলণ্ডে শীতকালে কখনও ২০″ ডিগ্রী, ক্বচিৎ ১০″ ডিগ্রি মাত্র তাপ থাকে। বাংলার তাপ সাধারণতঃ শীতকালে ৬০″ ডিগ্রি, গ্রীষ্মকালে ১১০″ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ওঠে।

চতুর্থ অধ্যায়

[লণ্ডনের বিবরণ]

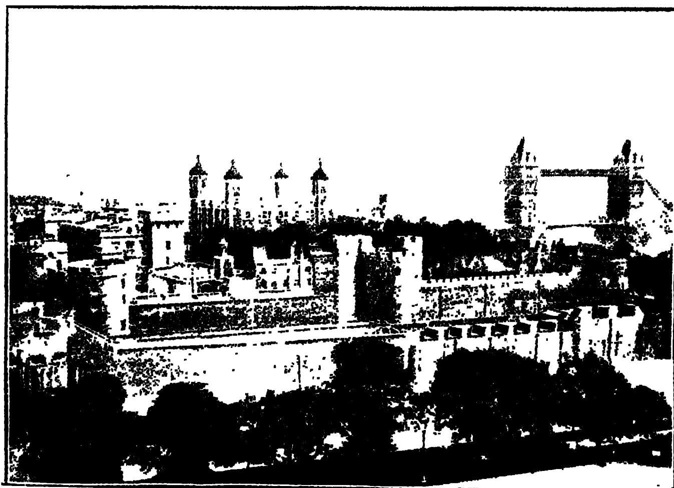
পরিচয়

লণ্ডন সহরটি টেমস নদীর দুই পার্শ্বে পূর্ব্বদিক থেকে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত অন্যান বোল মাইল স্থান মধ্যে অবস্থিত। প্রস্থে বারো মাইল ধরা যেতে পারে, সহরের অধিকাংশ প্রধান বিষয় উত্তর পারে। টেমসের পূর্ব্বদিক সমুদ্র থেকে আরম্ভ করে লণ্ডন পর্য্যন্ত পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে নদীর উভয় তীরে কেবল জাহাজপূর্ণ ডক; তন্মধ্যে গ্রেভসেণ্ড, টিলবেরী, উলউইচ প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় বন্দরে প্রচুর জাহাজী মাল আমদানী রপ্তানী হয়— এ সবই লণ্ডন সহর সম্পর্কীয় হলেও এ গুলি বাদ দিয়ে ঘন সন্নিবদ্ধ ষোল মাইল স্থানকে সাধারণতঃ লণ্ডন সহর বলা হয়।

লণ্ডন সহরের লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে সহরতলী সমেত সত্তর লক্ষ। কলকাতার প্রায় ছয়গুণ। এ ছাড়া প্রতিদিন দশ লক্ষের উপর লোক ডেলি-প্যাসেঞ্জার বাইরে থেকে এসে সহরে কাজ করে সন্ধ্যায় ফিরে যায়। সহরের মধ্যে লোকের গতিবিধির প্রধান তিনটি উপায় আছে—আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলওয়ে, মটরবাস এবং ট্রামওয়ে; এ ছাড়া ট্যাক্সি মটর গাড়ীতে সহর ভরপুর।

টেমসের সুড়ঙ্গ

টেমসের পূর্ব্বদিক থেকে সমুদয় জাহাজ সহরে আমদানী হয়। তাই ঐদিকে নদীর উপর দিয়ে কোন পোল তৈরী করা হয় নি—টেমসের নীচে দিয়ে পরপর চারটি টানেল বা সুড়ঙ্গ করা হয়েছে। এর প্রথম সুড়ঙ্গটি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করে বিশ বৎসরে সম্পন্ন হয়। টেমসের সুড়ঙ্গ



লণ্ডন টাওয়ার ও টাওয়ার ব্রিজ

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য বলে গণ্য হয়ে আসছে। তারপর আরও দুটি সুড়ঙ্গ হবার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শেষটী তৈরী হয়। বড় সুড়ঙ্গ দু'টী—প্রত্যেকটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ছয় হাজার দুই শত ফিট, প্রস্থ ছত্রিশ এবং উচ্চতা কুড়ি ফিট। আরও আশ্চর্য্য বিষয়, নদীর তলদেশের

জল থেকে সুড়ঙ্গের জমি মাত্র পনর ফিট পুরু। সুড়ঙ্গের ভিতর রাত্রি দিন বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত থাকে।

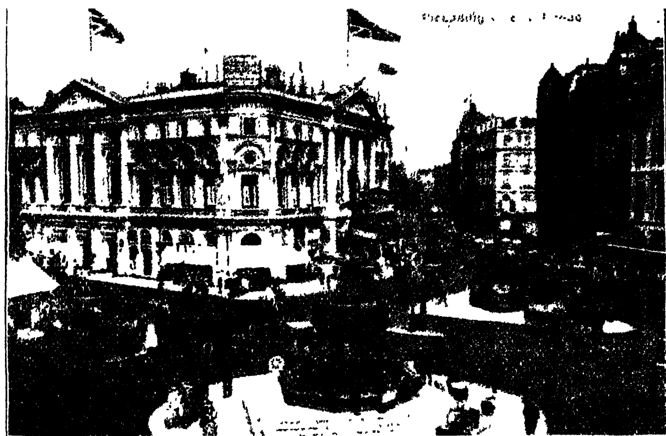
এই চারটি সুড়ঙ্গের পর টেমসের উপর একটি আশ্চর্য্য কৌশল সম্পন্ন পোল করা হয়েছে, এটির নাম টাওয়ার-ব্রিজ। এই পোলের মধ্যকার খানিকটা অংশ কবাট খোলার মত মাঝখান থেকে দু'দিকে উঁচু করে জাহাজ গতিবিধি করান হয়। প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তের হাজার গাড়ী, মটরলরী প্রভৃতি ভারী যান এবং পঞ্চান্ন হাজার পায়ে হাঁটা লোক এই পোলের উপর দিয়ে যাতায়াত করে। এই পোলের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে লণ্ডন-ব্রিজ নামক সুপ্রশস্ত সেতু, আর তারপর থেকেই প্রায় আধ মাইল অন্তর বিভিন্ন রকমের এক একটি চমৎকার সেতু টেমসের উপর দিয়ে গিয়েছে। মোট এই ষোল মাইল স্থানের মধ্যে টেমস নদীতে ৪টি সুড়ঙ্গ, ৬টি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেল সুড়ঙ্গ, ৫টি রেলওয়ে সেতু এবং লোকজন চলবার ১৬টি উৎকৃষ্ট সেতু আছে। এই যে ষোলটি লোক-চলাচলের সেতু এর ৫টির উপর দিয়ে ট্রামওয়ে গিয়েছে—আর লোক চলবার সমস্ত পোলগুলির উপর দিয়েই দ্বিতল মটরবাস প্রচুর পরিমাণে গতিবিধি করে। টেমস নদীটি সহরের মধ্য দিয়ে খুবই সর্প-বক্রগতিতে গিয়েছে। এই ষোল মাইল দীর্ঘ সহরের মধ্যে বক্রতার জন্য টেমসের দৈর্ঘ্য অনুমান ২৪ মাইল হবে। সমুদ্রের দিকে টেমস্ বেশ প্রশস্ত কিন্তু সহরের মধ্যস্থলের পাঁচ মাইলের মধ্যে টেমস প্রস্থে পাঁচ ছয় শত ফিট মাত্র, কলকাতার নিকটের গঙ্গা নদীর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র; আর লণ্ডনের পশ্চিম দিকে টেমসের দৈর্ঘ্য দুই শত ফিটের বেশী নয়।

ডক্‌, পার্ক ও রাস্তা

সহরের মধ্যে টেমসের পূর্ব্বাংশের দুই ধারে অনেকগুলি ডক্‌ জাহাজে পূর্ণ থাকে, এ ছাড়া টেমসের ভিতরে ছোট বড় জাহাজ, মাল বোট প্রভৃতিতে ভরা; তারপর থেকে চার মাইল পর্য্যন্ত টেমসের উত্তর ধারে সুন্দর সুপ্রশস্ত রাস্তা করা। তার মধ্যে ভিক্টোরিয়া এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট নামক প্রায় এক মাইলের উপর স্থান পরম রমণীয় এবং সরকারী বড় বড় আপিস প্রভৃতি এরই অনতিদূরে পর পর সুসজ্জিতরূপে অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ পার্লিয়ামেণ্ট হাউস টেমসের তীরে সগর্ব্বে বিরাজমান; এমন সুবৃহৎ সৌধ লণ্ডন সহরে চার-পাচটির বেশী নাই। লণ্ডন টাওয়ার নামক বিখ্যাত প্রাচীন ঐতিহাসিক ভবনটীও টেমসের তীরে অবস্থিত। চীন, ভারতবর্ষ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান থেকে সংগৃহীত কয়েকটি সুদীর্ঘ কামান লণ্ডন টাওয়ারের নিকট টেমসের তীরে সারি সারি সাজান রয়েছে। টেমসের ভিতর দিয়ে বরাবর প্যাসেঞ্জার ষ্টিমার যাতায়াত করে।

লণ্ডন সহরের ভিতরে ছোটবড় অনেকগুলি পার্ক বা উদ্যান আছে। এর প্রত্যেকটা বিভিন্ন রকমের সুন্দর। হাইড-পার্ক, কেন্‌সিংটন-গার্ডেন, রিজেণ্ট-পার্ক, বাটার-সি-পার্ক প্রভৃতি খুবই বড়। এর এক একটির পরিধির বেষ্টন প্রায় তিন-চার মাইল। ছোট ছোট পার্কগুলি বসন্তকালে নানা জাতীয় ফুলে সুশোভিত হয়। এত বড় সহরের মধ্যে এমন সুন্দর সুন্দর পার্ক না থাকলে লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। হাইডপার্ক-কর্ণার, ট্রাফালগার-স্কোয়ার প্রভৃতি কয়েকটি স্থান বিকালে বহু জনাকীর্ণ হয় এবং সেখানে নানা বিষয়ের বক্তৃতা হয়ে থাকে। হাইড পার্ক-কর্ণারে কখন কখন আট দশটি স্থানে একই সময়ে বিভিন্ন রকমের বক্তৃতা হতে দেখেছি।

পিকাডিলি, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, নিউ অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, চেরিংক্রস্ প্রভৃতি স্থানের রাস্তার দু'ধারে সুসজ্জিত বড় বড় দোকানগুলি দেখলে প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। সহরের প্রধান প্রধান থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি আমোদ উৎসবের কেন্দ্রস্থল পিকাডিলি। পিকাডিলি সার্কাস নামক স্থানটি বড়ই জমকাল। রাত্রিকালে চারদিকে উৎসব গৃহ, হোষ্টেল, রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতি আলোক মালায় সুশোভিত হয়, এ ছাড়া বৈদ্যুতিক আলোক সম্পন্ন নানা প্রকারের বিজ্ঞাপন সমূহ প্রতিমুহূর্ত্তে নবভাবে নানাবর্ণে



পিকাডিলি সার্কাস

রূপান্তরিত হয়ে দর্শকের মনোহরণ করে। ঐ সকল বিজ্ঞাপনের কোন কোনগুলিতে আশ্চর্য্য আলোকের ছবিতে অভিনয় প্রদর্শিত হয়। সন্ধ্যার পর পিকাডিলি যেন ইন্দ্রপুরী।

সিটি

সহরের খানিকটা অংশের নাম চিফ্ সাইড্ বা সিটি, অর্থাৎ কলকাতার হিসাবে এর নাম বড়বাজার রাখা যেতে পারে; অত্যন্ত ঘন সন্নিবদ্ধ এবং বহু মালপত্রের পাইকারী আমদানী রপ্তানীর স্থান। যে দোকানে যে জিনিসের কারবার ঐ জিনিসের সামান্য দু'একটা নমুনা সদর দরজায় সাজান রয়েছে—দোকানের ভিতরে ঢুকলে বিশাল এক একটি হল্‌এ বহু প্রকারের জিনিস স্তরে স্তরে সজ্জিত দেখা যায়। এই মত সেই বাড়ীটার তিন-চার তল পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকার পণ্য জিনিসে পূর্ণ। সিটি এত বড় আমদানী রপ্তানীর স্থান—তবু ভিতর-বাহির, পথ-ঘাট সমস্তই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গাড়ী ঘোড়ার ভিড়ও কলকাতার বড়বাজারের ভিতরকার মত বিশ্রী নয়।

লণ্ডনের কোন্ জিনিস কোথায় পাওয়া যায়, নূতন লোকের পক্ষে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হলেও বন্দোবস্তের গুণে অতি সহজ হয়েছে। কমার্শিয়াল-গাইড্ বলে বই আছে, তাতে সহরের প্রত্যেক বড় বড় দোকানের বিবরণ আছে—আবার বিভিন্ন দ্রব্যের প্রাপ্তি স্থানের সুন্দর তালিকা আছে। কমার্শিয়াল-গাইড বই অবশ্য কলকাতার জন্যও আছে কিন্তু তাতে সাহেবদের কারবারের সাহায্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশীয়দের বিশেষ কাজ হয় না। পৃথিবীতে যেখানে যত বড় বড় কারবার আছে, তাদের অধিকাংশেরই আপিস লণ্ডনে আছে। তারপর বিলাতের বিভিন্ন সহর পল্লীর বড় বড় কারবারগুলির প্রধান আপিস তো লণ্ডনে রয়েছেই।

লণ্ডনের রাস্তাগুলি অধিকাংশই আঁকা বাঁকা, কিন্তু অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার উপর কেউ কোন কিছু ফেলে না, এমন কি দেশলাইয়ের খালি বাক্স, কলা, কমলা প্রভৃতি ফলের খোসা, টুক্‌টাক্ কাগজপত্রটুকু পর্য্যন্ত কেউ রাস্তায় ফেলে না—ঐ সকল ফেলবার জন্য রাস্তার মোড়ে পোষ্টারের গায়ে লোহার জালের ছোট ছোট খাঁচা বাঁধা রয়েছে। ঘর বাড়ীগুলি সমস্তই ছাইয়ে রংএর, আমাদের দেশের সহরের মত সাদা, লাল, হলুদ প্রভৃতি রং করা বাড়ী নাই। বাড়ীগুলি অধিকাংশই চার-পাঁচ তলা কিন্তু এ ছাড়া প্রত্যেক বাড়ীতেই সাধারণ জমির নীচে আর এক তল আছে। বিশেষ ঘন-সন্নিবদ্ধ স্থানগুলি ব্যতীত প্রায় স্থানেরই গৃহস্থ বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে একটু খালি জমি আছে। সম্মুখের অংশে পাতাবাহার গাছ ও নানারকম ফুল গাছ দিয়ে সাজানো। গৃহস্থ বাড়ীগুলির সম্মুখ ভাগের জানালাগুলি নানারকম সুন্দর সুন্দর কাচের মালা আর কাপড়ের ঝালোর দিয়ে সাজানো। ঘরের জানালাগুলি খুব বড় কাঁচের আবরণে ঢাকা। শীতকালে সমস্ত জানালা কবাট বন্ধ থাকে, নৈলে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকে ঘরের উত্তাপ নষ্ট করে দেয়।

গতিবিধি

সহরের মধ্যে গতিবিধির জন্য দু'এক মাইলের বেশী পথ চলতে মটর-বাসই সুবিধা। একটু বেশী দূরে যাবার জন্য আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলপথ উত্তম। সহরের যে কোন স্থান থেকে যে কোন স্থানে যেতে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলপথে পনর কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগে না। বাস্, ট্রাম বা ট্রেণের ভাড়া সাধারণতঃ প্রতি মাইলে ১ পেনি (১ আনা)। কোনপ্রকার যানেই

বেশী ভিড় হয় না, বাসে কখন কখন যাত্রীর স্থান অকুলান হয় কিন্তু বসবার নির্দ্ধারিত সিট পূর্ণ হবার পর কণ্ডাক্টরের ইচ্ছাক্রমে মাত্র ৪টী কি ৫টী লোক দাঁড়িয়ে যাবার জন্য নিতে পারে। সকল রকম যানেই স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সম পরিমাণে গতিবিধি করে। পথ-ঘাট, দোকান, হাটবাজার সর্ব্বত্র স্ত্রী-পুরুষ সমভাবে চলে। গ্রীষ্মকালে বিকাল চারটার পর থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রাস্তা পথ বহু লোকপূর্ণ হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই বেশী লোক রাস্তায় বের হয়। সারা শীতকালটা লোকে ঘরে বসে খুব কাজকর্ম্ম করে, আর গ্রীষ্মকালে খুবই আমোদ-আহ্লাদ খেলা ধূলায় কাটিয়ে বেড়ায়। বিশেষ বিশেষ উৎসব, মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি গ্রীষ্মকালেই খোলা হয়। বেড়াবার সখটা বিলাতবাসীদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র, ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সমান। রবিবার অথবা বিশেষ বিশেষ ছুটীর দিনে বহুসংখ্যক লোক সহরের বাইরে দশ-বিশ মাইল দূরে পর্ব্বত, প্রান্তর বা বনে বেড়াতে যায়। সহরের অনতিদূরে—এই রকম হেণ্ডনের মাঠ, পার্লিয়ামেণ্ট হিল, হ্যামষ্টেড্ হিথ, ইপিং ফরেষ্ট, ওয়ান্ ষ্টিড ফ্লাট্, রিচমণ্ড পার্ক, কিউ গার্ডেন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের বন, উপবন, পাহাড়, সমতল ভূমি প্রভৃতিতে স্ত্রী-পুরুষ বহুলোক ছুটির দিনে বন্ধুবান্ধবসহ বেড়াতে যায়। এই সব বেড়াবার স্থানে বেশী কিছু দেখবার না থাকলেও সহরের আবদ্ধতার মধ্যে বাসের পর মুক্ত স্থানে ভ্রমণ বিশেষ আনন্দদায়ক হয়।

লণ্ডনের রাস্তাগুলি খুব প্রশস্ত; দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ ধূসর বর্ণের উচ্চ চারতলা, পাঁচতলা বাড়ী। ষ্ট্রীটগুলি খুবই দীর্ঘ; সহরতলী সমেত লণ্ডনের ষ্ট্রীট সংখ্যা চৌদ্দ হাজারের উপর। সহরে যতগুলি বাড়ী তার কম বেশী অর্দ্ধেক বাড়ীতে লোক বাস করে। বাকী অর্দ্ধেক দোকান-পাট, কারখানা, আপিসাদি। কলকাতার মত বহু লোক ঠেসাঠেসি করে একবাড়ীতে কদাচ

বাস করে না। এক একটি শয়ন ঘরে একজন মাত্র লোক শয়ন করে, কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে একঘরে দু'তিন জনে শয়ন করে।

বাইরের চারদিক থেকে চৌদ্দটি রেল কোম্পানীর পৃথক্ পৃথক্ রেলওয়ে এসে লণ্ডন সহরের উপর পড়েছে, সেগুলি সহরের বাড়ী ঘরের মাথার উপর দিয়ে এসে সহরের বুকের উপর বিশাল আয়তন এক একটি ষ্টেসনে শেষ হয়েছে। এই সকল রেলওয়ের প্রায় সকলগুলির সঙ্গেই সহরের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলওয়ের সংযোগ রয়েছে। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলওয়ে যেমন মাটীর



হাইড্ পার্কের খালে খেলনা জাহাজ

বহু নিম্ন পথ দিয়ে গিয়েছে, তার ষ্টেসনগুলিও তেমনি মাটীর নীচে। বড় বড় আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ষ্টেসনগুলির বিশালতা চিন্তা করলে বিস্ময়াপন্ন হতে হয়। জমির নীচেয় আছি বলে মনেই হয় না।

লোকে ভুলক্রমে ট্রেণে, ট্রামে, বাসে বা ট্যাক্সিতে কোন জিনিস ফেলে গেলে যে ব্যক্তি হারাণো জিনিসটা পায়, সেই গিয়ে লষ্ট-প্রপার্টি আপিসে জমা দেয়; এই উপায়ে যার মাল সে লষ্ট-প্রপার্টি আপিসে গিয়ে সন্ধান করলেই পায়। দেশের সাধারণ লোকের সততার গুণে প্রায় কোন জিনিসই হারিয়ে যেতে পারে না।

প্রধান দ্রষ্টব্য

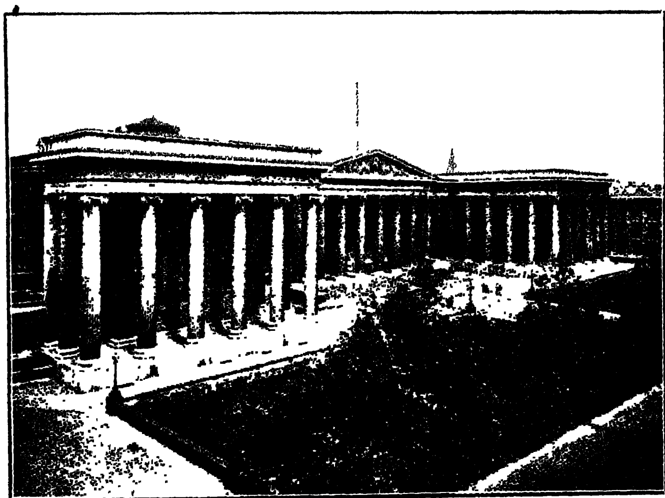
লণ্ডনের দেখবার বিষয় সমূহের যথাযথ বর্ণন করা কখন সম্ভবপর নয়। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের প্রাণের ভিতর সেগুলি আজীবনই ফুটে উঠতে থাকবে। যে বিষয়ে যাঁর অনুসন্ধিৎসা আছে, তিনি সেই বিষয়গুলি বলেন। হাজার বৎসর আগে থেকে দিনে দিনে একটু একটু করে লণ্ডন সহর গড়ে উঠে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহরে পরিণত হয়েছে। এত অর্থ, এত শক্তি, এত চিন্তা জগতে আর কোন ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয় নাই। এত দেখবার বিষয় জগতে আর কোথায়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অসীম ক্ষমতাপন্ন ইংরাজ সারাজগতের যেখানে যা কিছু নূতন, যা কিছু সুন্দর পেয়েছে—তাই এনে বা তারই ভাব নিয়ে লণ্ডনের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

বিশিষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য লণ্ডনে বহুপ্রকার শিক্ষালয় রয়েছে। সেগুলির বিবরণ পুস্তকে বা সংবাদপত্রে অনেকেই পাঠ করেছেন। আমার পক্ষে সেগুলির উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

বিভিন্ন প্রকারের মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারি, চার্চ্চ প্রভৃতি লণ্ডনে এত অধিকসংখ্যক আছে যে, ক্রমাগত একটি বৎসর পর্য্যন্ত দেখলেও তার ভিতরের সমস্ত দ্রষ্টব্য গুলি দেখা শেষ হয় না। এ ছাড়া কত প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদানপূর্ণ সৌধ, কত রাজকীয় কার্য্যালয়, কত লাইব্রেরী, কত ক্লাব, কন্সার্ট-হল, কত মনুমেণ্ট, পার্ক, উদ্যান সমস্ত সহরের শোভা সম্পদ বৃদ্ধি করে অবস্থান করছে। নিবিষ্টমনে এ সকল দেখলে যেমন আনন্দ উপভোগ হয় তেমনই আবার নানাপ্রকারের অভিজ্ঞতা জন্মে।

নবাগত লোকের পক্ষে লণ্ডন সহরে চলাফেরা করতে বা এই সকল

দ্রষ্টব্যগুলি দেখতে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। পথের লোককে অথবা পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলেই সব বলে দেয়। রাস্তার মোড়ে পোষ্টারের গায়ে বোর্ড দিয়ে অনেক স্থলে প্রধান প্রধান স্থানের পথ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। অনেক ষ্টেসন বা বিশ্রামক্ষেত্রে দেওয়ালের গায়ে লণ্ডনের মানচিত্র আঁটা রয়েছে এবং দর্শক যে স্থানে দাঁড়িয়ে মানচিত্র



ব্রিটিশ মিউজিয়াম

দেখছে সেই স্থানও তীরের অগ্রভাগ দ্বারা নির্দ্দেশ করা রয়েছে। তীরের গাঁয়ে লেখা আছে—"আপনি এইস্থানে রয়েছেন।"

লণ্ডনে অন্যূন পঞ্চাশটি সুপ্রসিদ্ধ থিয়েটার হল আছে। থিয়েটার-গুলিতে প্রত্যেক দিন দু'বার অভিনয় হয়—সন্ধ্যা ৫॥টা থেকে ৮টা, আর ৮॥টা থেকে ১১টা। প্রতিবারে ২॥ ঘণ্টা মাত্র দেখানো হয়। প্রতিবারেই

উৎসব-ক্ষেত্রগুলি লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কখন কখন বসবার সিট পূর্ণ হয়ে গেলে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখে।

লণ্ডনে বহুসংখ্যক মিউজিয়াম, প্রদর্শনী ও আর্টগ্যালারী আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) বৃটিশ মিউজিয়াম
(২) ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট মিউজিয়াম
(৩) ন্যাচারল হিষ্টোরী মিউজিয়াম
(৪) লণ্ডন মিউজিয়াম
(৫) রয়াল ইউনাইটেড্ সার্ভিস মিউজিয়াম
(৬) সায়েন্স মিউজিয়াম
(৭) ইণ্ডিয়া মিউজিয়াম
(৮) হর্ণিম্যান মিউজিয়াম
(৯) সার জনসোন্স মিউজিয়াম
(১০) গেফরী মিউজিয়াম
(১১) বেথন্যাল গ্রীণ মিউজিয়াম
(১২) লেইটন মিউজিয়াম
(১৩) ওয়ার মিউজিয়াম
(১৪) ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম
(১৫) সোয়েন মিউজিয়াম
(১৬) পার্কস মিউজিয়াম
(১৭) জিওলোজিক্যাল মিউজিয়াম
(১৮) এগ্রিকালচারাল হল্
(১৯) রয়াল বোটানিক গার্ডেন
(২০) জুলোজিক্যাল গার্ডেন

(২১) ন্যাসন্যাল গ্যালারী

(২২) ষ্টেট্ গ্যালারী

(২৩) ওয়ালেস্ কলেকসন্

(২৪) ডাল্‌উইচ কলেজ আর্টগ্যালারী

(২৫) ন্যাসন্যাল পোটরেট গ্যালারী

(২৬) টেন্যাণ্ট গ্যালারী

(২৭) ম্যাডাম টুসোড একজিবিশন

ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য ভবনের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—

(১) টাওয়ার অব্ লণ্ডন

(২) ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি

(৩) সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রল

(৪) সাউথ ওয়ার্ক ক্যাথিড্রল

(৫) চার্টার হাউস

(৬) ক্রসবি হল্

(৭) গিল্ড্ হল্

লণ্ডনের বিবরণ একভাবে এখানেই শেষ করা গেল ; অতঃপর প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতে চেষ্টা করবো।

লণ্ডন সহরটী পনর ষোল মাইল দীর্ঘ এবং বার তের মাইল প্রস্থ। এ ছাড়া সহরের চারদিকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত লণ্ডনের প্রভাব। সমগ্র সহরটীতে সত্তর লক্ষ লোকের বাস। কলকাতার লোক সংখ্যা অপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ অধিক।

টেমস্ নদী

টেমস্ নদীটি সহরের পনর মাইল স্থানের মধ্য দিয়ে চলেছে—সমুদ্রের দিকে আট শত হাত প্রস্থ হবে। সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ভিক্টোরিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টে টেমসের প্রশস্ততা ছয় শত হস্তের অধিক নয় এবং সহরের পশ্চিম প্রান্তে মাত্র তিন শত হাত প্রস্থ হবে; ইহা কলকাতার নিকটবর্ত্তী হুগলি নদীর তিন ভাগের দুই ভাগ মাত্র। অর্থাৎ বাংলা দেশের একটী ছোট নদীর মত। সহরের মধ্য অংশে টেমসের উপর ঘন ঘন পোল আর দুই তীরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা শ্রেণী।

টেমসের সুড়ঙ্গ—সমুদ্র হতে সহরের ভিতরে জাহাজ আসবার সুবিধার জন্য টেমসের ঐ অংশের উপর কোন পোল করা হয় নাই। নদীর তলার বহু নিম্নদেশ দিয়ে দু'তিন মাইল অন্তর অন্তর চারটী সুড়ঙ্গ করা হয়েছে। আমি কয়েক দিন করে এর তিনটি সুড়ঙ্গ দেখেছি, তার একটীর নীচে দিয়ে ট্রামে পার হয়েছি, অপর দু'টীতে হেঁটে পার হয়েছি। সুড়ঙ্গের ভিতর দুই স্থানে উপর হতে বায়ু প্রবেশের পথ আছে। শ্রেণী বদ্ধ ভাবে আলো, দিবা রাত্রি সে আলো জ্বালা থাকে। সুড়ঙ্গের ভিতর দিকে ৩৫ ফিট চওড়া, ২০ ফিট উঁচু করে শ্বেতবর্ণের এনামেল মাটীর গাথুনি। কোন মতেও জল চুয়ায়ে আসবার আশঙ্কা নাই। বহু গাড়ীঘোড়া, মোটর ও লোকজন সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করে। সুড়ঙ্গ দৈর্ঘ্যে এক মাইলের বেশী হবে।

টেমসের পোল—চারটি সুড়ঙ্গের পরে টেমসের উপরে টাওয়ার ব্রীজ নামক আশ্চর্য্য পোল। গাড়ীঘোড়া, লোকজন সমস্তই ইহার উপর দিয়ে অনবরত যাতায়াত করে—আবার জাহাজ আসবার সময় এর মাঝখান

হতে খণ্ড হয়ে দু'পাশে দু'খানি বিরাট কবাট উপরে উঠে যায়। জাহাজ চলে যাওয়া মাত্র আবার কবাট নামিয়ে দেওয়া হয়। এই পোল



ব্ল্যাক্‌ফায়ার্স ব্রীজ

পার হয়ে সহরের অতি জমকাল অংশে লণ্ডন-ব্রীজ নামক পোল পর্য্যন্ত জাহাজ আসতে পারে। এর পর হতেই টেমসের উপরে সহরের দশ মাইল স্থানের মধ্যে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্রীজ, ব্ল্যাক্‌ফায়ার্স ব্রীজ প্রভৃতি চব্বিশটী বৃহৎ পোল আছে। এর তিনটাতে সুপ্রশস্ত রেল পথ, এবং বাকীগুলিতে ট্রাম, মটরবাস, গাড়ী ঘোড়া ও লোকজন চলে। প্রত্যেকটী পোলের বিভিন্ন রকমের সৌন্দর্য্যময় গঠন। এ ছাড়া টেমসের নীচে দিয়ে আরও কয়েকটী—Under-ground Railway অর্থাৎ সুড়ঙ্গ রেল-পথ আছে।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে

আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে ও অন্যান্য যান—সহরে লোকের গতিবিধির জন্য সাধারণতঃ তিন রকম উপায় আছে,—ভূগর্ভ রেলওয়ে, ট্রামওয়ে ও মটর বাস্। ভূগর্ভ রেলওয়েকে বিলাতে আণ্ডার গ্রাউণ্ড বা টিউব রেল বলে। এই আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে লণ্ডনের অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। কয়েক মিনিটের মধ্যে সহরের যে কোন অংশে যাওয়া যায়। সাধারণ জমির ৫০।৬০ ফিট নিম্নদেশ দিয়ে সুপ্রশস্ত সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে রেল গাড়ী চলে। সেই ৫০।৬০ ফিট নীচেয়ই খুব বড় ষ্টেসন। Lift এ সহজেই উপরে ওঠা নামা করা যায়। পায়ে হাঁটবার সিড়ি পথও আছে। শীঘ্র গতিবিধির জন্য এই রেলওয়ে বড়ই সুবিধা। সহরে ট্রামওয়ে খুব বেশী না হলেও কলকাতার বিশগুণের কম নয়। ট্রাম গাড়ীগুলি দ্বিতল। মটরবাসেই বেশী লোক যাতায়াত করে, জনাকীর্ণ রাস্তায় প্রতি মিনিটে যাতায়াতে চল্লিশ পঞ্চাশ খানা মটর বাস চলে। কলকাতায় এখন বহু প্রকার ছোট বড় রকমের মটর বাস চলা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু লণ্ডনের মটর বাস সমস্তই বৃহৎ এবং দ্বিতল।

পার্ক—সুবিশাল সহরের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় পার্ক আছে, তার এক একটা এতই বিশাল ও এমনই বৃক্ষাদি পূর্ণ যে তার মধ্যে প্রবেশ করলে চারদিকের সহরের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না, সহরে আছি বলে মনেই হয় না। হাইড্-পার্ক, কেন্সিংটন্ গার্ডেন, এর মধ্যে যেমন বেড়াবার স্থান তেমন আবার নৌকায় ভ্রমণের জন্য সুন্দর আঁকা বাকা খাল কাটা আছে। রিজেণ্ট পার্কের মধ্যে বোটানিক্যাল গার্ডেন

এবং জুলজিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত। এই শীতের দেশে সারা পৃথিবীর গরম দেশের জীবজন্তু ও গাছপালা খুব বড় বড় কাঁচের ঘর ভরে সেই দেশের উপযোগী গরমের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। লোহার চোঙ্গের মধ্য দিয়ে গরম ষ্টিমের প্রবাহ করে ঘরের তাপ রক্ষা করা হয়।



রিজেণ্ট্ পার্ক

জুলজিকাল গার্ডেন বা চিড়িয়াখানাটীতে সমগ্র জগতের জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ, মৎস্যাদির নমুনা রাখা হয়েছে।

প্রধান প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবরণ

বৃটিশ মিউজিয়াম—লণ্ডন সহরে বহু সংখ্যক মিউজিয়াম আছে, তন্মধ্যে বৃটিশ মিউজিয়াম নামক সুবিখ্যাত যাদুঘরটী যেদিন দেখলাম, সেদিন মনে হ'ল, জীবন যেন বহু গুণ বেড়ে উঠল। সে যে অপরিসীম জ্ঞান ভাণ্ডার! সে সমস্ত দৃশ্যাবলীর বিবরণপূর্ণ তালিকাপুস্তকই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক সহস্র ভলুমের কম হবে না। লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে আবার এর বিভিন্ন শাখা আছে।

ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম—ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউ-জিয়ামটীতে রাজকীয় ঐতিহাসিক বিষয় পূর্ণ। জগতের প্রত্যেক দেশ হতে বিভিন্ন সময়ের নানা প্রকার অমূল্য দর্শনীয় ও শিল্প সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে।

হাউস্ অব পার্লিয়ামেণ্ট—১৮৪০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টেমসের তীরে এই বিরাট সৌধ নির্ম্মিত হয়। এটি নির্ম্মাণ করতে সাড়ে চার



পার্লিয়ামেণ্ট হাউস

কোটী টাকা ব্যয় হয়েছে। ইহা বৃটিশ রাজত্বের বিচার কার্য্য ও রাজ্য পরিচালন বিষয়ক শক্তির মূলকেন্দ্র। পার্লিয়ামেণ্ট হাউসের অন্যান্য কার্য্যাদির বিষয় প্রায় সকলেই অবগত আছেন।

ন্যাচারাল হিষ্টোরিক্যাল মিউজিয়াম—এখানে জগতের যাবতীয়

প্রাণীর মৃতদেহ জীবন্তবৎ রয়েছে। জগতের বিভিন্ন দেশের মানবমূর্ত্তি একস্থানে অঙ্কিত রয়েছে, তার মধ্যে ভারতীয় হিন্দুর মূর্ত্তি দেখে অতি বিস্ময়াপন্ন হলাম। লম্বা চুল, লম্বা গোঁফ-দাড়ীযুক্ত কিম্ভূত কিমাকার তিলক কাটা মূর্ত্তি—একটীর নাম 'হিন্দু' রাখা হয়েছে।

সায়েন্স মিউজিয়াম—প্রাচীনকাল হতে একাল পর্য্যন্তকার সমুদয় কল কারখানার নমুনা এখানে রক্ষিত হয়েছে। অতি প্রাচীন যুগের শকট যান হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমানের রেল, জাহাজ, মোটরকারের ক্রমোন্নতি স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেখান হয়েছে। নূতন নূতন নানা প্রকার ব্যবহারিক যন্ত্রের ক্রিয়া দেখান হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান লাভের জন্য ইহা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। বালকেরা সেখানে গিয়ে খুবই আমোদের সঙ্গে ঐ সকল কলের ব্যবহার করে। কোনটী ঘুরিয়ে জল তুলছে, কোনটী ঘুরিয়ে জাহাজে মাল তোলার পদ্ধতি দেখছে, কোনটীর কল টিপলে ইলেকট্রিক সংযোগ হয়ে নানা প্রকার কল ঘুরছে, কোনটী টিপলে আগুন জ্বলছে। এই মত নানা বিষয় লয়ে ক্রিড়া কৌতুকের সঙ্গে বালক বালিকারা শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করছে।

ইণ্ডিয়া মিউজিয়াম— ইণ্ডিয়া মিউজিয়ামটীতে ভারতবর্ষ, সিংহল, বর্ম্মা, আফগানিস্থান, তিব্বত, শ্যাম প্রভৃতি দেশের নানা প্রকার প্রদর্শনীতে পূর্ণ। সদর দরজায় তাজমহলের চমৎকার একটী মডেল তৈরী করা হয়েছে। কলকাতার যাদুঘর অপেক্ষা এটি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ।

অষ্ট্রেলিয়া হাউস—অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডের ঐশ্বর্য্যের বিবরণপূর্ণ সুবৃহৎ ভবন। এখানে অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধীয় নানা বিষয় প্রতিদিন বিনামূল্যে বায়স্কোপের সাহায্যে দেখান হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডকে ইংরেজেরা

আর একটী স্বদেশ করে গড়ে তুলছে, বহু ইংরেজ পরিবার সেখানে বসবাস করে ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করছে। এই জন্য ইংরেজদিগের অষ্ট্রেলিয়া গমনের সুবিধার্থ নানা সুবিধান এখান হতে করা যায়।

ন্যাসন্যাল গ্যালারী—এখানে যে নকল চিত্র দেখেছি, তা জীবনে ভুলবার নয়। এক একটী ছবি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দেখলেও দর্শনের



সেণ্টপল ক্যাথিড্রল

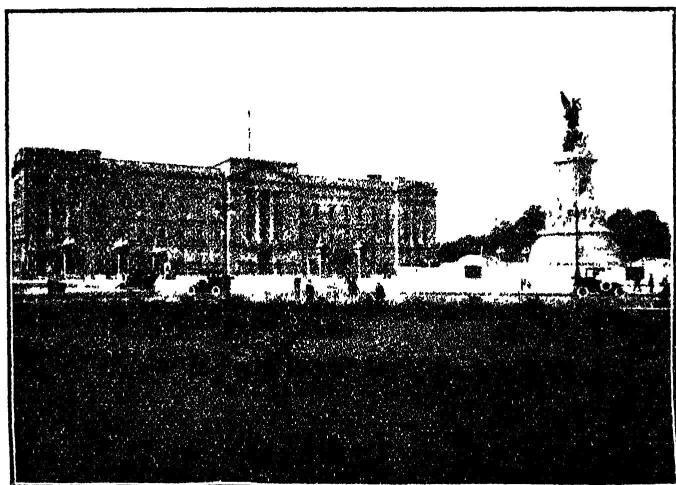
আকাঙ্ক্ষা কমে না। দেশ দেশান্তর হতে চিত্রকরেরা এসে ঐ সকল ছবি দেখে ছবি এঁকে নিয়ে যাচ্ছে। চিত্রকরদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানলাম—এর এক একটি চিত্রের অনুকরণ করতে কারও এক বৎসর, কারও ৩।৪ বৎসর সময় কাটছে। সপ্তাহের মধ্যে দু'দিন মাত্র চিত্র অঙ্কন করে নেবার ব্যবস্থা আছে।

ম্যাডাম টুস্উডস্—মেরী টুস্উড্ নাম্নী সুইজর্লণ্ডবাসী এক মহিলা ভাস্করের প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের ও ঐতিহাসিক ঘটনার মোমের প্রস্তুত প্রতিমূর্ত্তি এখানে সজ্জিত; বৃটিশ রাজ্যের অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেক বিষয়টী একেবারে সত্য বিষয়ের মত তৈরী। প্রত্যেক মানুষটীকে, প্রত্যেক বিষয়টীকে একেবারে সজীব বলে ভ্রম হয়। এখানে কত কি দেখলাম—কত কি শিখলাম! একটী রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে, তার বক্ষের নিশ্বাসের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। সেই ছবিটী এমনই সজীব অনুভূত হয়েছিল যে, একটী বৃদ্ধাকে সত্য সত্যই তাকে উপলক্ষ্য করে, তার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম। একটী হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার রক্ত যেন এখনও শীতল হয় নাই এমনই সজীবের মত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তিটী দেখে সত্যই যেন তাঁকে দেখলাম বলে আমার মনে হচ্ছিল। *

লণ্ডন টাওয়ার—টেম্সের তীরে অতি সুশোভন প্রাচীন দুর্গ। অতি প্রাচীন কালে ইহা কারাগার ছিল। বর্ত্তমানে এটি লণ্ডনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐতিহাসিক বিষয় পূর্ণ দর্শনীয় স্থান। এখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুট ও অন্যান্য মূল্যবান রাজকীয় রত্নাভরণ দেখলাম। এখানে টেমসের তীরে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন কালের যে সকল কামান দেখলাম, তা এত বৃহৎ যে ভেবেই বিস্ময়াপন্ন হলাম। এর কোন একটী ভারতীয় কামান কি কলকাতার যাদুঘরে

* প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি লণ্ডনের একটী বালিকার পত্রে যখন জানলাম, ম্যাডাম টুস্উডস্ সম্প্রতি পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তখন কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। হায়, সে সজীব-বৎ অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ জগতে আর কেউ দেখতে পাবে না!

রাখা উচিত ছিল না? ভারতীয় যাদুঘরে স্থান পাইবার মত যত ঐতিহাসিক গৌরবের বিষয় আছে, তার প্রধান প্রধান গুলিই বিলাতে লওয়া হয়েছে। এই লণ্ডন টাওয়ারে প্রাচীন কালের সৈনিকদের অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জা বহু পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। প্রাচীন কালের কারাগার দেখলাম, সেকালের শাস্তি দেবার অনেক যন্ত্র-পাতি দেখলাম,



বাকিংহাম প্যালেস্

ফাঁসিকাষ্ঠ দেখলাম, অপরাধী লোককে বধ করবার প্রকাণ্ড দা (রামদাও) ও যে কাষ্ঠের উপর রেখে গলা কাটা হত, সে কাষ্ঠ খণ্ডও দেখলাম।

মার্ব্বেল আর্চ্চ—বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে প্রবেশের তোরণ দ্বাররূপে এটি নির্ম্মিত হয়েছিল। বর্ত্তমানে ইহা হাইড্‌পার্কের এক কোণে খুব জনসমাগমস্থলে স্থাপিত করা হয়েছে। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ

তোরণ দ্বার। লণ্ডনে এটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বটে কিন্তু আগ্রার মুসলমানের রাজত্বের আমলের রাজ প্রাসাদ গুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মার্ব্বেল আর্চ্চকে অতি তুচ্ছ মনে করবেন।

বাকিংহাম প্যালেস্—বৃটিশ সাম্রাজ্যের লণ্ডনস্থ অতি বিশালায়তন রাজ-প্রাসাদ, ভিতরে প্রবেশ করবার নিয়ম নাই, কাজেই বাইরে চারদিকে ঘুরেই দর্শন আকাঙ্ক্ষা শেষ করলাম। এর নিকটেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নামে মহারাণী ভারতেশ্বরীর অতি সুশোভন মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়েছে এবং নানা প্রকার প্রস্তর শিল্পে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মনুমেণ্ট—টেমস্ নদীর নিকটে দুইশত ফিট উচ্চ মনুমেণ্ট। দু'দিন এর উপর উঠে লণ্ডন সহর ও টেমস্ নদীর সৌন্দর্য্য দেখেছি। লণ্ডন সহরে এক সময়ে আগুন লেগে বহু লোকজন ও ধন সম্পদ ধ্বংস হয়, তারই স্মৃতি স্বরূপ এই মনুমেণ্ট স্থাপিত হয়েছে।

অলিম্পিয়া—একটী রমণীয় প্রদর্শনীক্ষেত্র। প্রতিবৎসর এখানে নানা বিষয়ের প্রদর্শনী হয়ে থাকে। লণ্ডনের একটা বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এটি দেখতে গিয়েছিলাম এবং বহু প্রকার আমোদ উৎসব দেখে এসেছিলাম। সেখানে অভাবনীয় আশ্চর্য্য সার্কাস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। একটা হোটেলের কর্ত্তার ছোট দু'টী ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়েছিলাম বলে সেদিনকার উৎসব দর্শন আমার অতি আনন্দের হয়েছিল। নাগোরদোলা, ঘোড়াকল, জুয়া খেলা, সার্কাস সবই বাংলা-দেশের মেলায় দেখে থাকি—তারই একটা অত্যুন্নত সংস্করণ দেখলাম।

ক্রিষ্টাল প্যালেস্—কাচ ও লৌহনির্ম্মিত সুবৃহৎ গৃহ। ১৬০০ ফিট দীর্ঘ। পূর্ব্বে ইহা হাইড্ পার্কে একটা বড় প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রস্তুত

হয়েছিল। বর্ত্তমানে সেখান হতে ৬।৭ মাইল দূরে স্থানান্তরিত হয়েছে। ইহা লণ্ডনের আমোদ উৎসবের একটী কেন্দ্রস্থল স্বরূপ। প্রতি সপ্তাহে একদিন এর ভিতরে আলোক বাজী পোড়ান হয়, কাচময় গৃহ তখন রমণীয় রূপ ধারণ করে।

গ্রীণ্‌উইচ্‌ অবজারভেটরী—ইহা জগদ্বিখ্যাত মানমন্দির। লণ্ডনের উত্তরাংশে গ্রীণ্‌উইচ্‌ পাহাড়ের উপরে স্থাপিত। এই মানমন্দির সারা পৃথিবীর ঘড়ির সময় নির্দ্দেশ করে দেয়। এখানকার ঘড়ির সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রধান সহরগুলির ঘড়ির সঙ্গে এমন বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে যে, এই ঘড়িতে যখন যত বাজে, ঠিক অন্য সহরের ঘড়িতেও তাই বাজে। এটি জ্যোতিষ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু গবেষণার স্থান।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ভজনালয়। এখানে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজগণের রাজ্যাভিষেক হয়। রাজগণের সমাধিও এখানে হয়। বহু সংখ্যক দেখবার বিষয় এখানে আছে। এটি ৮০০ বৎসরের পুরাতন।

সেণ্ট পলস্‌ ক্যাথিড্রল—সেণ্ট পলস্‌ ক্যাথিড্রলও ঠিক ঐ মত আর একটী ভজনালয়, ৫১৫ ফিট দীর্ঘ, ২৫০ ফিট প্রস্থ, অতি বৃহৎ। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাসের বহু বিবরণ এখানে আছে। বহু প্রাচীন ধার্ম্মিকগণের মৃতদেহ এখানে সমাহিত।

লণ্ডনে হাইড্‌পার্ক কর্ণার, ট্রাফালগার স্কোয়ার, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, পিকাডিলি, ভিক্টোরিয়া ষ্টেসন প্রভৃতি স্থানের গুরুত্ব ও জনাকীর্ণতা দেখলে বিস্ময়াপন্ন হতে হয়। পিকাডিলিতে একটী ভারতীয় হোটেল আছে, ইহার নাম আব্দুল্লা রেষ্টুরেণ্ট।

সহরের মধ্য অংশে পিকাডিলির চতুঃপার্শে বহু থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতির স্থান। রাত্রিতে এই সকল স্থান ইন্দ্রপুরীর মত আলোকে সুশোভিত হয়। রাত্রিকালের বৈদ্যুতিক আলোর চলৎশীল অভিনব ধরণের বিজ্ঞাপনগুলি সহরকে আরও আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।



ট্রাফালগার স্কোয়ার

সুবিশাল লণ্ডনের দৃশ্যাবলীর গোটাকয়েক বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখতে গিয়ে আমার লিখবার আকাঙ্ক্ষা একটুও মিট্‌ল না। শত শত দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে কয়েকটী মাত্র লেখা গেল।

রবিবারের চিঠি (প্রথম)

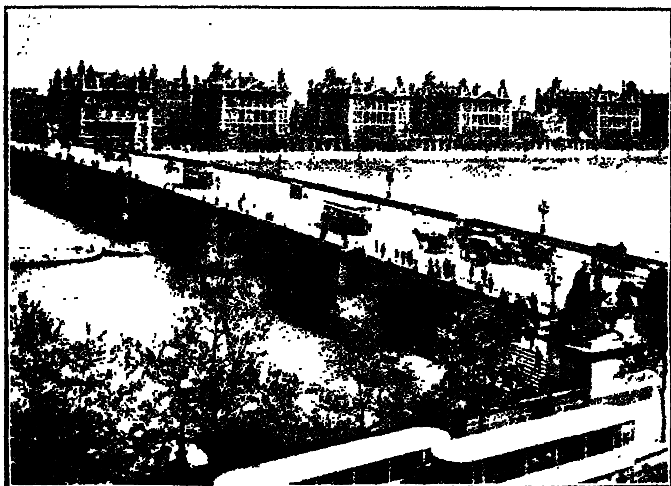
বিলাতে প্রথম প্রথম গতিবিধি করতে কতটুকু সুবিধা অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তারই একটা চিত্র—লণ্ডন হতে আমার লিখিত দুইটি রবিবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করা গেল

১৭ই আগষ্ট—১৯২৪

মধ্যাহ্নের আহার বাসায় শেষ করে বিকাল ৩টায় বেড়াতে বের হলাম। বাসার নিকট Kilburn High Road থেকে ৪ B নং বাস্ ধরে খানিকটা গিয়ে পথে New Oxford Streetএ এলাম। যদিও রবিবার—সবই বন্ধ রয়েছে—তবু দেখবার বিশেষ অসুবিধা নাই, প্রায় বেশীর ভাগ দোকানগুলিতেই বড় বড় কাঁচের পরদা, তার ভিতর দিয়ে দোকানের প্রায় সব জিনিষই দেখা যায়। এই রাস্তার বড় বড় দোকান গুলির সাজসজ্জা অতি অপূর্ব্ব। আমি New Oxford Street পার হয়ে Oxford Street ধরে ক্রমাগত পূর্ব্বদিকে চলতে চলতে দু'ধারের দোকানগুলি অনেক দেখলাম। লণ্ডনের এই দু'টি রাস্তাই সবচেয়ে বড় বড় দোকানে সজ্জিত।

পরে অন্য বাসে করে Westminister Bridge নামক টেমস্ নদীর উপরের সুন্দর পোলটী পার হয়ে সুবৃহৎ Waterloo Stationটি দেখলাম। এ ষ্টেশনটী সহরের প্রান্তে সুবিস্তীর্ণ স্থানব্যাপী। রেল ষ্টেসন যে এত বড় হতে পারে, তা না দেখলে কল্পনায় আনা যায় না। হাওড়া ষ্টেসনের কয়েকটা তার মধ্যে স্থান পেতে পারে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ষ্টেসনটিতে ঘুরে ফিরে দেখলাম। এখানে এসে আর এক নূতন

বুদ্ধি মনে হল—টেম্‌সের উপর দিয়ে পোল পার হয়ে এসেছি, এবার ফিরবার পথে Tube রেলে করে টেম্‌সের নীচে দিয়ে যেতে হবে। "উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর"—দেখতে হবে। টেম্‌সের সুড়ঙ্গ বলে যা



ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্রীজ

বিখ্যাত সে এ নয়, সেগুলি সহরের পূর্ব্বে সমুদ্রের দিকে। তখন Charring Crossএর একখানা টিকিট করলাম।

আমাদের দেশের রেলপথে চলতে নূতন লোকের কত কি যে জিজ্ঞাসা করতে হয় আর কত যে Officeরদের তাড়া খেতে হয়, তার অন্ত নাই। এখানে রেলের ব্যাপার আমাদের দেশ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী, কিন্তু এমন ভাবেই সব লেখা রয়েছে যে, এত বড় বিরাট ব্যাপারের মধ্যেও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসার আবশ্যক হয় না। সবই সুন্দর পরিষ্কার লেখা রয়েছে। কোন কোন স্থানে এমন বন্দোবস্ত রয়েছে যে, টিকিটের দামের পেনী কয়েকটা

কলের মধ্যে ফেলে কল টিপ্‌লেই যেখানকার টিকিট চাই সেখানকার টিকিট বের হয়ে পড়ে—এমনই সে কলের বন্দোবস্ত ; অথচ সকলেই এ কাজটি সহজে বুঝে নিতে পারে। ষ্টেসনগুলিতে সিগারেট, ম্যাচ, চক্‌লেট ও নানারকম ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিনতে কলে পেনি দিয়ে কল টানলেই ঐ সব জিনিস বের হয়। আমি আড়াই পেনি দিয়ে একটি টিকিট বের করলাম। এখানে প্রতি মিনিটেই ট্রেণ ধরে।

ট্রেণে উঠবামাত্রই গাড়ী ছেড়ে টেমসের নীচের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল ; কিন্তু সুড়ঙ্গ তো কিছুই মনে হল না, কারণ লণ্ডনের রেলগুলি অর্দ্ধেকের বেশীই Undergronnd বা Tube রেল অর্থাৎ মাটীর নীচ দিয়ে চলেছে, কাজেই টেমসের নীচে দিয়ে আসতে ভুল করে এই Underground Railwayকে সুড়ঙ্গ মনে করেছিলাম কিন্তু এর কিছুদিন পরে সত্যি সুড়ঙ্গ দেখেছিলাম। টেমসের নীচেয় ট্রেণে চলতে অন্যান্য Underground পথের মতই বোধ হল। মুহূর্ত্ত মধ্যে Charring Cross ষ্টেসনে গাড়ী এল, এটাও একটা বিরাট ষ্টেসন। Charring Cross ভারী জমকাল স্থান। আমি এখানে আর একটা বাস ধরে একেবারে Hydepark Corner অতিক্রম করে Marble Archএ এসে পৌছলাম। এখানে রবিবার বিকালে বহুলোকের সমাগম হয়। লোকে Hydeparkএ বেড়াতে আসে আর এই Marble Arch এর কাছে নানা প্রকার বক্তৃতা শোনে। আমি প্রায় রবিবারেই এখানে বক্তৃতা শুন্‌তে আসি। খানিকটা দাঁড়িয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় লেক্‌চার শুন্‌লাম।

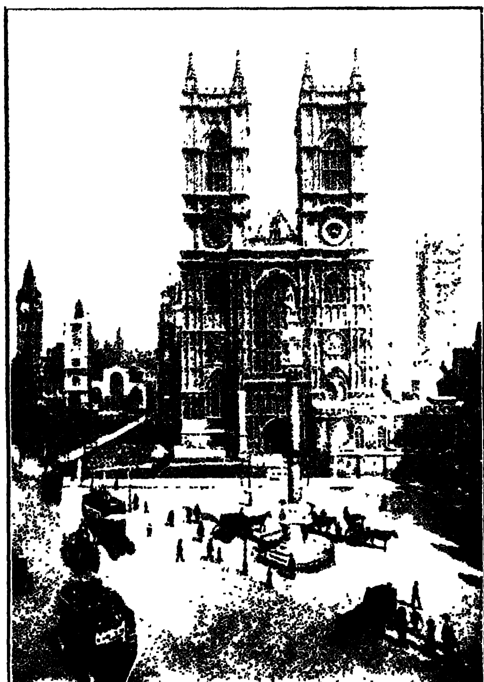
একটা স্ত্রীলোকের বক্তৃতায় একটী কথা বড় মনে ধরল, তিনি বলেছিলেন "স্বর্গ বলে কোন স্থান আছে কিনা জানি না, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার স্বর্গ—তাঁর অনুসরণই আমার স্বর্গভোগ।" তাঁর বক্তৃতার পর আমি খানিকটা তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম। পরে ১৬নং বাস্ ধরে বাসায় এলাম।

রবিবারের চিঠি (দ্বিতীয়)

২৪শে আগষ্ট—

আজ সকালকার কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করে প্রথমে মনুমেণ্ট দেখব বলে বের হলাম। লণ্ডনে অনেক বড় বড় মনুমেণ্ট আছে তথাপি একটাই বিখ্যাত, শুধু মনুমেণ্ট বললে সেটাকেই বোঝায়। কোন্ বাসে চড়তে হবে জানা নাই—অনুমানেই একটা বাসে চাপলাম। লণ্ডন-গাইড বই ছোট একখানা পকেটে ছিল, তাই দেখেই ঠিক করলাম—কোন খানে নামতে হবে। ৮ পেনির পথ চলার পর মনোনীত জায়গায় নামলাম। নেমে দেখি এটা মস্ত বড় একটা জায়গা, তিন দিকে তিনটা প্রকাণ্ড বাড়ী Bank of England, Royal Exchange, Mansion House; পাঁচটা বড় বড় রাস্তার মোহনা এটা, তাই রাস্তাগুলির মোহনায় খুব বড় ফাঁকা যায়গা। দেখলাম, প্রত্যেক রাস্তার মাথায় Undergroundএর সুড়ঙ্গ রয়েছে—একটা পথ ধরে নীচে গিয়ে দেখি মস্তবড় রেলষ্টেসন, পাতালপুরীতে দ্বিতীয় এক লণ্ডন সহর। ষ্টেসনটির নাম 'ব্যাঙ্ক', তার ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাবার পথ লেখা রয়েছে। মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ পথে নানা দিকে বড় বড় রাস্তা গিয়েছে। রাস্তার গোলাকার ছাত ও পাশের দেওয়ালে বড় বিজ্ঞাপনের টিনের প্লাকার্ডে ঢাকা। লণ্ডন সহরের বিজ্ঞাপনের কথা বলতে গেলে সে আর এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আরম্ভ করতে হয়, সেটা এখন থাকুক। খানিকটা নীচেয় গিয়ে দেখে পরে উপরে উঠলাম—একটু হেঁটেই মনুমেণ্টে গিয়ে হাজির হলাম। আজ রবিবার—কাজেই আজ উপরে ওঠা যাবে না—তার চারদিকে ঘুরে

দেখে নিকটেই London Bridge নামক টেম্‌সের একটী পোলের উপর গিয়ে উঠলাম। লণ্ডনের মধ্যবর্ত্তী টেম্‌সের ১২ মাইল পথের মধ্যে ২৫টা পোল, আর টেমসের নীচে ৫।৬টা সুড়ঙ্গ পথে কেবল ট্রেণ চলে। উপরেও



ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবি

রেলের পোল আছে। Bridge পার হয়ে অপর পারে এসে London Bridge Railway Stationটী দেখলাম। ওপারে দেখে এসেছি জমির নীচের ষ্টেসন, এপারে এ ষ্টেসনটী সাধারণ জমি ছেড়ে প্রায় ১৫ হাত

উঁচুতে ; দুই পারেই লণ্ডন সহর। এখানে আমি সাত পেনিতে কয়েকটি ফল ও দু'পেনির রুটি কিনে মধ্যাহ্নের ভোজন সম্পন্ন করলাম।

এখান থেকে সুবিখ্যাত Tower Bridge এবং Tower দেখব মতলব করলাম। একটী ট্রাম ধরে এক পেনির পথ অর্থাৎ প্রায় এক মাইল গিয়ে নামলাম—এটা কোন্ খানে এসেছি ঠিক করতে না পেরে সঙ্গের Guide বই খুলে দেখে একটী রাস্তা ধরে চলতে চলতে একটা ছোট পল্লীর ভিতরে গিয়ে পৌছলাম—দেখলাম অনেক ছোট ছোট বাড়ী, অনেক ছেলেমেয়ে পথে খেলা করছে।

বেশী ছেলে মেয়ে একস্থানে খেলতে দেখে আমার বড় আনন্দ হল, সেখানে একটু দাঁড়াতেই অনেক ছেলে মেয়ে আমার কাছে ছুটে এল—তাদের অনেকেই ভারতীয় মানুষের সঙ্গে কোন দিন পরিচয় করে নাই—তারা অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক ভারতীয় কথা আমার কাছে শুন্‌ল এবং তাদের পুস্তকের অভিজ্ঞতা থেকেও অনেক বলল। আমি Tower Bridgeএ যাব শুনে পথ দেখাবার উপলক্ষে অনেক ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে চল্‌ল—এখানে কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদেরও ছেলেমী স্বভাব। যে এক দল ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে এল, তাদের মধ্যে দু'টী মেয়ে অনুমান আঠার কি কুড়ি বছরের। এরা দু'জনে খানিকটা পথ দেখিয়ে ফিরে গেল—আর ৮।১০টী ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে এসে গল্প করতে করতে চল্‌ল। ঠিক Bridgeটি যখন দেখা গেল, চারটী মেয়ে বাদে আর সব ছেলে মেয়ে ফিরে গেল। মেয়ে চারটী আমার সঙ্গে এসে Bridgeটীর সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে বলে ভাল করে দেখাল। জাহাজ চলবার সময় মাঝখানে কবাট খুলে দু'পাশে উঁচু করা হয় কি উপায়ে তাও দেখাল।

বাস্তবিকই Tower Bridgeটী একটী বিস্ময়কর জিনিষ। পোল দেখান শেষ করে তাদের বড় দু'টী মেয়ে ফিরে গেল, বারো বছরের

দু'টী মেয়ে নদীর অপর পারে আমাকে Tower দেখাতে চল্‌ল। আমি বল্‌লাম, তোমরা বাড়ীতে না বলে আমার সঙ্গে এতদূর চলছ, এতে তোমাদের বাপ মা রাগ করবে না ত? তারা বলল, না কিছুই না—এখন আমাদের স্কুলের গরমের ছুটীর দিন; তাই আমরা এখন খুব বেড়াতে পারি। বুঝলাম, স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে। আমাদের দেশের গ্রামে একটা বিদেশী ইংরাজ গেলে ছেলে মেয়েরা ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, যার বড় সাহস সে না হয় একটু নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—আর এই মেয়ে দু'টী নিঃশঙ্ক-চিত্তে, পরিচিত ভাইদের সঙ্গে চলার মত আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলছে। অল্পক্ষণেই আমরা পোল পার হয়ে Towerএর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলাম। টেমসের তীরে খুব খানিকটা স্থান নিয়ে London Towerএর বাড়ীগুলি খুব বড় বড়।

এখানে লণ্ডনের সব চেয়ে বেশী ঐতিহাসিক দৃশ্য ভিতরে রয়েছে। রবিবার বলে ভিতরের জিনিষ সব বন্ধ। আমরা বাইরের জিনিষগুলি দেখতে লাগলাম। বাইরেই এত দেখবার রয়েছে যে, একদিনে সেইগুলিই দেখে শেষ করা দায়। নদীর তীরে সারি সারি প্রায় শতাধিক বড় বড় প্রাচীন কালের কামান রয়েছে। আহা, ভারতের জিনিষ দেখলেই প্রাণে কেমন লাগে! ভারতীয় কামানগুলি আমি দূরে থেকে দেখেই চিন্‌লাম। একটীর গায়ে লেখা রয়েছে—"ভরতপুর থেকে East India Company কর্ত্তৃক ১৮২৬ সালে আনীত।" দু'টী বড় পিতলের কামান দেখলাম, তার একটী ৭ হাত, অপরটী ১২ হাত লম্বা। তাতে লেখা রয়েছে—"সলিমের পুত্র সলোমন কর্ত্তৃক হিজরী ৯৩৭ সালে প্রস্তুত।" এত বড় কামান ভারতে তৈরী হয়েছে জেনে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হল। আচ্ছা—বিলাতে এই যে ভারতীয় এত বড় বড় কামানগুলি আনা হয়েছে, এর দু'একটা তো কলকাতা যাদুঘরে থাকা উচিত ছিল। কলকাতা যাদুঘরে আমরা যে

ছোট দু'একটি পিতলের কামান দেখতে পাই, ওকেই ভারতীয় শিল্পের পরাকাষ্ঠা মনে করতাম, কিন্তু বিলাতে এত বড় বড় কামান ভারত থেকে এসেছে, এর খবর আমাদের দেশবাসী অনেকেই জানেন না।

এর পর আমরা চীন, জাভাদ্বীপ ও আফ্রিকা থেকে আনীত অনেক কামান দেখলাম, চীন ও জাভার কামান গুলিও বেশ বড় বড় এবং সুন্দর গঠনের।

এক পশলা বৃষ্টি এল, আমরা একটা গেটের নীচেয় গিয়ে দাঁড়ালাম, সেখানে একটী বুড়ীকে পেয়ে তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করতেই সে তার বাপ ভারতে মরেছে, সেই দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করল। বৃষ্টি থামল কিন্তু বুড়ীর কাহিনী আর থামতে চায় না। পরে আমরা Towerএর আর আর বাগানবাড়ী প্রভৃতি অনেক দেখলাম। এই টাওয়ারটা অতি প্রাচীন কালে একটী জেলখানা ছিল—এখন একে একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রদর্শনীতে পরিণত করা হয়েছে। এর ভিতরেই কোহিনুর, রাজমুকুট প্রভৃতি রক্ষিত আছে।

মেয়ে দু'টী বাড়ী ছেড়ে এক মাইলের বেশী পথ এসেছে, এখন এদের শীঘ্র করে বাড়ী ফেরাই উচিত, তা না করে এরা জানাল, আমাকে বাসায় পৌছবার বাসে তুলে দিয়ে তবে দু'জনে ফিরবে—কি সম্বন্ধই যে দু'এক ঘণ্টার পরিচয়ে হয়ে গেল এদের সঙ্গে, তা বোধ হয় কখনও ভুলব না। পথে চলতে চলতে এরা আমাকে অনেক নূতন বিষয় দেখাল—পরে পোলিস-ম্যানকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে বাসে তুলে দিল। বিদায়ের আগে তারা আমার নোট বইতে তাদের নাম ধাম দিল, আমি দু'জনকে মাত্র ৪টী পেনি উপহার দিলাম। বিদায়ের কালে তাদের দু'জনের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম; তারা আনন্দে আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে গুড্‌বাই, গুড্‌বাই করতে করতে বিদায় নিল।

রবিবারের চিঠি (লণ্ডনের উপপ্রান্তে)

১৩ই জুলাই, রবিবার। এদিন আর ঘড়ির কাটা মেনে চলতে ইচ্ছা হ'ল না, খুব অলস ভাবেই শুয়ে পড়ে সারা দিনটা কাটিয়ে দিলাম। বিকাল পাঁচটায় বিছানা ছেড়ে একটু নিকটের কোন বাগানে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হল। বাড়ীর ছেলে মেয়েদের বেড়াতে যেতে ডাকতেই তারা আনন্দে সেজে এল। ডলি নামে মেয়েটি সকলের বড়, বয়স তার বার বছর, আর দু'টি ছোট ছেলে—ফ্রাঙ্ক এগার বছরের, এরিক পাঁচ বছরের। বাড়ীতে আড়াই বছরের আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম বিলি; সেও যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিল কিন্তু তার বাবা তাকে ভুলিয়ে উপরে নিয়ে গেলেন।

ডলির মা আমাদের পরামর্শ দিলেন—সহরের বাইরে একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে বেড়াতে যেতে। আমরা ঠিক ছ'টার মধ্যে চা পান ও খাবার খাওয়া শেষ করে বের হলাম। ১৫২ নং বাসে চড়ে Edgware Road ধরে ১৫ মিনিটের মধ্যে সহর ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়ে সেই ছোট খালের ধারে নামলাম। চারদিকেই বেশ ফাঁকা জায়গা, সহরের গণ্ডগোল থেকে বাইরে গিয়ে প্রাণটা যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। প্রথমেই আমরা একটা ছোট পাহাড়ে উঠলাম, পাথুরে পাহাড় নয়—মাটির পাহাড়। সেখানটা ঘাস আর ছোট ছোট ফুলে ভরা। আমরা সকলেই ছোট ছোট ফুল তুললাম। আমাদের দেশের ফসলের জমি নষ্ট করা ফুলকাঁটা গাছও সেখানে দেখলাম।

ক্রমে আমরা সেই ছোট পাহাড়টির একেবারে মাথায় গিয়ে উঠলাম।

অমনি আমাদের চোখে নানা দূরবর্ত্তী স্থান ভেসে উঠল—দক্ষিণে সহর, উত্তরে খাল, পাহাড়, ফাঁকে ফাঁকে সহরতলীর ছোট ছোট সুন্দর পল্লী, মাঝে মাঝে শস্যের ক্ষেত।

পাহাড়ের উপর চারদিক দেখে আমরা ঐ খালের ধারে বেড়াতে যেতে মনস্থ করলাম। খালের ধারে গেলাম, ছোট পোল পার হয়ে অনেক লোকে ওপারে বেড়াতে যাচ্ছে। ওপারের গাছের তলায় কত লোক বসে গল্প করছে, কত লোক বেড়াচ্ছে। আমরা পোল পার না



হাইড্‌পার্কের খালে নৌ-ক্রীড়া

হয়ে এপারেই খালের ধারে ধারে চললাম। এক বুড়ো তার সঙ্গের কুকুরটিকে নিয়ে বেশ মজা করছিল। একগাছা খাটো লাঠি খালের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছিল আর কুকুরটা তৎক্ষণাৎ সাঁতরে গিয়ে সেই লাঠিটা কামড়ে ধরে এনে বুড়োকে দিচ্ছিল। আমরাও বুড়োর সেই খেলায় যোগ দিলাম।

তারপর খালের ধারে ধারে আমরা আরও খানিক চললাম। ফ্রাঙ্ক ভারি দুষ্ট, সে একটা লাঠি দিয়ে পচা পানা টেনে টেনে উপরে আনছিল। জলে নামা চলে না, সকলেরই পা জুতা-মোজায় আঁটা। খানিকদূর গিয়ে

নদীর তীরে একটা মটর শাকের জমি পেলাম। দু'চারটা মটরের সীম তুললাম্। এদেশে মটরের সীম খুব আদরে খায়, কাঁচা মটর সবুজ অবস্থায় শুকিয়ে রেখে অনেকেই সারা বছর ধরে খায়। মটরের শাকও যে একটা সুখাদ্য এটা ছেলেরা জানতো না। দেশে আমরা কেমন করে শাক খাই তা আমি তাদের কাছে বর্ণনা করলাম। মটরের ক্ষেত পার হয়ে আমরা খালের ধারে বড় একটা নোংরা জায়গায় গিয়ে পড়লাম। জল কমে ধাপ বেরিয়ে পড়েছে। সেখানটা কাদা, আবর্জ্জনা আর হাড়গোড়ে ভরা। একটা মরা কুকুর, একটা মরা মোরগ আর একটা মরা পচা কি পাখী—এইসব দেখলাম। সেখানে সবই আমার বড় নূতন লাগছিল, কারণ অনেকদিন লণ্ডন সহরের বৈভব দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেছল। লণ্ডনের বাইরের ওই অঞ্চলের মানচিত্রর বইও আমাদের সঙ্গে ছিল, কখন কোথায় পৌঁছচ্ছি সবই মানচিত্রে দেখছিলাম।

তারপর বাঁয়ে খাল ও ডাইনে সারি সারি গৃহস্থ বাড়ী রেখে আমরা আরও দূরে চললাম। বিকালে গৃহস্থেরা নদীর তীরের দিকে তাদের ছোট ছোট বাগানে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে গল্প করছিল। অনেকে বাগানে কাজও করছিল। ছোট ছেলেরা আমার পানে চেয়ে অপূর্ব্ব কালো দাড়ী-যুক্ত মানুষ দেখে যে আনন্দ পাচ্ছিল, তাতে মনে হয় লণ্ডনের এরকম জায়গায় ভারতবাসী কখন আর যায় নি।

খালধারে চলতে চলতে একটা খুব বড় রাস্তা পাওয়া গেল। সেখানে নদীর পোলের উপর দিয়ে অনবরত ট্রাম, বাস, মোটর আর লোকজন যাতায়াত করছে দেখলাম। মানচিত্রে দেখা গেল, রাস্তাটা বহু দূর চলে গিয়েছে। আমরা পোল পার হয়ে রাস্তার অপর পারে একটা পোড়ো' বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম—ভাঙ্গা দালান কোটা, ভাঙ্গা একখানা মালটানা মটরগাড়ী পড়ে রয়েছে, একধারে প্রকাণ্ড খড়ের পাল্লা। ফ্রাঙ্ক গিয়ে

ভাঙ্গা মটর গাড়ীখানার মধ্যে লুকাল। এদিকে এরিক (৫ বছরের ছেলেটি) একটা কালো বিড়ালের সঙ্গে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করে সে বিড়ালটাকে ধরে আনল। ডলী সেই বাড়ীর পাশে জঙ্গলে ফুল তুলতে গেল।

সকলেই এই সব বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত, আমি অতি কষ্টে সবাইকে একত্র করে আরও খানিক দূর গিয়ে দেখে আসবার মতলব করলাম। ঘড়িতে তখন আটটা, আমরা আরও একঘণ্টা বেড়াব ঠিক হল। জুলাই



হাইড্-পার্কের রাস্তা

মাস, ন'টার পর সন্ধ্যার অন্ধকার আরম্ভ হয়। আমরা এক ফাঁকা মাঠে খড়ের জমির দিকে চললাম। ডলী তার ফুলের তোড়াটি সুন্দর করে সাজিয়েছিল। সে তোড়া হাতে, ফ্রাঙ্ক আগাছা সমেত ফুল হাতে আর এরিক সেই কাল বিড়াল কোলে ক'রে—সবাই আমরা চললাম। জমির মধ্যে আমরা খুবই আনন্দে ছুটোছুটি আরম্ভ করছিলাম। খড় কোথাও লম্বা, কোথাও খাটো, কোথাও একেবারে মাটিতে নুয়ে পড়েছে। হঠাৎ আমি একটা লম্বা উলুর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম—হো হো করে তিন

জনে দৌড়ে এসে আমাকে খুঁজে বের করল। লণ্ডন সহরের বাইরে ফাঁকায় গিয়ে কি আনন্দ যে এদিন পেলাম তা বলতে গেলে অনেক কথা।

তারপর আমরা একটা বাগানের পাশ দিয়ে চললাম। তার চারদিক এমন সুন্দর করে সাজান যে, হঠাৎ দেখলে আকাশ-ছোঁয়া দেওয়ালে ঘেরা বাগানটি বলে বোধ হয়। বাগানের শেষ সীমানায় বড় রাস্তার ধারে এসে উঠলাম। সেখানে রেল গাড়ীর মত গাড়ীর মধ্যে অতি ছোট ছোট দোতলা কুঠরীতে অনেক গরীব পরিবার বাস করছে দেখলাম। গাড়ীতে চাকা আছে, দরকার মত স্থানান্তরে যাতায়াত করতে পারে। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, ইংলণ্ডে গরীব বা পথের লোকদের বাসের জন্য সরকারী গাড়ী আছে,—ঐ সব দেখে সে কথা মনে হল। ওঃ, কত কষ্টে যে তারা বাস করে তা বলা যায় না। দেখলাম, গায়ে তাদের ময়লা জামা, পরণে ময়লা প্যাণ্ট, ছেলেদের গায়ে ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতো পায়। দেখে বড়ই কষ্ট হল। অল্প পরে আমরা সদর রাস্তায় এসে পড়লাম।

রাস্তায় ট্রাম চলছিল। তখন আমরা ঘরে ফিরব, কিন্তু এক মুস্কিল হল। এরিক তার বিড়ালের বাচ্চা কিছুতেই ছাড়বে না, ডলীও নিয়ে যেতে দেবে না। আমি নিয়ে যেতেই বললাম। ডলী বুঝিয়ে বলল, পরের বিড়ালছানা নেওয়া উচিত নয়। অবশেষে এরিক সেটা কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল।

তারপর আমরা আর খানিকটা ঘুরে ফিরে চারদিকের দৃশ্য দেখলাম। দূরে পাহাড়ের গায়ে আঁকা-বাঁকা বৃক্ষশ্রেণী উঠেছে। সহর ছেড়ে মাঠেঘাটে এসেছি তবুও চারদিকে যেন সব সুসজ্জিত রয়েছে, প্রত্যেক গাছপাতাটি পর্য্যন্ত মানুষের পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম, লণ্ডন এখানেও এত সুন্দর!

টার সময় সূর্য্য ডুবে গেল। দশটার পর একটু অন্ধকার হবে; ফিরবার জন্য ট্রামপোষ্টের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেদিন রবিবার; লোক সহরের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল যে, পর পর ১২।১৪ খানা মোটর বোঝাই হয়ে আমাদের পোষ্টে না ধরেই চলে গেল। আমরা খানিকটা পথ হেঁটে, খানিকটা পথ মোটর-বাসে করে ঘরে এলুম। তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

[বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে]

আমাদের কার্য্য

২৪শে এপ্রিল (১৯২৪) ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশন খোলা হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। একজিবিশনে ইংরেজ রাজত্বের প্রত্যেক দেশের জন্য পৃথক প্যাভিলিয়ন বা মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল। পরম রমণীয় সুবিশাল ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের বেঙ্গলকোর্ট নামক অংশে আমাদের ষ্টল হয়েছিল। এইরূপ বিরাট প্রদর্শনীটির বিবরণ ভারতবাসী প্রত্যেকেরই জানা দরকার। এই পুস্তকের শেষাংশে ব্রিটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের সচিত্র বিবরণ দেওয়া গেল।

শিল্পের দিকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বাংলার নানাবিধ শিল্পের ছয়টী ষ্টল হয়েছিল। তার মধ্যে বটকৃষ্ট পালের ঔষধাদি, বেঙ্গল ক্যানিংএর রক্ষিত ফল ও মিষ্টাদি খাদ্য, এইচ্, বসুর সুগন্ধি দ্রব্যাদি, ঢাকার কাপড় ও শঙ্খের শাঁখা, মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের খেলনা, বাংলার বিভিন্ন স্থানের কাঁসা পিতলের বাসন প্রভৃতি ছিল। বাংলা থেকে কেবল আমরাই বে-সরকারী অর্থাৎ স্বাধীনভাবে আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের অলঙ্কারের একটি ষ্টল ক'রেছিলাম।

আমাদের ষ্টলে আমি প্রথমে শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত

বংশীয়া বাঙ্গালী মহিলাকে ষ্টল-পরিচালনের কার্য্যে নিযুক্ত করি। এ সময়ে এঁর স্বামী লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শ্রীমতী ঘোষ প্রদর্শনীক্ষেত্রে নানাদেশীয় সুশিক্ষিতা মহিলাদের কার্য্য করতে দেখে বাঙ্গালী মহিলার যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্যই নিজে কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীমতী ঘোষ শাঁখা-শাড়ী পরতেন, কপালে সিন্দূর পরতেন। অভিনব সাজে সজ্জিতা বাঙ্গালী মেয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলার অভিনব ধরণের অলঙ্কারের দোকান ইয়োরোপীয়দের চক্ষে খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

বিলাতে শ্রমজনিত কাজগুলি পুরুষেরা করেন, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমের কাজ মেয়েরাই করেন। ভাল ভাল দোকানে দ্রব্যাদি বিক্রয় অধিকাংশ স্থানে মেয়েরাই করেন। বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের কার্য্যকারকদিগের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল—সতের হাজার। এ হতেই পাঠকগণ প্রদর্শনীর বিশালতা কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারেন।

মে, জুন দু'মাস একজিবিশন চলবার পর আমাদের ষ্টলের বিক্রি খুব বৃদ্ধি পেল। তখন আমি আঁর দু'টি ইংরাজ কন্যাকে আমাদের ষ্টলে কার্য্যে নিযুক্ত করলাম। বড়টির নাম Miss Adams, বয়স ২৪ বৎসর, ছোটটির নাম Miss Jones, বয়স ১৫ বৎসর। শ্রীমতী ঘোষ এবং এই দু'টি কন্যা—এঁরা সকলেই অতি সুন্দর ভাবে কাজ করতেন। সমস্ত কাজই নিজের কাজের মত যত্নের সঙ্গে করতে দেখে আমার বড় আনন্দ হত। এঁদের প্রত্যেককে আমি সাপ্তাহিক পৌণে তিন পাউণ্ড অর্থাৎ মাসিক কমিবেশী পৌণে দু'শো টাকা হিসাবে বেতন দিতাম। শ্রীমতী ঘোষ তিনটি মাস অতি যোগ্যতার সঙ্গে কার্য্য করে নিজের আবশ্যক বশতঃ কার্য্য ত্যাগ করেন।

বিলাতের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত বেশী দামী গহনা পরা বিশেষ পছন্দ করে না। মোটামুটি গলায় সরু হার, কানে লম্বা দুল, হাতে একটা আংটি—এই তাদের গহনা। কেউ কেউ মাত্র একটা হাতে অতি সাদাসিদে রকমের ব্রেসলেট বা বালা পরে—আজকাল হয়েছে আর্মলেট, তাগার মত একটা জিনিস ডানায় পরে, আর হারের স্থানে হাল ফ্যাসনে হয়েছে—এক রকম সরুমোটা মালা, এগুলি হাতিদাঁত, ঝিনুক, রঙ্গিন পাথর প্রভৃতির তৈরী; উপরে সরু আরম্ভ হয়ে ক্রমে নীচেয় মোটা।

আমাদের হাতিদাঁতের উপর গিনিসোনায় মোড়া 'বীণাপাণি শাঁখা' ওদেশে বেশ পছন্দ করেছে। 'বীণাপাণি আর্মলেট' অর্থাৎ তাগা খুবই বিক্রি হয়েছিল, কারণ তাগা পরা ইংরাজদের হাল ফ্যাসন।

আমরা আমাদের অলঙ্কারের সঙ্গে হাতিদাঁতের প্রস্তুত নানা রকম সেপটীপিন, মালা, ফুল, লকেট, খেলনা, পুতুল প্রভৃতিও বিক্রয় করতাম; সেগুলো কতক আমাদের ঘরে আর কতক মুর্শিদাবাদের তৈরী।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট-ষ্টলগুলিতে যে সকল শিল্পদ্রব্য ছিল, তার মধ্যে বাংলার মেয়েদের হাতের প্রস্তুত লেস, রুমাল ও নানা রকম সূচীশিল্প ছিল। অনেকগুলি সুন্দর কাঁথা বাংলার পল্লী থেকে সংগ্রহ করে একজিবিশনে পাঠান হয়েছিল। সেগুলো দেখে ইংরেজ-মেয়েরা বাংলার মেয়েদের ধৈর্য্যের খুবই প্রশংসা করত। কাঁথাগুলো এতই সুন্দর যে কোন কোন খানা ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন শত টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রি হয়েছিল।

বিলাতের সর্ব্বত্র সমস্ত জিনিষই এক দরে বিক্রি, মূল্যবান দ্রব্য থেকে শাক তরকারী পর্য্যন্ত কোন জিনিষেই দর দস্তর করবার প্রথা নাই। এইরূপ সুনিয়ম থাকায় আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক জিনিষ বিক্রি করতে পেরেছিলাম।

তিনটী মেয়ের উপর সমস্ত কার্য্যভার দিয়ে আমি প্রদর্শনীক্ষেত্রের নানাস্থান ঘুরে নানাপ্রকার শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্যের বিষয় অবগত হতাম। ছ'মাস কালব্যাপী দীর্ঘ সময় একজিবিশন দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম তথাপি অনেক বিষয় দেখতে সময় হয় নি।

প্রদর্শনীক্ষেত্র নানাপ্রকার আমোদ উৎসবাদিতে সর্ব্বদা ভরপুর থাকত, আমরা অবকাশ মত সেগুলির কিছু কিছু দেখতাম। বিলাতে পথ ঘাটে সর্ব্বত্র সমপরিমাণ মেয়েপুরুষের গতিবিধি, কিন্তু প্রদর্শনী বা আমোদ উৎসবাদিতে বেশীর ভাগ মেয়েরাই যোগ দিয়ে থাকেন। আমি দেখতাম, একজিবিশনের সমস্ত লোকের মধ্যে তিনভাগের দুই ভাগই স্ত্রীলোক। প্রায় সকলেই ছোট ছেলে মেয়েদিগকে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। শিশুদিগকে রাখবার একটী চমৎকার বাড়ী প্রস্তুত হয়েছিল। যে সকল স্ত্রীলোকের শিশুসন্তান বাড়ীতে রেখে আসবার সুযোগ নাই, তাঁরা সন্তান সঙ্গে করেই এসে ঐ স্থানে তাদের রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে একজিবিশন দেখতেন। শিশুদের সেখানে রাখবার খরচ ৪ ঘণ্টায় ছয় আনা এবং সমস্ত দিনের জন্য বার আনা নির্দ্ধারিত ছিল। সন্তান রাখবার কর্ত্তৃপক্ষেরা সন্তান রেখে অভিভাবককে একটি টিকিট দিতেন, সন্তান নেবার সময় ঐ টিকিট দেখিয়ে সন্তান নিতে হত। শিশুদের আহারাদির ও সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বের চমৎকার ব্যবস্থা সেখানে ছিল, অধিকন্তু সেখানে শিশুদের উপযোগী এমন সুন্দর সুন্দর আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা ছিল যে, তাদের পক্ষে উহাই প্রদর্শনীর আমোদ উপভোগের জন্য যথেষ্ট ছিল।

সহর ও পল্লী থেকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ আপন আপন স্কুলের ছাত্র, ছাত্রীগণকে নিয়ে একটী দল বেঁধে একজিবিশন দেখতে আসতেন। ঐ সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণকে ছাত্র, ছাত্রীদের প্রতি সন্তানের মত ব্যবহার করতে দেখতাম। তাদের সকলকারই জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল।

আমাদের ষ্টলে বিক্রয়ের জন্য হাতির দাঁতের প্রস্তুত তাজমহল, হাওদা অর্থাৎ হস্তীর উপর সজ্জিত বেশে ভারতীয় রাজা, জগন্নাথের রথ, ময়ূর পঙ্খী বাইচের নৌকা, বজরা নৌকা, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির মূর্ত্তি এবং নানাবিধ ভারতীয় জীবজন্তুর মূর্ত্তি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ এবং অনুসন্ধিৎসু দর্শকগণকে আমরা ঐ সমস্ত জিনিষের বিবরণ শুনাতাম, তাতে আমাদের ষ্টলের সম্মুখে অনবরত ২৫ হতে ১০০ দর্শক উপস্থিত থাকত।

মিস জোনস্ নাম্নী ১৫ বৎসর বয়স্কা যে মেয়েটী আমাদের ষ্টলে কাজ করত, সে অল্পদিন হল স্কুলের পড়া শেষ করেই আমাদের কাজে এসেছিল। তার সদানন্দ চঞ্চল ছুটোছুটিতে আমাদের ষ্টলটি আনন্দে ভরপুর থাকত। আমি তাকে একখানি বাংলার শাড়ী উপহার দিয়েছিলাম, ষ্টলে সে তাই পরে বাঙ্গালী-বেশে গ্রাহকদের নিকট জিনিষ বিক্রয় করত। দর্শকগণ তাকে ভারতীয় মেয়ে মনে করে কখন কখন ভারতীয় সংবাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, সে হেসে জানাত—সে বিলাতেরই মেয়ে। মিস জোনস্ মাত্র পনর বৎসরের বালিকা হলেও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতায় তাকে পূর্ণাঙ্গ সুন্দরী মহিলার মত দেখাত। পুস্তকে আমাদের ষ্টলের যে ছবি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যস্থলে এই কন্যাটি ঠিক বাঙ্গালী মহিলার মতই সুন্দর শোভা পাচ্ছে।

আমাদের ষ্টলের এই ইংরেজ মেয়ে দু'টি বড় শান্ত স্বভাবের ছিল, গ্রাহকের নিকট বেশী কথা বলে জিনিষ বিক্রির অত্যধিক চেষ্টা এরা কখনও করত না, আমিও এদের এই ভাব বেশ পছন্দ করতাম।

শনিবারে একজিবিশনে খুবই ভিড় হত, আমি যে পরিবারে বাস করতাম, সেই বাড়ীর একটী বার বছরের মেয়ে প্রতি শনিবারে একজিবিশনে এসে আমার কার্য্যের সাহায্য করত। শনিবারে বিলাতের ছেলে মেয়েদের

স্কুল বন্ধ থাকে তাই একজিবিশনে আসতে তার সুযোগ ছিল। সে ভারি হাসিখুসি স্বভাবের মেয়ে। সে সেই ডলী, তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর উৎসব ক্ষেত্রে বেড়িয়ে বড়ই আনন্দ পেতাম।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্ত্রী রাণী মেরী একদিন বেঙ্গল কোর্টে এসেছিলেন, —আমাদের তৈরী অলঙ্কার দু'একটী হাতে নিয়ে দেখে প্রশংসা করেছিলেন।

আর একদিন স্পেনের রাণী আমাদের ষ্টলে এসে বীণাপাণি আর্গলেট কিনে নিজে পরেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর একটী রাজপরিবারস্থ কন্যা ছিলেন, তিনিও একটী কিনে হাতে পরেছিলেন।

একজিবিশনে সারা পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ দেখতাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক লোকও সেখানে একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন। একটী বাঙ্গালী মহিলা নিযুক্ত হয়েছিলেন—বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বস্ত্রবিভাগীয় ষ্টলে, ইনি বাংলার সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লীলা পাল। ইংলণ্ডের নানাস্থানের বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীগণ আমাদের ষ্টলে আসতেন এবং বাংলার শিল্পকে বিলাতে প্রতিষ্ঠান্বিত করবার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। ১০।১২টী বাঙ্গালী মহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল; তার মধ্যে শ্রীমতী লতিকা বসুর নাম এ দেশের অনেকেই জানেন।

মে মাসের প্রথম হতেই আরম্ভ হয়ে অক্টোবরের শেষ পর্য্যন্ত ছয়টা মাস বেশ সরগরমের সঙ্গে একজিবিশনটি চলেছিল। এই ছ'টা মাস আমরা যে কত আনন্দে কাটিয়েছি, কত নূতনত্বের মধ্য দিয়ে চলেছি তা মনে করেও আনন্দ হয়।

বেঙ্গল কোর্টে ইংরেজ বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক কাজ করতাম, আমাদের সকলের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব জন্মেছিল।

একজিবিশন শেষ হবার পর আমাদের পরস্পরের এই বিচ্ছেদ আমাদের প্রাণে বড়ই ব্যথা দিয়েছিল।

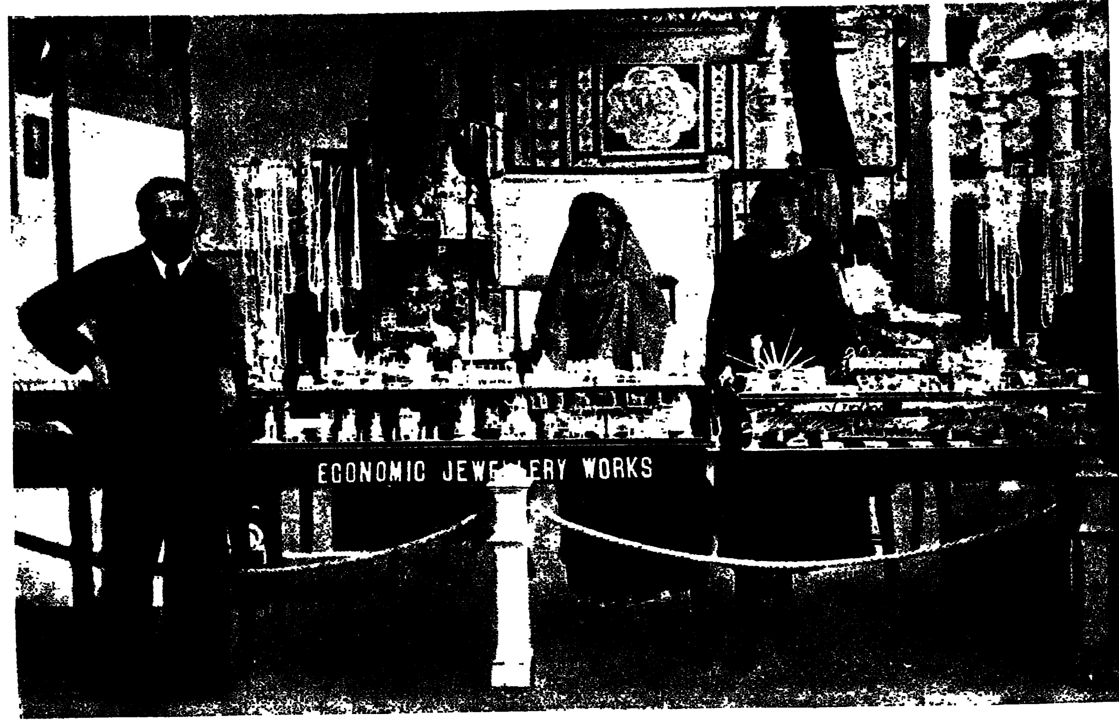
বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ থেকে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটার রায় যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর কোমর উদ্দিন আহম্মদ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বেঙ্গল কোর্টের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের সহায়তায় আমি নানা অযোগ্যতার মধ্য দিয়েও আমাদের ষ্টলের কার্য্যে সফলতা লাভ করেছিলাম।

বাংলার কাংস্য শিল্প

বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের জিনিস বাংলার বাইরে কিরূপ আদর পেতে পারে এবং বিদেশে রপ্তানি করে কিরূপ প্রসার ও উন্নতি লাভ করতে পারে, তৎসম্বন্ধে দু'চারটী কথা আমি এখানে বলছি।

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয়ের অধিনায়কত্বে রাণাঘাটে ১৩৩০ সালে কংসবণিক শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাতে বলেছিলেন যে, জাতীয় উন্নতি করতে হলে, জাতির মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার করতে হবে; ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর বিদেশে বাংলার শিল্পের আদর যাতে অধিক পরিমাণে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বণিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজের অনুকরণে দক্ষতা অর্জ্জন করতে হবে অর্থাৎ বর্ত্তমান কালোপযোগী বিভিন্ন লাইনের ব্যবসায় লিপ্ত হবার জন্য জাতিকে উৎসাহিত ও শিক্ষিত করতে হবে।

উক্ত রাণাঘাট প্রদর্শনীতে বঙ্গদেশের কো-অপারেটিভ্ সমিতি সমূহের


ECONOMIC JEWE ERY WORKS

রেজিষ্ট্রার ও ব্রিটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনের বেঙ্গল কোর্টের কর্ত্তৃপক্ষীয় রায় বাহাদুর যামিনী মোহন মিত্র মহাশয়ও উপস্থিত হয়ে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণকে লণ্ডন এক্‌জিবিশনে জিনিস পাঠাবার জন্য উৎসাহিত করে-ছিলেন—এবং তার ফলে বঙ্গীয় কংসবণিক সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের চেষ্টার ফলে ও মাননীয় মিত্র মহাশয়ের সহায়তায় লণ্ডন বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে কংসবণিক শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য একটী ষ্টল স্থাপিত হয়।

ঐ ষ্টলের জিনিস প্রদশন ও বিক্রয় করবার জন্য দেশীয় শিল্পীগণের পক্ষ থেকে কেউ না যাওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত কর্ম্মচারীগণের হস্তে উক্ত ষ্টলের ভার প্রদত্ত হয়। এক্‌জিবিশনে বিক্রয়ের আধিক্য দেখে মনে হয়েছিল যে, যদি দেশীয় মহাজনদের পক্ষ থেকে কেউ উপস্থিত হতে পারতেন, তবে বিক্রয়ও বেশী হত এবং প্রদর্শকগণেরও বেশ লাভ হত। তবে আমাদের ষ্টলটী এই ষ্টলের সম্মুখেই তৈরী হয়েছিল বলে, আমি সুযোগ পেলেই এই ষ্টলের সাহায্য করতাম।

যে সকল জিনিস বিলাতে প্রেরিত হয়েছিল তন্মধ্যে খাগড়া, নবদ্বীপ, বহিরগাছি, কলম প্রভৃতি স্থানের কাঁসার জিনিষগুলিই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কলকাতা সিমলার পিতলের পুতুল, শান্তিপুরের বৈঠক ও কমণ্ডলু এবং রাণাঘাটের Cobra Candle Stick অর্থাৎ সর্প-বাতিদান যদি আরও অধিক পরিমাণে পাঠান হত, তা হলে তাও পড়ে থাকত না, ইহাই আমার ধরণা।

গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত দু'টী ইংরাজ মহিলার উপর এই সব জিনিসের বিক্রয়ের ভার ছিল। অবসর পেলেই আমি গিয়ে ইংরাজ মহিলাদ্বয়কে জিনিষগুলির নাম ও পরিচয় বুঝিয়ে দিতাম, ও সেগুলি কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কেমন করে পরিষ্কার রাখতে হয় ইত্যাদি শিখিয়ে দিতাম।

কাঁসার পাত্র পরিষ্কার রাখতে বিশেষ কোন মেটাল-পালিশের প্রয়োজন হয় না, কাঠ বা কয়লার ছাই দিয়ে চমৎকার পরিষ্কার করা চলে শুনে ইংরাজ মহিলারা আশ্চর্য্য বোধ করতেন।

বাসনরূপে কাঁসার ব্যবহার বিলাতে এখনও প্রচলন হয় নি, কিন্তু বলা-বাহুল্য অপরাপর বহু কার্য্যে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। প্লেট, ডিস্ প্রভৃতির বিক্রয়াধিক্য দেখে আমার মনে হয়, বহুল পরিমাণে এক এক সাইজের জিনিস রপ্তানি করতে পারলে কাঁসার প্লেট ও ডিস্ বিলাতে বাসনরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এবং তা বিক্রয়ের দ্বারা ব্যবসায়ীগণের ধনাগমের পথ সুগম হয়।

ধাতুদ্রব্য পরিষ্কার করবার জন্য ইংরাজেরা নানা প্রকারের কৌটায় ভরা পালিশ ব্যবহার করে থাকেন। যে মেটাল পালিশ আমরা সচরাচর বাজারে দেখতে পাই, তা অতি সূক্ষ্ম কাচের গুঁড়ার সঙ্গে মোম, প্যারাফিন বা ভ্যাসেলিন মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বিলাতের Wales (ওয়েল্স্) দেশের সমুদ্রতীরের কাদা থেকে রুজ্ নামক সোনা পালিশের উৎকৃষ্ট গুঁড়া প্রস্তুত হয়। এইরূপে ও দেশের ছাই-মাটি বুদ্ধি-কৌশলে বিদেশে বিক্রীত হয় ও দেশের ধনবৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করে। আমার মনে হয় যে, কাঠের ছাই গুলিকে রং চঙ্ করে সুদৃশ্য কৌটায় ভরে "কাঁসার পালিশ" নাম দিয়ে আমরাও দেশে বিদেশে বিক্রয় ক'রে বিশেষ লাভবান হতে পারি।

একজিবিশনে ছোট ছোট কাঁসার ডিস্গুলি বেশী পরিমাণে বিক্রী হত। এই সমস্ত জিনিসের কলকাতার খরিদের উপর লাভ ও খরচা চাপিয়ে দেড়গুণ দু'গুণ দাম ফেলা হয়েছিল। ১০ শিলিং অর্থাৎ আনুমানিক ৭৲ টাকার এবং তা অপেক্ষা কম দামের জিনিসগুলি খুব বেশি বিক্রী হত। বিলাতে দরদস্তুর করার প্রথা নাই। ন্যায্য দামের লেবেল

সমস্ত জিনিসের গায়ে আঁটা থাকে। আমাদের বাংলার শিল্পদ্রব্যগুলি বিক্রয়ের একটা অসুবিধা এই যে, ইহার প্রত্যেক জিনিষটী পৃথক রকমের, বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন প্যাটার্ণের। প্রত্যেক জিনিসটী বিভিন্ন দামে বিক্রী করায় বড়ই অসুবিধা হয়। আরও বেশী অসুবিধার কথা এই যে, একই প্রকারের একই মূল্যের বহু বহু জিনিস না হলে পাইকারী বিক্রয়ের জন্য মহাজনেরা নিতে চায় না ; সকলেই দেখে থাকবেন যে বিলাতী জিনিস গুলি কেমন সেট্ সেট্ ডজন ডজন করে প্যাক্ করা থাকে। আবার ১২ ডজনের প্যাকেট কেমন বিদেশে পাঠাবার উপযোগী করে কাঠের বাক্সে সুন্দরভাবে প্যাক্ করা থাকে। আমার মনে হয়, আমাদের দেশীয় জিনিস গুলিও ঐরূপ একই গঠনের এক এক প্রকারের অনেক গুলি এক সঙ্গে প্রস্তুত করা উচিত।

বিলাতের লোকেরা সময়ের মূল্য বেশী বোঝেন ও ব্যবসায়ীগণের ব্যবসা-সাধুতা বা Trade honesty সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করেন না। সুতরাং ওজন প্রথায় বিক্রী না করে যদি পিস্ (Piece) হিসাবে জিনিস বিক্রীর ব্যবস্থা করা যায় ও জিনিসের দর গায়ে লেখা (Mark) থাকে, তবে বিলাতের লোকের মধ্যে আমাদের দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে বিক্রী হতে পারে। কাঁসা পিতলের ছোট ছোট জিনিসগুলির বিক্রয়াধিক্য দেখে কতকগুলি ইহুদী বণিক বেঙ্গল কোর্টে এসে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বক্রী সমুদয় ছোট জিনিস গুলি খরিদের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা দর বেশী দিয়ে খরিদ করে নিয়ে গিয়ে তিনগুণ দামে বিক্রী করেছিল। যদি ষ্টলে কোনও দেশীয় প্রদর্শক বা প্রতিনিধি থাকতেন, তবে এই তিনগুণ লাভ যে তাঁদেরই হত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঐ সমস্ত জিনিসের বিক্রয়াধিক্য দেখে একজিবিশন কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় মাল পাঠাবার জন্য অর্ডার দিয়েছিলেন কিন্তু বেশী প্রস্তুত

না থাকায় অধিক পরিমাণে কোনও মাল সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি।

কাঁসার উপর লতা, পাতা, ফুল, পৌরাণিক ছবি প্রভৃতি এন্‌গ্রেভ্‌ বা খোদাই করা ডিসগুলি ইংরাজ মহিলারা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে কিনেছিলেন। কমলেকামিনী, মান-ভঞ্জন, কালীয়দমন, শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-বিহার প্রভৃতির ছবি খোদাই ডিস্‌গুলির উপরেই ক্রেতাদের ঝোঁক বেশী পড়েছিল এবং আমাকে ষ্টলে উপস্থিত পেলে তাঁরা এই সকল পৌরাণিক ছবিগুলির অর্থ আমার কাছে শুনবার জন্য ঝুঁকে পড়তেন।

কাঁসার জিনিষ ব্যতীত মোরাদাবাদের পিতলের গেলাস, বাটী, ডিস প্রভৃতি জিনিষগুলি খুব আদরের সঙ্গে বিক্রী হয়েছিল।

বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে আমাদের দেশীয় কাঁসা পিতলের কোন কোন জিনিসের প্রতি ইংরাজদের যেরূপ আগ্রহ দেখলাম, তাতে আমার মনে হয়, আমাদের দেশের কোন ব্যবসায়ী যদি ঐ সকল বাসন নিয়ে ব্যবসা উপলক্ষে একটী দোকান করেন, তবে প্রচুর বাসন সেখানে বিক্রী হয়, এবং যথেষ্ট লাভও হয়। এমন কি সেই অভিজ্ঞতা থেকে এতটা সাহস ও শক্তি জন্মাতে পারে যে, লণ্ডন সহরে আমাদের দেশের শিল্পীদের পক্ষ থেকে একটি বড় দোকানের সৃষ্টি হতে পারে এবং তদ্দারা ভবিষ্যতের জন্য এই দেশীয় ব্যবসায়ের একটা বিশেষ পসার বিলাতে হতে পারে। এই সমস্ত কার্য্য নিজেদেরই করতে হয়, ইংরাজ এজেণ্ট দ্বারা এ সকল ভালভাবে চলে না।

ব্রিটিশ এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ান অর্থাৎ ভারতীয় প্রদর্শনী-মণ্ডপটীকে ভারতের প্রদেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কোর্টে বিভক্ত করা হয়েছিল। বাংলার জিনিষ বেঙ্গল কোর্টে রক্ষিত হয়েছিল। উক্ত কোর্টে যদি ভালরূপ ব্যবসা-জ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মচারী বেশী সংখ্যায় নিযুক্ত

সাধারণ ভ্রমণকারীর পক্ষে Thomas Cook & Sons এবং বেশী টাকার সওদাগরী কারবারীদের পক্ষে Lloyds Bankএ টাকা রাখা ভাল। কলকাতায় এদের সকলেরই আপিস আছে।

ভ্রমণকারীর পক্ষে যথাসম্ভব কম জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়া সুবিধাজনক, বিলাতে মাত্র সুট্‌কেশ একটী সঙ্গে নিয়েই সর্ব্বত্র ভ্রমণ চলে। বিছানা, ঘটি বাটী সঙ্গে নেওয়া আবশ্যক করেনা।

ঘড়ি, নোট বই, কাগজ, পেন্সিল, Personal visiting card বা Business card সঙ্গে রাখা দরকার। নোট বইএ গন্তব্য স্থানের আবশ্যক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর প্রভৃতি টোকা থাকা ভাল। সূচ-সূতা, বোতাম, দেশলাই, ছোট মোমবাতী, সাবান, অতিরিক্ত রুমাল, পোষ্টকার্ড সঙ্গে থাকলে অনেক সময় কাজে লাগে।

লেবু, কমলালেবু, আচার, দুগ্ধ, গরম জল, সোডাওয়াটার, লেমনেড Fruit salt, কাঁচা ডিম, হরীতকী, আমলকী এই সব জিনিস অবস্থা ভেদে পথক্লান্তি নিবারক; জাহাজে Sea-sicknessএর পক্ষে লেবু অতি উপকারী।

বিদেশের শারীরিক অনাচারে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, এর জন্য মাঝে মাঝে নিমপাতা, চিরেতা, কোয়াসিয়া প্রভৃতির ব্যবহার করা উচিত; একটুকু কুইনাইন সঙ্গে রাখা ভাল।

প্রত্যেক নতুন যায়গায় গিয়ে সেখানকার ছোট মানচিত্র ও গাইড বই পাওয়া সম্ভব হলে সঙ্গে রাখা গতিবিধির পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক।

চিঠিপত্রাদির উত্তরের জন্যে গন্তব্য স্থানের পোষ্ট মাষ্টার বা হোটেলের মারফৎ চিঠির ঠিকানা ব্যবহার করা যেতে পারে। সময় মত সেখানে উপস্থিত না থাকলে পোষ্টাফিস বা হোটেলকে লিখে নিজের ঠিকানায় আনতে হয়।

বিদেশে চাল-চলন খাটো করে খুব কম খরচে চলেও শেষে দেখা যায় হিসাবের বেশী খরচ হয়ে গিয়েছে, এ জন্য খরচ আগাগোড়াই খুব হিসাবের সঙ্গে করতে হয়।

আহার্য্য দ্রব্যের বাদ-বিচার যত কম করা যায় ততই সুবিধা। ছুৎমার্গ রক্ষা করা অনেক স্থলেই অসম্ভব।

পথকষ্ট ও নানা অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী, সে গুলিকে দুঃখ কষ্ট বলে মনে না করে নতুন রকমের উপভোগ বলে মনকে প্রবোধ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিভিন্ন দেশের ধর্ম্ম ও রীতিনীতিকে সমর্থন করে সেই সেই দেশবাসীর সঙ্গে গতিবিধি করা কর্ত্তব্য।

ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করবার সুযোগ গ্রহণ করা চাই, তাতে আনন্দ আছে, আর এমন কিছু তাদের কাছে শেখা যায় যা প্রবীণদের কাছে আশা করা যায় না।

পথ চলতে অপরিচিত লোকের সঙ্গে খুব বেশী গল্প-সল্প করা চাই, গন্তব্য স্থানের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনে নেওয়া চাই। ট্রেনে বা জাহাজে বই পড়ার চেয়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে গল্প করে পরস্পরেরই লাভ আছে।

দু তিন জন বন্ধু-বান্ধব মিলে একত্র ভ্রমণের চেয়ে একাকী ভ্রমণে অনেক স্থলে বেশী অভিজ্ঞতা লাভ হয়। সর্ব্বদা বিনয়ী হলে একাকী ভ্রমণের অসুবিধা লাঘব হয়। না জানা বিষয় সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া উচিত।

পরিশেষে আমার কথা এই যে, জ্ঞানান্বেষী হয়ে, অনুসন্ধিৎসু হয়ে, শিক্ষার্থী হয়ে ভ্রমণ করলেই বিদেশ ভ্রমণ বেশী সার্থক হয়।

সমাপ্ত।

করা হত, তা হলে বাংলার প্রদর্শকগণের প্রদর্শিত শিল্প বিলাতে একটা পাকাপোক্ত ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হত—এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিদেশে ভারতের বাইরে আমাদের দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি চালাতে হলে আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্য থেকে কার্য্যক্ষম ও অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করে উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে হবে এবং বিভিন্ন দেশের প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে গ্রাহক আকর্ষণ করতে হবে। এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের দেশীয় শিল্পী মহাজনগণের মনোযোগ অত্যন্ত কম দেখে সময়ে সময়ে আমি আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে পড়ি।

বিদেশ-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমি আমার দেশীয় শিল্পী মহোদয়গণকে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করতে অনুরোধ করছি। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য যতটা বিদেশী মাল আমাদের ব্যবহার করতে হয়, অন্ততঃ যদি সেই টাকার মাল আমরা বিদেশে পাঠিয়ে বিক্রী করতে না পারি—তা হলে আমাদের বল যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবে, তা সহজেই বোঝা যায়না

ষষ্ঠ অধ্যায়

[স্কট্‌লণ্ড]

এডিনবরা যাত্রা

কলকাতা থেকে আসবার সময় জাহাজে রেভারেণ্ড ডাঃ রবার্ট মরিসন নামক একজন স্কট্‌লণ্ডবাসী ইংরেজের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। লণ্ডনে পৌছে তিনি সপরিবারে এডিনবরায় যান, আমি লণ্ডনে থেকে গেলাম।

একদিন ডাক্তার মরিসন লণ্ডনে এম্পায়ার একজিবিশন দেখতে এসে আমাদের ষ্টলে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং একজিবিশন শেষ হবার পর এডিনবরা গিয়ে তাঁর বাড়ীতে দু'সপ্তাহ থেকে আসবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

অক্টোবরের শেষ ভাগে একজিবিশন শেষ হল, নবেম্বরের প্রথম তিন সপ্তাহ আমি লণ্ডন সহরের নানা দর্শনীয় বিষয়গুলির অধিকাংশ দেখে নিয়েছি। এমন সময় মরিসন সাহেবের আহ্বান-পত্র পেয়ে আমি ২৪শে নবেম্বর (১৯২৪) তারিখে ট্রেণে স্কট্‌লণ্ডের রাজধানী এডিনবরা রওনা হলাম। লণ্ডন থেকে এডিনবরা রেলপথে চারশো মাইল উত্তরে। ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীতে আড়াই পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা। এখানে প্রায় সকল লোকই তৃতীয় শ্রেণীতে চলে।

লণ্ডনের মধ্যবর্ত্তী বিরাট ইউষ্টন্ ষ্টেসনটি থেকে সকালে ১০ টায় ট্রেণে

উঠলাম। পথে সহর, পল্লী, পাহাড়, ক্ষেত্র, নদীর সৌন্দর্য্য প্রত্যেকটি এক একটি নূতন উপভোগ্য দৃশ্য। লিভরপুর থেকে মাঞ্চেষ্টর পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড কৃত্রিম ক্যানেল, ট্রেণে ক্যানেল পার হবার সময় তার মধ্যে জাহাজ চলতে দেখলাম। এই পথেই আমাদের ভারতবর্ষের যত তূলা জাহাজ বোঝাই হয়ে মাঞ্চেষ্টরে যায়, এবং তা দিয়ে বস্ত্র তৈরী হয়ে ভারতে আসে। ল্যাঙ্কাসায়ার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যখন ট্রেণ চল্‌ল, তখন চারদিকে অনেক কাপড়ের কল আমাদের নয়নপথে পড়তে লাগল। এই ল্যাঙ্কাসায়ার অঞ্চলটিই এ দেশের মধ্যে জনতায় ও কল কারখানায় সমধিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন।

বিকাল তিনটায় ইংলণ্ড অতিক্রম করে ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলে স্কট্‌লণ্ডের সীমানায় পৌছলাম। স্কট্‌লণ্ড দেশ বহু বহু পাহাড় পর্ব্বতে পূর্ণ। ক্রমে উত্তরাভিমুখে যাওয়ায় অধিকতর শীত বোধ করছিলাম। চারদিকেই ছোট বড় পাহাড়ে ভরা, পাহাড়গুলি প্রায়ই ঘাসে ঢাকা, তার উপর গরু, ভেড়া চরাবার স্থান। নীচের জমিগুলি প্রকাণ্ড খণ্ড খণ্ড পাথরের উঁচু বেড়ায় ঘেরা, তার মধ্যে নানাবিধ শস্যের চাষ, কোনটিতে শূকর, কোনটীতে মুরগীর চাষ। বহু নূতন দৃশ্যের মধ্যে চলতে চলতে পাঁচটায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঘিরে ফেলল।

স্কচ্ পরিবারে কয়েক দিন

রাত্রি ৮টায় ট্রেণ এডিনবরার রমণীয় প্রিন্সেস ষ্ট্রীট ষ্টেসনে পৌছল। দেখলাম, মরিসন সাহেব আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ষ্টেসনে এসেছেন। আমার গাড়ীর দরজায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল—আমার ব্যাগটি তিনি কিছুতেই আমাকে নিতে দিলেন না—নিজে হাতে বহন করে আমাকে

নিয়ে ট্রামে চাপলেন। দু'মাইল ট্রামে চলে আমরা 33. Craiglea Drive ঠিকানায় মরিসন সাহেবের বাড়ীতে পৌছলাম।

বাড়ীর ছেলেরা ভারতীয় নূতন অতিথির দর্শন আশায় উৎসুক হয়েছিল। মরিসন সাহেবের স্ত্রী আমাকে আপ্যায়িত করে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলাম, তাঁদের মস্ত বড় চারতলা পাথরের তৈরী বাড়ী। সকলের উপর তলায় সুন্দর একটি বড় কামরায় আমার থাকবার স্থান হ'ল। রাত্রির আহারান্তে মিসেস্ মরিসন আমাকে নিয়ে আমার ঘরে আবশ্যক দ্রব্যাদি দেখিয়ে দিলেন। ভয়ানক শীত—শয্যা মধ্যে গরম জলের ব্যাগ ব্যবহারের বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই রকম গরম জলের ব্যাগ বিছানার মধ্যে রাখবার সার্থকতা জিজ্ঞাসা করায় মিসেস্ মরিসন হেসে আমাকে বললেন, "এ ব্যবহার না করলে আপনার শরীরের উত্তাপটুকুও ঐ শীতল বিছানায় হরণ করে নিয়ে আপনাকে হিম করে ফেলবে।" মিসেস্ মরিসন আরও আবশ্যক উপদেশাদি দিয়ে রাত্রির জন্য বিদায় নিলেন। বাস্তবিক ঐ গরম ব্যাগ বিছানার মধ্যে রাখবার জন্য দেখা গেল, বিছানা বেশ গরম হ'ল, রাত্রিতে বেশ আরামে নিদ্রা গেলাম।

ডাক্তার রবার্ট মরিসনের পরিবারে বর্ত্তমানে তিনটী ছোট ছেলে মাত্র। বড় ছেলে Maxwell—১৫ বছরের, মধ্যম Jan—৭ বছরের, ছোট Archi—৪ বছরের। এরা সকালে হাত মুখ ধুয়েই আমার সঙ্গে গল্প করতে বসল, Archi পূর্ব্বেই জাহাজে আমাকে জানত। তিন ভাইয়ে মিলে তাদের ঘরের নূতন নূতন দ্রব্যসম্ভার আমাকে দেখিয়ে গৃহমধ্যে বাজার করে তুলল। ঘরের মধ্যে নানা স্থানের দ্রষ্টব্যগুলি একে একে দেখাল। তাদের একটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজবার সময়ে ঘড়ির যন্ত্র মধ্য হ'তে একটা কৃত্রিম কাল কোকিল এসে কুহু কুহু করে যখন ঘড়িতে যতটা বাজে ততটা ডাক দিয়ে

আবার ঘড়ির কলের মধ্যে গিয়ে লুকোয়। সুন্দর ছোট একখানি ঘর আছে, তার ছোট্ট দু'টি দরজা—বৃষ্টি হবার দিনে পাঁচ-সাত ঘণ্টা আগেই একটী ছাতা মাথায় পুরুষ-পুতুল একটী দরজা হ'তে বার হয়ে আসে। যেদিন রোদ হবে, আগে থেকেই সেদিন অপর এক দরজা দিয়ে একটী বেশভূষায় সজ্জিত মেয়েপুতুল বাইরে আসে। এ আর কিছুই নয়, একটী ব্যারোমিটার বা বায়ুমান যন্ত্র—কলের সংযোগে এইমত ক্রিয়াশীল আপনা আপনিই হয়। একটা ছোট কপিকল আছে, হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ছোট ছোট জিনিসপত্র নীচেরতল থেকে চৌতল পর্য্যন্ত যে কোন তলে দরকার মত তোলাপাড়া করে। বালক তিনটী এইমত আমাকে নানা-রকম চিত্তাকর্ষক বিষয় দেখিয়ে সকালটা কাটিয়ে দিল।

মিঃ মরিসন এডিনবরায় এসে ডাক্তারী একটী বিশেষ বিভাগের বিষয় অধ্যয়নার্থ কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলেন, আমার আগমন উপলক্ষে এক সপ্তাহের ছুটী নিয়েছেন। প্রথম দিনেই প্রাতর্ভোজনের পর তিনি আমাকে সহরের এক প্রান্তে একটী রমণীয় পাহাড়ের উপর বেড়াতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে এডিনবরা সহরের সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। এডিনবরা সহরটী এতই সুন্দর যে প্রাচীন ভিনিস্ নগরের সঙ্গে এর উপমা দেওয়া হয়—তাই এদেশটি উত্তর-ভিনিস্ (North Venece) বলে বহুকাল থেকে কথিত হয়ে আসছে।

সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল, সহরের বহুদূরের দৃশ্য আমরা দেখতে পেলাম। প্রিন্সেস ষ্ট্রীট, ইউনিভার্সিটী, ক্যাসেল, আর্টগ্যালারী, স্কট্ মেমোরিয়াল, অবজার্ভেটরী প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান দর্শনীয় বিষয় গুলির সঙ্গে দূর থেকেই কিঞ্চিৎ পরিচিত হলাম। তারপর আমরা পাহাড়ের নানাস্থান ঘুরে Golf খেলা দেখলাম। গল্‌ফ খেলাটি যে স্কটলণ্ডেই সৃষ্টি হয়ে সারা সভ্যদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার ইতিহাস শুনলাম।

পরে আমরা একটী পাহাড়ের উপর একটী জলাশয়ে ঐ দেশীয় নানাপ্রকার মৃণাল, শৈবাল ও ক্ষুদ্র মৎস্য কীটাদি দেখলাম। খরগোসের গর্ত্ত দেখা গেল—ওদেশের পাহাড় গুলিতে বহু খরগোস বাস করে, লোকে বন্দুক দিয়ে শিকার করে, কিন্তু এই পাহাড়ের খরগোস ধরবার নিয়ম নাই, এরা পাহাড়ের শোভা বর্দ্ধন করে।

চল্‌তে চল্‌তে আমরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করছিলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ বিশ্রাম করবার উপায় নাই, পাহাড়ের উপর শীতল বাতাসে ভয়ানক শীত ধরে—পরিশ্রমের সঙ্গে হাঁট্‌লে শীতে কষ্ট দিতে পারে না। পাহাড়ে ভ্রমণে অনভ্যস্ততা বশতঃ আমি পরিশ্রম ও শীতে ক্লান্ত হচ্ছিলাম বটে কিন্তু এতই আনন্দ পাচ্ছিলাম যে, কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হচ্ছিল না।

পরে আমরা পাহাড়ের নীচেয় নেমে জমি চাষ করা দেখলাম। কলের লাঙ্গল ঘোড়ায় টানে,—দেখলাম, জমিগুলি একফুট গভীর হয়ে উপরের মাটী নীচেয় আর নীচের মাটী উপরে ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। ক্রমাগত চার ঘণ্টা ভ্রমণের পর বারটায় আমরা বাড়ীতে ফিরলাম।

বিকালে আমরা সহরের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি দেখলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী পাথরে তৈরী, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। কোনখানে একটু আবর্জ্জনা নাই, লোকে কোন পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা, ফলের খোসা প্রভৃতি রাস্তায় ফেলে না, ছেঁড়া কাগজটুকু পর্য্যন্তও না ; আবর্জ্জনা ফেলবার পাত্রেই ও সব ফেলে। ট্রামে ব্যবহৃত পরিত্যক্ত টিকিটগুলি ট্রাম পরিত্যাগের সময় ট্রামের গায়ে একটী বাক্সে ফেলে যায়, কখনও রাস্তায় ফেলে রাস্তা আবর্জ্জনা করে না। মুখের থুথু, কাসি প্রভৃতি পথে ফেলে না, ড্রেনে ফেলে।

এডিনবরা নানাবিধ জ্ঞানচর্চ্চার স্থান, স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত লোকেই শিক্ষিত। শিল্প বাণিজ্যে কিন্তু স্কট্‌লণ্ডের রাজধানী গ্লাসগো সহরের কাছে এই এডিন্‌বরাকে পরাজয় স্বীকার কর্‌তে হয়েছে।

কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক

কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীর পরিচালিত একটী দোকান দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীতে বিরাট কারবার। গৃহস্থের আবশ্যক সমুদয় দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগে সাজান রয়েছে। এই রকম খাদ্য, পোষাক, পুস্তক, ষ্টেসনারী, গৃহস্থালীর আসবাব, খেলনা, প্রভৃতি প্রায় পঁচিশ ত্রিশ রকম বিভাগ রয়েছে। এক এক বিভাগে স্ত্রী-পুরুষে তিন চারজন করে কর্ম্মচারী কাজ করছে। শুনলাম, সতর হাজার গৃহস্থ এই কো-অপারেটিভের দোকানের মেম্বর। এদের প্রত্যেকের টাকাকড়ি এখানকার ব্যাঙ্ক বিভাগে জমা থাকে, তার দ্বারাই এই কারবারটী চলছে, এঁরা অধিকাংশ দ্রব্য এই দোকান থেকে কেনেন। আবশ্যক দ্রব্য এখানে পেলে আর অপর স্থানে খরিদ করেন না। জিনিষ কিনতে নগদ টাকা দিতে হয় না, হিসাবে খরচ লেখা হয়। অপর সাধারণেও এই দোকানে ন্যায্য দামে জিনিষ কিনতে পারেন, কিন্তু মেম্বরগণ কমিশন পেয়ে থাকেন, সাধারণে তা পান না। এই বিরাট দোকানটীকে প্রত্যেক মেম্বর নিজের দোকান বলে মনে করেন, এর সংস্পৃষ্ট ব্যাঙ্কটিকে নিজের ধনাগার মনে করেন। সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবার এর শাখা কার্য্যালয় ঠিক এই ভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। এই কারবারটিতে কো-অপারেটিভ অর্থাৎ সম্মিলিত শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার দেখে বড়ই আনন্দ পেলাম।

সন্ধ্যায় আমাদের ফিরবার সময় মিঃ মরিসন আমার নিকট জানতে চাইলেন—ফিরবার দুটি পথ আছে, একটী ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আর একটী নিতান্ত গরীবদের বাসভবন পূর্ণ,—এর কোন্ পথে যেতে আমার ইচ্ছা; আমি গরীবদের পথ মনোনীত করায় সেই পথেই ফিরলাম। পথে নানাবিধ

পুরান জিনিষের দোকান, সুট্‌কী মাছ, ঝিনুক, সামুক-গুগ্‌লী প্রভৃতির দোকান দেখলাম। গরীব গৃহস্থদের ঘরগুলিও ছোট বা নোংরা নয়, তবে এক কামরায় একাধিক লোককে কষ্টে বাস কর্‌তে হয় বলে মিঃ মরিসন দুঃখ প্রকাশ করলেন।

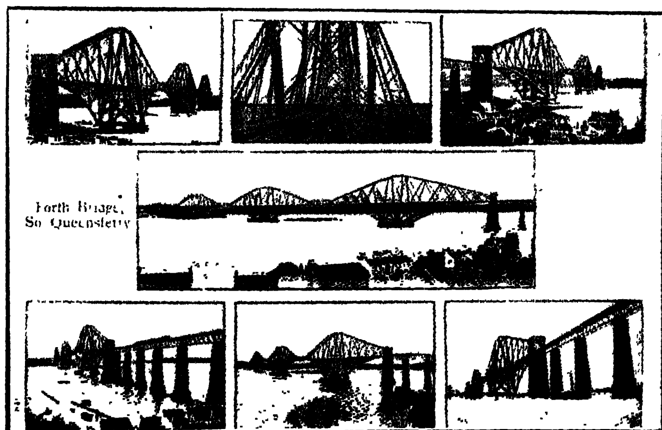
আতিথেয়তা

এইরূপে পর পর তিনটি দিন সকাল বিকাল মিঃ মরিসন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এডিনবরার দর্শনীয় বিষয়গুলি দেখালেন। ক্যাসেলের উপর এবং সার ওয়াল্টার স্কটের স্মৃতি-মন্দিরের অত্যুচ্চ চূড়ার উপর নিয়েও সহরের সৌন্দর্য্য দেখাতে ছাড়লেন না।

ধাতুশিল্প সম্বন্ধীয় কারখানা কিছু দেখবার জন্য মরিসন সাহেবকে বলায় তিনি সহরের এক প্রান্তে একটা পিতলের ঢালাই কারখানায় আমাকে নিয়ে গেলেন। কারখানার অধ্যক্ষ আমাদের সঙ্গে করে সমুদয় আগ্রহের সঙ্গে দেখালেন। আমরা ইলেক্‌ট্রিক সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার ছোট বড় যন্ত্র পিতল গলিয়ে বালির ছাঁচে প্রস্তুত করতে দেখলাম। সেগুলি পরিষ্কার করবার জন্য নানাপ্রকার উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার দেখে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট জানলাম, গ্লাসগো এবং বার্মিংহাম গেলে ধাতুশিল্প সম্বন্ধীয় বহু বহু আবশ্যক বিষয় জান্‌তে পাব। সেগুলির অনেক ঠিকানা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গাইড্‌ বই দেখে এখানে সংগ্রহ করলাম।

আমাকে এই সকল স্থান দেখাবার জন্য ট্রাম ভাড়া প্রভৃতি সমস্তই মিঃ মরিসন নিজে দিতেন, আমাকে দিতে দিতেন না। সন্ধ্যার পর প্রায় দিনই কোন না কোন সভা সমিতিতে নিয়ে যেতেন; রবিবারে এডিনবরা

একেবারে কোলাহলশূন্য, সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, খাবারের দোকানটি পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, সমস্ত লোকেই নিয়মিত গির্জ্জায় যায়। ঐ দিন বাকী সময়টা কেহ ঘরে বসে ধর্ম্মালোচনা করে, কেহ সহরের বাইরে বেড়াতে যায়।



ফোর্থব্রীজের বিভিন্ন দৃশ্য

একদিন আমি সহরের বাইরে সাত মাইল দূরে ফার্থ অব্ ফোর্থএর বিখ্যাত পোল দেখে এলাম। পোলটি প্রায় পৌনে দুই মাইল দীর্ঘ। উপর দিয়ে কয়েকটি রেল লাইন গিয়েছে। পোলটি এতই উচ্চ যে, নীচে দিয়ে যে কোন বড় জাহাজ মাস্তুলাদিসহ অনায়াসে যাতায়াত করে। এটি Firth of Forthএর Queensferry নামক স্থানে অবস্থিত। বিশালায়তন এই পোলটি এবং এর গঠনের গুরুত্ব দেখে আমি চমৎকৃত হ'য়েছিলাম। এডিনবরার নিকটবর্ত্তী লিথ সহর Firth of Forth অর্থাৎ ফোর্থ নদীর মোহনায় অবস্থিত, নদীতীরে বড় বড় ডকগুলিতে জাহাজ পূর্ণ রয়েছে।

একদিন আমি এডিনবরার ভারতীয় ছাত্রাবাসে গিয়ে তাদের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কাটালাম! এঁদের অনেকে লণ্ডনে একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন, সেই উপলক্ষে আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় অতি বিখ্যাত।

আর একদিন মরিসন সাহেবের তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফোর্থ নদীর মোহনায় বেড়াতে গেলাম। আমরা এডিনবরা ও লিথ সহর অতিক্রম করে ক্রমাগত ফোর্থএর তীর দিয়ে ট্রামে বহুদূর গিয়ে সমুদ্র তীরে নামলাম। একটা ছোট জাহাজ মেরামতের ডকের ভিতর গিয়ে তার অনেক কাজকর্ম্ম দেখলাম। ছেলে তিনটি এ জাহাজ ও জাহাজ ছুটোছুটী করে বেড়াতে লাগল। একটী লবণ তৈরীর কারখানা দেখলাম। পরে একটা ছোট দোকানে ছেলেদের নিয়ে কিছু খাবার খেয়ে নির্জ্জন সমুদ্র তটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। বড় বড় তুফান-গুলি তীরে এসে পাথুরে জমিতে গড়িয়ে পড়ছে। উপরে বিস্তীর্ণ বালির চড়া। ছেলেরা ভিজে বালি ও প্রচুর পাথর-টুক্‌রা পেয়ে অল্প সময় মধ্যে সুন্দর সুন্দর খেলনা, ঘর বাড়ী তৈরী করে তাদের বাল্য-শিক্ষার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করল। নির্জ্জন স্থান, আমিও তাদের সঙ্গে বালক সাজতে লজ্জাবোধ করলাম না। বিলাতে ছেলে-বুড়োয় খেলার প্রচলন আছে। সেই সুপ্রশস্ত ভিজে বালির চড়ার উপর আমরা বালি খুঁড়ে মোটা অক্ষরে কত কথা লিখে রাখলাম। ছোট ছেলে আর্চ্চি বড় দুরন্ত, সে জুতা, জামা কাদা-মাখা করে তুলল।

এইরূপ নানা আনন্দ ভোগের পর আমরা ১১টার ট্রামে রওনা হয়ে ১২টায় বাড়ী এলাম।

মিঃ মরিসনের আড়ম্বরশূন্য সংসারটীকে আমি সর্ব্বদা প্রীতি মাখা দেখতাম। তিনটী ছোট ছেলে নিয়ে মিসেস মরিসন সর্ব্বদা সংসারের

কাজে লিপ্ত থাকতেন। খুব সাদাসিদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ সজ্জা, অতি সাধারণ স্বাস্থ্যকর খাদ্য, সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ, কোন অপচয় নাই, অপব্যয় নাই। একটি ঝি এসে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করে চলে যায়। বাজার করা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি যে সকল কাজ আমাদের দেশে চাকর দ্বারা না করালে অসম্মানের বলে গণ্য হয়—মিসেস মরিসন সেগুলি নিজ হাতে করেন। আমি তাঁদের অতিথি ছিলাম, আমার প্রতি তাঁদের সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। গেঞ্জি প্রভৃতি দু'তিন দিন অন্তর কাচা আবশ্যক, মিসেস্ মরিসন আমার সেগুলি নিজে কেচে পরিষ্কার করে দিতেন। আমার জন্য কত নূতন রকম খাবার তৈরী করে খাইয়ে স্কট্‌লণ্ডের অতিথিসেবার নিদর্শন দেখাতেন। স্কট্‌লণ্ডের ওটের তৈরী রুটী ও নানাপ্রকার পিষ্টক অতি উপাদেয় খাদ্য, ওট্ আমাদের দেশের যব বা যইএর মত একপ্রকার শস্য।

ছেলেদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি পিতামাতা সর্ব্বদা যেভাবে দৃষ্টি রাখতেন, সে সকল আমাদের শিখবার বিষয়। ছেলেরা কোন রকম একটু ভুল করলে বা অসভ্যতা করলে, তা মধুর ভাষায় বুঝিয়ে সংশোধন করে দিতে দেখতাম। বিকালে স্কুল হতে এসে ছেলেরা আনন্দের সঙ্গে ছুটোছুটী করে ঘর অস্থির করে তুলত—এতে কিন্তু তাদের পিতামাতা একটুকুও বাধা দিতেন না। একদিন আমি মিসেস্ মরিসনকে বললাম, আমাদের দেশে ছেলেদের একটু অস্থিরপণা দেখলে বাপ মা বড় তিরস্কার করেন, মারধর করেন, আপনারা এদের দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য করেন দেখে আমার বড় আনন্দ হয়। তিনি বললেন, এদের এই রকম ছুটোছুটী করতে না দিলে এরা মারা পড়ে—অর্থাৎ এদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

একদিন দেখলাম, ছোট ছেলেটী মধ্যমটীকে লাঠি দিয়ে ভয়ানক প্রহার করল, মার খেয়ে ছেলেটী চীৎকার করে কাঁদতেই তাদের মা উপর থেকে এসে বিচারের জন্য দু'জনকেই উপরে নিয়ে গেলেন। পরে এক সময়

আমি মিসেস্ মরিসনকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিচারে আর্চির কি শাস্তি দিলেন? তিনি হেসে বললেন, আর্চিকে বললাম—শনিবারে তোমাকে যে পেনিটি দেওয়া হয়, পুনরায় এমন অন্যায় করলে আর তা দেওয়া হবে না। কি সুন্দর শাস্তির ব্যবস্থা! শুধু এইটুকু শাস্তির লজ্জা পেয়েই ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

তিনটী ছেলেকে আমি কিছু উপহার (Present) দেবার জন্য একদিন মিসেস মরিসনের কাছে অনুমতি চাইতেই তিনি বললেন, এমন সামান্য কিছু দিবেন, যেন তারা কোন দামী জিনিষের প্রলোভনে না পড়ে; আর সচরাচর যেন তেমন জিনিষ দিতে আমাদের সাধ্য হয়। এই রকম ছেলেদের বিলাস-বর্জ্জন শিক্ষা দিবার জন্যও বাপ মায়ের কত সতর্কতা।

এই পরিবারে আমি নিত্য নূতন আনন্দ ভোগ করতাম। অতিথির আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য এঁদের নানারূপ ব্যবস্থা দেখেছি। আমি স্কটলণ্ডের আতিথেয়তার কথা কখনও ভুলতে পারব্ না।

দুই সপ্তাহকাল এখানে এইরূপ আনন্দে কাটিয়ে আমি গ্লাসগো রওনা হলাম। মিঃ মরিসন আমাকে ষ্টেসনে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

গ্লাসগো সহর

এডিনবরা থেকে সকালে ৮টার এক্সপ্রেস ট্রেণে আমি গ্লাসগো রওনা হ'লাম। শুনলাম, এডিনবরায় যেমন পরিষ্কার শুক্‌নো হাওয়ায় কাটিয়ে গেলাম, গ্লাসগোতে তেমন হবে না—সেখানে অনবরত ঝিম্‌ঝিমে বৃষ্টিতে খুব বিরক্তি বোধ করতে হবে। শুনে খুবই আশ্চর্য্য বোধ হল যে, মাত্র তিন ঘণ্টা রেল পথের পারেই এত পরিবর্ত্তন!

ট্রেণ চলবার খানিকটা পরে এডিনবরা সহরের সীমা অতিক্রম করেই

দু'ধারে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণীর মাঝ দিয়ে ট্রেণ চলল। তারপর ক্রমে কুয়াসা দেখা দিল। গাড়ীর দু'ধারই খুব বড় বড় পুরু কাঁচের আবরণে ঢাকা, সেই কাঁচের বেড়ার ভিতর দিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে কাঁচের স্বচ্ছতা নষ্ট ক'রে একেবারে ঘোলা করে দিল ; বাইরের দিকে কিন্তু বেশী কুয়াসা লেগে জল হয়ে ঝরছিল। আমি মাঝে মাঝে কাঁচের খানিকটা জায়গা রুমালে মুছে স্বচ্ছ করে নিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। কুয়াসায় বেশী কিছু দেখা গেল না, তবু নিকটের পাহাড়গুলির বিভিন্ন দৃশ্য দেখে খুবই নূতনত্ব উপভোগ করছিলাম।

মাত্র তিন চারটা ষ্টেসনে ধ'রে, বেলা ১১টায় ট্রেণ গ্লাসগো সহরের মাঝখানে সেণ্ট্রাল ষ্টেসন নামক বিরাট ষ্টেসনটিতে পৌছল। ষ্টেসনের বাইরে গিয়ে দেখি—ঝিম্ ঝিমে বৃষ্টি ; তার মধ্যেই রাস্তায় জনতার অবিরাম গতি। ট্রাম ও বাসের বিচ্ছেদ শূন্য পর পর গতির মধ্যে রাস্তা পার হওয়াই দুষ্কর। সহরের আয়তন কিরূপ, কোন দিকে কি দেখবার আছে, সহরের কোনখানে এসে পড়েছি, কোথায় গিয়ে বাসা নেব কিছুই ঠিক নাই। তারপর এক নূতন বুদ্ধি ক'রলাম, বুকষ্টলে গিয়ে গ্লাসগো সহরের একখানা মানচিত্র কিনলাম। মানচিত্রে দেখলাম, এই সেণ্ট্রাল ষ্টেসনটি সহরের কেন্দ্রস্থানেই বটে। পথ-ঘাট বোঝবার আর ভাবনা রইল না। একটি পুলিসের কাছে সন্ধান নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেল ওয়ালা নিজের হোটেলে স্থানাভাবের জন্য আমাকে পৃথক একটি হোটেলের ঠিকানা ছাপান একখানি কার্ড দিয়ে সেখানে যেতে পরামর্শ দিল। কার্ডের লিখিত হোটেলে গিয়ে উঠলাম ; দেখলাম, মাত্র ৫।৭ জন লোক ভদ্রভাবে থাকবার যোগ্য ছোট হোটেলটি। হোটেলের কর্ত্রী একটি বৃদ্ধা, নাম মিস্ ম্যাকলয়েড্। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করে একটি পরিচারিকা মেয়েকে আমার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন।

রাজধানী এবং উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধীয় স্থান হিসাবে স্কট্‌লণ্ডে এডিনবরা সহরের খুব খ্যাতি থাকলেও এই গ্লাসগো সহরটি স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন সহর। শিল্পে, বাণিজ্যে, বিশেষতঃ জাহাজ নির্ম্মাণের বহু বহু ডকের জন্য গ্লাসগো খুবই বিখ্যাত। আমি এক সপ্তাহ কাল এখানে থেকে এই সকল বিষয় দেখার মনন করে প্রথম দিনই গ্লাসগোর বিখ্যাত আর্ট গ্যালারীটি দেখলাম। সহরের ঘন সন্নিবদ্ধ স্থানের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর সুরম্য বৃহদায়তন অট্টালিকায় এই আর্ট গ্যালারী। এটি শুধু আর্ট গ্যালারী নয়—মিউজিয়ামও বটে। জগতের অভিনব দৃশ্যাবলী দেখবার পক্ষে এত বড় সংগ্রহ লণ্ডনের কোন মিউজিয়ামেও দেখি নাই। গ্রীস ও ইতালীর বিখ্যাত ভাস্কর-শিল্প এবং বিখ্যাত চিত্র-শিল্পগুলির অবিকল অনুকরণ করে এই স্থানে রক্ষিত হয়েছে। আমাদের বাংলা-দেশের কৃষ্ণনগরের প্রস্তুত বাংলার বহু দৃশ্যাবলী একস্থানে সজ্জিত দেখে বড়ই আনন্দ পেলাম। বাংলার বহু প্রকারের মৎসের মডেলগুলি সেখানে খুবই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হয়ে রয়েছে। জাহাজ প্রস্তুতের সমুদয় ব্যাপার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার মডেল ও ফটোর ছবিদ্বারা সুন্দররূপে বোঝান হয়েছে।

পর দিবসে লোহার ও ইস্পাতের পাত, করোগেট চাদর প্রস্তুতের একটি কারখানা দেখতে গেলাম। সহরের উত্তর প্রান্তে খুব বড় কয়েকটি কারখানা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টীতে গিয়ে কারখানার কাজকর্ম্ম দেখবার জন্যে ম্যানেজার সাহেবকে জানালাম। তিনি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন,—আপনারা ভারতীয় লোক, আমাদের কাজকর্ম্ম দেখে শিখে যাবেন এতে আপনাদের লাভ, আমাদের ক্ষতি; আপনিই বুঝুন, আমরা কেমন করে এ সব আপনাদের দেখাতে পারি? আমি বললাম, এই যে আপনাদের দেশে বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিসনটি হয়েছে—পৃথিবীর বহু

দেশের শিল্প কৌশল সেখানে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন, ঐ ব্যবস্থাটাকে—তবে আমরা কি বলব যে, আপনারা অন্যায় কার্য্য করছেন ?—বলেই আমি বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের আমার ষ্টাফ্ পাশখানা দেখালাম এবং বললাম, আমি সেখানকার কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধীয় একজন এবং সেখানে আমার একটি ষ্টলও ছিল। তখন ম্যানেজার সাহেব আমার প্রতি একটু বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব দেখালেন এবং একজন সুদক্ষ শিল্পীকে ডাকিয়ে এনে তাকে আমার সঙ্গে দিয়ে সমগ্র কারখানাটির কার্য্যপ্রণালী দেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথমে লোহা ও ইস্পাত আগুনে গালান ও ঢালাই দেখলাম। তারপর রোলিং মেসিনের মধ্যে পিষিয়ে পাত প্রস্তুত; তার প্রত্যেক কার্য্যই এক একটি বিরাট ব্যাপার। প্রায় দুইঘণ্টা সময় মধ্যে সমস্ত কারখানাটির কাজকর্ম্ম দেখা শেষ করে বাসায় ফিরলাম। তার পর দিন গ্লাসগোর ডক সমূহ এবং খুব বড় দুইটি জাহাজ প্রস্তুতের কারখানার কাজ দেখলাম। এক একটি কারখানায় চার পাঁচ হাজার লোকে কাজ করে এবং একখানি জাহাজ তৈরী আরম্ভ ক'রে প্রায় ছয় মাস মধ্যে শেষ করে। এক একটি কারখানা বাড়ীর লোকজন এবং দ্রব্যসামগ্রী দেখে এক একটি ছোট খাটো পৃথক সহর বলে মনে হয়।

হোটেল ওয়ালী

আমার থাকবার হোটেলটিতে কোন অসুবিধাই ছিল না, তবে কেবলমাত্র ঘরের ভাড়া আর সকালের জল খাবারের জন্যই গৃহকর্ত্রীকে দৈনিক সাত শিলিং প্রায় (পাঁচ টাকা) দিতে হত। কিন্তু আমি অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় স্থান পাবার জন্য অন্য হোটেলে যাওয়া মনস্থ করে হোটেলের কর্ত্রী মিস্ ম্যাক্‌লয়েডকে জানালাম যে, আমি কালই চলে যেতে চাই। তিনি

বললেন, কেন, মিষ্টার নন্দী, আপনি ত গ্লাসগোতে আরও বেশী দিন থাকবেন বলেছিলেন ? আমি বললাম, ঘর ভাড়া এত বেশী দিয়ে উঠতে পারছি না। তিনি আমাকে বললেন—আপনার কাছ থেকে আমি ঘরভাড়া চাই না, আপনি যে কয়দিন থাকবেন অমনিই থাকুন। আমি বললাম, যাতে আপনার ক্ষতি না হয় এমন কিছু সামান্য নিলেই আমি খুসী হই। তারপর তিনি বললেন, আমায় আপনার জন্য দৈনিক তিন শিলিং মাত্র খরচ হয় আপনি তবে তাই দিবেন। আমি সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করলাম।

মিস্ ম্যাক্লয়েড একজন ধর্ম্মপ্রাণ বিদূষী মহিলা। খৃষ্টান সমাজে শনিবার-বাদী (সেভেন্থ ডে য়্যাড্ভান্টিষ্টস) বলে এক সম্প্রদায় আছে, ইনি সেই সম্প্রদায়ের লোক।

তিনি মাঝে মাঝে আমাকে খৃষ্টীয় বিশ্রাম-বার হিসাবে রবিবারের পরিবর্ত্তে শনিবার পালনের মাহাত্ম্য বোঝাতে বিশেষ চেষ্টা করতেন। তাঁর রবিবার শনিবারের পার্থক্যকে আমি মনে স্থান দিতাম না বটে, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মালোচনার প্রতি ঐকান্তিকতা দেখে তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে তাঁদের ধর্ম্মসভায় নিয়ে যেতেন, দেখতাম, তিনি ঐ সম্প্রদায়ের একজন বিশেষ লোক। একদিন একজন চিন্তাশীল রেভারেণ্ডকে (পাদ্রী) নিমন্ত্রণ করে এনে আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার বন্দোবস্ত করলেন। সেদিন আমরা দু'জনই নিমন্ত্রিত অতিথি হয়েছিলাম। রেভারেণ্ড মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয়ে তাঁর গভীর ধর্ম্মসাধনার পরিচয় পেলাম বটে, কিন্তু উপসংহারে সেই শনিবার—শনিবার। যা'হোক স্কট্ল্যাণ্ডের একটা ক্ষুদ্র হোটেলে বাসের মধ্য দিয়ে এই সমালোচনা উপভোগ ভালই লেগেছিল। একটা হোটেলওয়ালীর মধ্যে এতখানি উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে আমি দেশবাসীকে অন্তরে

ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। নারী-হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব যে মাতৃত্ব, সেটী মিস্ ম্যাক্‌লয়েডের মধ্যে বিশেষভাবে অনুভব করতাম।

হোটেলের পরিচারিকাটিও উৎকৃষ্ট কর্ত্রীর সংসর্গে থেকে হোটেলে বাসকারীদের ভগিনী স্থানীয়া বলে গণ্য হবার অধিকার লাভ করেছে। আমার সুবিধা অসুবিধাগুলির উপর তার এমনই দৃষ্টি দেখেছি যে—তা যেন হোটেলের নিয়মানুযায়ী লোক-সেবার উপরও বেশী কিছু। তার মধ্যে যেন ভক্তি ভালবাসা প্রীতি ফুটে উঠতো।

গ্লাসগোর বিবরণ

গ্লাসগোতে আমি সাত দিন মাত্র ছিলাম। এই সময় মধ্যে তথাকার প্রধান প্রধান দর্শনযোগ্য বিষয়গুলি দেখলাম। ক্লাইড্ নদীর উভয় তীরে গ্লাসগো সহর। নদীতে কোনখানে পোল, কোনখানে সুড়ঙ্গ, কোনখানে ফেরী জাহাজে পারাপারের ব্যবস্থা। এই সকল পথেই লোকজন, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি অনায়াসে যাতায়াত করে। ফেরী জাহাজে গাড়ী ঘোড়া পারাপারের কোন অসুবিধাই নাই। সহরের একপ্রান্তে একটি পর্ব্বতাকার উচ্চভূমিকে গ্লাসগো সহরের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। তার উপর দিয়ে রাস্তা পথ প্রভৃতির পত্তন আরম্ভ হয়েছে দেখলাম। সেই পাহাড়ে' জমির উপর এমন প্রবল বাতাস যে দু'বার আমাকে আমার মাথার টুপির পিছু পিছু দৌড়াতে হয়েছিল। যেমন বাতাস তেমনি আবার কন্‌কনে শীত। গ্লাসগো সহর খুবই অসমতল পাহাড়ে' জমির উপর স্থাপিত। একটি আশ্চর্য্য ক্যানেল বা খাল দেখা গেল, কোনখানে জমির গভীর নীচে দিয়ে, কোনখানে সমতল ক্ষেত্র দিয়ে, কোনখানে ঘর বাড়ীর নীচে দিয়ে, কোন্‌খানে ঘরবাড়ীর উপর দিয়ে গিয়েছে। এই

খালের ভিতর দিয়ে কয়লা, বালী, কাঠ, ইট, পাথর প্রভৃতি জিনিষ বোঝাই করা সরু গঠনের এক প্রকার নৌকা যাতায়াত করে। ভারতীয় কতকগুলি রেশমী কাপড়ের ফেরীওয়ালা গ্লাসগোর একটী বাড়ীতে অবস্থান করে, ইহারা ভারতের গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশের লোক। আমি একদিন তাদের কাজকর্ম্ম দেখতে তাদের বাসায় গিয়েছিলাম। এরা ইংরেজী ভাষায় কোন প্রকারে কথা ব্যক্ত করে বটে কিন্তু বিশেষ লেখা পড়া জানে না। দেখলাম, তারা ভারতীয় জিনিষ বলে নকল জার্ম্মাণী রেশমের কাপড়ের ফেরী করে; ঐ সকল জিনিষ তারা জার্ম্মাণী থেকে নিজেরাই আনে। একই স্কট্‌লণ্ডের মধ্যে গ্লাসগো এবং এডিনবরা সহর দুইটির কে ছোট কে বড় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু দ্বন্দ্ব আছে। এডিনবরা বলেন, তিনি জ্ঞানে বড়, গ্লাসগো বলেন, তিনি ঐশ্বর্য্য ও শক্তিতে বড়—লক্ষ্মী সরস্বতীর এই বিবাদ সারা জগতেই আছে। ইংলণ্ডের চেয়ে স্কট্‌লণ্ডের লোকগুলি বেশী বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। গ্লাসগোতে তিনটি থিয়েটার হলের অভিনয় দেখলাম। মেয়েদের নাচ অতি আশ্চর্য্য। অধিকাংশ অভিনয়ের মধ্যেই নারী ও পুরুষের শারীরিক বলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। অধিকাংশ অভিনয়েই সার্কাস ধরণের, ব্যায়ামের কৌশল এবং ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা সম্বন্ধীয় কৌশল দ্বারা দশকগণকে চমৎকৃত করা হয়।

৫ই ডিসেম্বর সকালে একটি ঢালাই পিতলের কারখানা দেখতে গেলাম। দেখলাম, সেখানে Wireless (বেতার-বার্ত্তা যন্ত্র) সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হচ্ছে। সেখানকার ম্যানেজার সমস্ত কাজকর্ম্ম যত্নের সহিত আমাকে দেখালেন। তাঁর কাছে জানলাম যে, বার্ম্মিংহামে গেলে এ সম্বন্ধে আরও বেশী রকম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত দেখতে পাব। গ্লাসগো সহরে লোহা এবং ষ্টিলের কাজই বেশী। আমি ষ্টিলের পাত তৈরী দেখবার জন্য কয়েকটি বড় বড় ফ্যাক্টরীর ঠিকানা এখানকার ম্যানেজারের নিকট হতে

নিলাম। ফিরবার পথে একটা Canal বা খাল দেখলাম। এটিকে একেবারে বরাবর সহরের উপর দিয়ে নেওয়া হয়েছে। সহরের বাড়ী, ঘর, রেল, ট্রাম প্রভৃতি সবই এই খালের নীচেয় পড়ে রয়েছে। গ্লাসগো খুব পাহাড়ে' উঁচু-নীচু স্থানময় সহর। এ জন্য খালটিকে সমতল জমির অভাবে একেবারে সহরের উপর দিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৬ই ডিসেম্বর সারাদিন সহর দেখলাম। গ্লাসগো সহরের মাঝখান দিয়ে ক্লাইড্ (Clyde) নদী গিয়েছে। দু'ধারে সহরের জমকালো শোভা; যতদূর যাই ক্রমেই দেখবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। নদীর উপর দিয়ে অনেক-গুলি পোল গিয়েছে; কিন্তু সমুদ্র থেকে সহরের যে পর্য্যন্ত জাহাজ এসে থাকে, সে পর্য্যন্ত নদীর উপর কোন পোল করা হয় নাই। নদীর এপার ওপার দিয়ে কয়েকটা সুড়ঙ্গ করা হয়েছে। লোকজন, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী সমস্তই Lift কলে করে নীচের সুড়ঙ্গপথে নামান হয়। সেখান থেকে নদীর নীচে দিয়ে পার হয়ে অপর পারে গিয়ে Liftএর সাহায্যে উপরে উঠে। খানিকদূরে একটা খেয়াঘাট দেখলাম, সেখানে জাহাজের উপর করে লোকজন, গাড়ীঘোড়া পারাপার হচ্ছে। এর সমস্ত কাজই ইঞ্জিনের সাহায্যে হয়। লণ্ডনের মত গ্লাসগো সহরেও Underground Railway অর্থাৎ মাটীর নীচে চোঙ্গের ভিতরের রাস্তা দিয়ে ট্রেণে লোকজন সহরের নানাস্থানে যাতায়াত করে।

৭ই ডিসেম্বর—আজ রবিবার। স্কট্‌লণ্ডের লোকজন রবিবারে সংসারের কাজ মোটেই করে না। দু'বেলা গির্জ্জায় যায়, কেউ বা সহরের বাইরে ভ্রমণে বের হয়। আমি সারাদিন একটা লাইব্রেরীতে বসে গ্লাসগো সম্বন্ধে আমার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পড়লাম। সন্ধ্যার পর হোটেলের কর্ত্রী Miss Macleodএর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একটা গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনাদি দেখলাম। এর পর আরও তিনদিন পর্য্যন্ত গ্লাসগো সহরের নানা দ্রষ্টব্য বিষয় দেখলাম।

গ্লাসগোতে জানলাম—তাঁত, চরকা প্রভৃতি গৃহশিল্প দেখতে হলে আয়র্লণ্ডের পল্লীগ্রাম দেখা দরকার। তাই আমি আয়র্লণ্ডের শিল্পপ্রধান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বেলফাষ্ট যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। যাবার সময় মিস ম্যাক্‌লয়েড্ আমাকে বেলফাষ্টে থাকবার জন্য তার এক মহিলা বন্ধুকে অনুরোধ করে পত্র দিয়ে জানালেন, যেন আমার জন্য তিনি স্থানের ব্যবস্থা এবং আবশ্যক সাহায্যাদি করেন। বিদায় নেবার সময় মিস্ ম্যাক্‌লয়েডের মুখে যে ব্যাকুলতা দেখলাম, কি ভাবে আমাকে বিদেশে সাবধানে চলতে হবে, সে সম্বন্ধে যে ভাবে পরামর্শাদি দিলেন, তার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের মাতৃত্ব ফুটে উঠেছিল। গ্লাসগোর প্রসঙ্গে একটা হোটেল ওয়ালীকে আমি এত উচ্চ স্থান দিলাম, আশা করি আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ এর কোন কৈফিয়ৎ নেবেন না।

১০ই ডিসেম্বর রাত্রি ৮টায় আমি গ্লাসগো থেকে জাহাজে বেলফাষ্টে রওনা হ'লাম। Miss Macleodএর মধুর স্নেহের স্মৃতি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত রইল।

রাত্রি ৯টায় বেলফাষ্টের জন্য জাহাজ ছাড়ল। অপ্রশস্ত Clyde নদীর মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে জাহাজ চলল। তীরে দু'ধারে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রখর জ্যোতিতে সহরের দৃশ্য অতি মনোরম দেখাচ্ছিল। Clyde নদীর মোহানা পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাইল পথ নদীর দু'ধারে কেবল জাহাজ প্রস্তুতের কারখানায় পূর্ণ। বাইরে খুবই ঠাণ্ডা, তথাপি নদীর মোহানা পর্য্যন্ত আমি বাইরে থেকে জাহাজ প্রস্তুতের কারখানাগুলি দেখলাম; পরে ভিতরে গিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপাদি আরম্ভ করলাম। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হলেও জাহাজে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি। একটি বর্ষীয়সী মেয়ে নানারকম আমোদজনক গল্প করে আমাদের যাত্রীমহল বেশ আনন্দময় রাখছিল। বিছানায় শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে রাত্রি ১টার পর ঘুমিয়ে পড়লাম।

সপ্তম অধ্যায়

[আয়র্লণ্ড]

বেলফাষ্ট

১১ই ডিসেম্বর ভোর ৭টায় আয়র্লণ্ডের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী বেলফাষ্ট সহরে এসে জাহাজ ভিড়ল। চারদিক একেবারে কুয়াসায় ঢাকা ছিল; ৮টায় ফশা হল। আমি জাহাজ থেকে নেমে ট্রামে করে Miss Macleodএর বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হ'লাম।

বেলফাষ্ট অঞ্চলটা আয়র্লণ্ডের গৃহশিল্পের দেশ। বিশেষতঃ সূতা প্রস্তুত ও তাঁতের কাপড় বোনার জন্য এ দেশের বিশেষ খ্যাতি আছে। সকালে পৌছেই এ সম্বন্ধে কিছু খবর নিলাম। জানলাম, সহরে কলের কাজই বেশী, পল্লীতে মেয়েরা অনেক রকম হাতের কাজ করে।

এ দিন প্রথমে আমি এখানকার শণের তৈরী তোয়ালে প্রভৃতি বোনার মিল্ দেখতে গেলাম। এই সম্বন্ধীয় কাজে এটাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় মিল। সহজেই কারখানার মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পেলাম। এখানকার আপিসের ভিজিট-বুকে জাপান, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড প্রভৃতি জগতের সর্ব্বস্থানের ভিজিটরদের স্বাক্ষর রয়েছে দেখলাম। একটি ভারতীয় নামও দেখা গেল, কিন্তু কোন বাঙ্গালীর নাম নাই। ম্যানেজার একটি লোককে আমার সঙ্গে দিলেন। এখানে

বাঙ্গালী ভিজিটর বোধ হয় আমিই প্রথম। ভিতরে গিয়ে দেখলাম, বহু স্ত্রী-পুরুষ কলে কাজ করছে। শণ জিনিষটা তূলা ও পাটের মাঝামাঝি রকমের খুব শক্ত জিনিস। উহা আমাদের দেশে জেলেদের জাল প্রস্তুতে খুব ব্যবহৃত হয়।

এখানে কার্য্যকারীদের মধ্যে মেয়েরা সপ্তাহে ১৫৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা এবং পুরুষেরা সপ্তাহে ২০৲ টাকা থেকে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পায়। প্রত্যেক লোকেরই পোষাক বেশ পরিচ্ছন্ন। আমাদের দেশে কলের কাজের লোকের দুর্দ্দশা অতি ভয়ানক; কিন্তু এখানে এদের অবস্থা দেখে সাধারণ লোকের চেয়ে বিশেষ নিম্নশ্রেণীর মনে করতে পারা যায় না। বস্তুতঃ এদেশে কাজের ছোট-বড়র মান-অপমান বিশেষ নাই; সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে খুবই দ্রুত গতিতে কাজ করছে। পরিশ্রমের কাজ আর অপরিষ্কার জিনিস পরিষ্কার করার কাজ পুরুষেরা করে; মেয়েরা সহজ পরিশ্রমে নৈপুণ্যের কাজগুলি করে। পনর বৎসরের কম বয়সের লোক এদেশে কাজ করে না। মেয়ে হোক্, পুরুষ হোক্ পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর বয়স অর্থাৎ পনর বছরে পা দেওয়া পর্য্যন্ত দেশের নিয়মানুসারে সকলকেই স্কুলে পড়তে হয়; এর পর আপন আপন কাজে যোগ দেয়। এই সমস্ত কারখানার কাজকর্ম্ম অতি সহজ; এ জন্য বহুসংখ্যক দরিদ্র ছাত্রছাত্রী স্কুল ছাড়বার পরই এই সব কারখানায় যোগ দেয়। সুদক্ষ মেয়েরা এখানে Embroidery অর্থাৎ কাপড়ের উপর সূতা দিয়ে লতা-ফুল কাটা প্রভৃতি কাজ করেন। এঁদের বেতন সপ্তাহে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা।

স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির মহিলা বিভাগ

১২ই ডিসেম্বর সকালে আমি এখানকার Salvation Armyর মহিলা বিভাগের শিল্পাশ্রম দেখতে মনস্থ করে সহরস্থ এদের আপিসে আবেদন জানালাম। এই আপিসটি হতে মহিলাদের আশ্রম দুই মাইল দূরে। আপিসের ম্যানেজার আমাকে একখানি Introduction letter দিলেন এবং মহিলা বিভাগের তত্ত্বাবধায়িকাকে টেলিফোন করে জানালেন যে, কলকাতার মাতৃমন্দির নামক মেয়েদের মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক আমাদের মহিলা বিভাগ পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন। ট্রাম গাড়ীতে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছলাম, সেখানকার মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমাকে যে ভাবে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করলেন, আমি অতটা আশা করেছিলাম না। একটু বিশ্রাম ও আলাপাদির পর তিনি নিজে একে একে প্রত্যেক ঘরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে কোন্ ঘরে কি কি কাজ হয় তা' সব দেখালেন। অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি, শীতের দেশ তাই প্রত্যেক ঘরেই গরম ষ্টীমের চোঙ্গ ফিট্ করা।

প্রথমেই আমি সন্তান-পালন শিক্ষার ঘর দেখতে গেলাম। বিলাতে সন্তান প্রসব বেশীরভাগই হাঁসপাতালে বা এই শ্রেণীর আশ্রমে হয়ে থাকে। দেখলাম, সদ্যপ্রসূত থেকে এক বছরের পর্য্যন্ত অনুমান ত্রিশটি সন্তান পৃথক পৃথক পালঙ্কে রয়েছে—প্রসূতি কেহই এ ঘরে নাই। দু'টিমাত্র স্ত্রীলোক এই সন্তানগুলির তত্ত্বাবধান করছে। সবগুলি শিশুই সুস্থকায়—বেশ আনন্দে হাত পা নেড়ে খেলা করছে। এদের মায়েরা পৃথক স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

তারপর মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমাকে আশ্রমের রন্ধনশালায় নিয়ে সেখানকার রন্ধনপ্রণালীর বিশেষত্ব দেখালেন। এই রন্ধন-শালাটী

কেবলমাত্র আহারের ব্যবস্থার জন্য নয়, এখানে রন্ধন বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও অনেক প্রকার আছে জানলাম। বিলাতের রন্ধন কার্য্য গ্যাস-ষ্টোভে সম্পন্ন হয়, এজন্য রান্নায় পরিমাণ মত উত্তাপ ব্যবহারের চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। রন্ধনশালার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে আমি তাঁদের প্রশংসা করতে লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বললেন—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সম্পন্ন করাই রন্ধন কার্য্যের প্রধান গুণ। এ সব এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতের রন্ধনকার্য্যে বাট্না বাটার বালাই নাই; ঝাল, হলুদ, মসলা এসব কিছুই ওদেশে রন্ধনে ব্যবহার হয় না। হাত দিয়ে কোন জিনিষ ধরবার আবশ্যক হয় না—বিভিন্ন রকমের হাতা, চামচ প্রভৃতির সাহায্যে সব কাজ হয়; এজন্য রন্ধন কালে হাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

কাপড় ধোয়ার ঘরে গিয়ে দেখলাম, দু'টী মেয়ে কাপড় ধোলাই করছে। এই আশ্রমের ছোট বড় সব কাজই আশ্রমের মেয়েরা করে। কাপড় ধোলাই শিক্ষা করা বিলাতের মেয়েদের খুব বড় একটা শিক্ষার বিষয়। এই বিদ্যা মেয়েদের শেখবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা আছে। সাধারণ বা গরীব গৃহস্থেরা যে প্রণালীতে আপন আপন ঘরে কাপড় ধোয়, সেইমত ব্যবস্থাই এখানে রয়েছে। একটী পাত্রে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সাবানযুক্ত গরম জলে কাপড় ভিজিয়ে রেখে, পরে একটী হ্যাণ্ডেল ঘুরালে সেই জল ও কাপড় পূর্ণ পাত্রটী এমন ভাবে ঘুরতে থাকে, যাতে পাত্রের ভিতরের কাপড়গুলি জলের সঙ্গে ওলট পালট হতে থাকে। পাঁচ সাত মিনিট এইমত ঘুরালেই কাপড়ের ময়লা ছেড়ে যায়, পরে অন্য পরিষ্কার জলপূর্ণ পাত্রে তুলে ধুয়ে লয়। কাপড়ের জল নিংড়াবার জন্য কাঠের রোলার আছে, তার মধ্যে কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়ে হাতল ঘুরালে আপনা আপনিই সমস্ত কাপড় ঐ রোলারের মধ্য দিয়ে পিষে গিয়ে সমস্ত জল নিংড়িয়ে ফেলে। বিলাতে প্রায় সর্ব্বদাই

ঝিমি ঝিমি বর্ষা হয়, রোদ ক্বচিৎ দেখা যায়, কাপড় শুকাবার বড় অসুবিধা হলেও অসুবিধা বলতে কোন কিছু এরা রাখে নাই—কাপড় শুক্‌না করবার জন্য একটী খুব ছোট গরম ঘর আছে। লোহার নলের ভিতর দিয়ে গরম ষ্টীম প্রবাহিত হয়ে ঐ ছোট ঘরখানি খুব গরম রাখে ; ঐ ঘরের মধ্যে কাপড়গুলি রেখে আধ ঘণ্টা কাল দরজা বন্ধ রাখলেই কাপড় শুকিয়ে যায়। তারপর খুব ছোট সুন্দর ইস্তিরী দিয়ে সমস্ত কাপড় ইস্তিরী করা হয়। রঙ্গিন কাপড় অপেক্ষা সাদা কাপড় ধোলাই শক্ত কাজ। নানা রকম লেস্‌ যুক্ত কাপড় ইস্তিরী করা খুবই কঠিন। এসব এই আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়। মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ কয়েকখানা লেস্‌ ও লতা ফুলওয়ালা কাপড় ইস্তিরী করে দেখাতে আদেশ করায় মেয়েরা সে সব সুন্দর ভাবে করে দেখাল।

তারপর আমরা একটী প্রকাণ্ড হলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এইটি আশ্রমের শিল্পশিক্ষার ঘর। ৬০।৭০টী মেয়ে নিপুণ হয়ে নানা রকম সেলাইয়ের কাজ করছে। আমরা ঘরে প্রবেশ করবামাত্র মেয়েরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল।

সম্ভবতঃ এরা আমাকে কাজ দেখাবার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল। দেখলাম,.নানা রকম উলের জামা, ষ্টকিং বোনা হচ্ছে, অতি সুন্দর Embroidery কাজ হচ্ছে। এই ধরণের উলের কাজ ও এম্ব্রয়ডারী আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েদের কিছু কিছু করতে দেখেছি। কিন্তু আমাদের দেশে এগুলি বিশেষ কোন কাজে লাগে না। এদের কাজ দেখে বুঝলাম, বিলাতের আবশ্যক যে সব জিনিষ এরা করছে—তারই একটা অন্ধ অনুকরণ আমাদের দেশেব শিক্ষিতা মেয়েরা মেম শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকে পেয়েছে। এই সব অনুকরণ দেখে আমার মনে হয়, ইউনিভার্সিটীর বিদ্যাই হোক আর যে কোন বিদ্যাই হোক, আমরা যা ইংরেজদের

কাছ থেকে শিখি, সে সব আমাদের দেশের কাজে খুব কমই লাগে; আমরা তাদের অনুকরণ করি মাত্র। সেই শিক্ষার একটু অদল বদল করে আমাদের দেশের কাজের উপযোগী করে নেবার শক্তিটুকু আমাদের থাকা চাই—এটা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই ভাব্‌বার কথা।

এখানে মেয়েদের নানা রকম সূতার কাজ করতে দেখলাম, তার কোন্‌টা কি কাজে লাগে, সব জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম। মহিলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমাকে ছোট ছোট কয়েকটী চিত্রের নমুনা উপহার দিলেন। এখানকার মেয়েদের কার্য্যপ্রণালী দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হলাম। এই মহিলা-আশ্রমের ছোট বড় সব কাজ আশ্রমের মেয়েরাই করে। আমাদের দেশে কাজের ছোট-বড়, সম্মানজনক, অসম্মানজনক ইত্যাদি অনেক পার্থক্য আছে। এসব দেশে ও বালাই নাই; সব কাজই সকলে করে।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মহিলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আমাকে সমস্ত কাজের ঘরগুলিতে নিয়ে প্রত্যেক ঘরের কার্য্যপ্রণালী বিশেষভাবে দেখালেন। এই দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই আমি তাঁর কার্য্যকুশলতা দেখে মনে মনে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম। পরে যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর নিকট বিদায় নিলাম।

১৩ই ডিসেম্বর সকালে কয়েকটী দোকানে গিয়ে পল্লীর মেয়েদের হাতের তৈরী অনেক রকম বস্ত্র-শিল্প দেখলাম।

আইরিশ বালকদের সঙ্গে

বিকাল তিনটায় নদীর তীর ধরে ট্রামে সমুদ্রের দিকে চললাম। সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে ট্রামের শেষ সীমানায় নেমে পল্লীগ্রাম দেখতে গেলাম। নদীর মোহনায় সমুদ্রতীরে বড়ই মনোরম পল্লী দেখতে পেলাম।

একস্থানে ৪০।৫০টী বালক বালিকা দেখলাম, তারা স্কুলের ছুটীর পর খেলা করছিল, আমার বড়ই ইচ্ছা হল তাদের খেলা দেখতে—তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে। এই পাড়াগাঁ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় লোক দেখে নাই।

বিদেশী নূতন রকম মানুষ দেখে তারা খুবই বিস্ময়ের সহিত আমার পানে চাইল—বড় ছেলে মেয়েদের মধ্যে দু'একটী একটু এগিয়ে আমার দিকে এল। আমি প্রথমেই তাদের বললাম, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে চাই, আমার ইংরেজী কথা তোমরা বুঝতে পার কি? তারা বলল, হাঁ পারি। তখন তাদের সঙ্গে একটু কথা-বার্ত্তা বলতেই সব ছেলে মেয়ে আমার কাছে এল; পরে তাদের বাড়ী থেকে বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরাও এল। আমি ছেলেদের উপযোগী অনেক রকম ভারতীয় সংবাদ তাদিগকে শুনালাম, তাদের কাছেও অনেক শুনলাম। বাস্তবিকই আমি সব যায়গায় ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পাই। সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ছেলে মেয়েরা আমাকে ছাড়ে না—প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ভারতীয় কথা শুনতে থাকল। গল্প করবার আকাঙ্ক্ষা তাদের মিটল না, তাই আর একদিন আমাকে আসতে সবে মিলে অনুরোধ করল। আমি আগামী পরশু বিকালবেলা আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের কাছে বিদায় নিলাম। সকলে মিলে ট্রাম পর্য্যন্ত এসে আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে 'বিদায় বিদায়' বলে হাত নাড়া দিতে লাগল। ট্রাম ছাড়বার পরও অনেকক্ষণ আমি তাদের হাত নাড়া দেখলাম।

বাস্তবিক নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি তাদের কাছে গিয়েছিলাম, এ দিন তারা আরও ছেলেমেয়ে ডেকে এনে সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়ে ৭০।৭৫টী হয়েছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাদের গান শুনতে চাইলাম, তারা ছেলে মেয়ে এক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চমৎকার গান করল, গানটী ছিল আমাদের

দেশের "বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান"এর মত। ছেলে মেয়ে মিলে এমন জোরে এমন স্ফূর্ত্তিতে এক তালে গান করতে বাস্তবিকই আমি আর কখন শুনি নাই।

তারপর তাদের পাল্লায় পড়ে আমাকেও একটা বাংলা গান গাইতে হয়েছিল—আমার গানের অদ্ভুত ভাষা আর সুর শুনে তারা খুবই হো হো করে হেসেছিল। সে হো হো করা উপহাসের নয়,—নূতনত্বের আনন্দের। আইরিশ বালকবালিকাদের সঙ্গে এ দিন যে মধুর ভাব হয়েছিল তা জীবনে ভোলবার নয়।

আইরিশ থিয়েটার

সন্ধ্যার পর সহরে এম্পায়ার থিয়েটার নামক একটী প্রসিদ্ধ থিয়েটার দেখলাম। লণ্ডন ও গ্লাসগোতে যেমন থিয়েটার দেখেছি, তা অপেক্ষা এখানে একটু কম জমকালো হলেও বড় মধুর লেগেছিল। অভিনয়ে এক ধোবার মূর্খমী দেখে হেসে আর বাঁচি নে—বুদ্ধিমতী কর্ম্মকুশলা স্ত্রীর গুণে তার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ব্যাধ-বালিকার সঙ্গীতের তালে তালে দর্শকগণের প্রতি ফুলের তীর নিক্ষেপ অতি আশ্চর্য্য শিক্ষার পরিচায়ক। তোত্‌লার গান, মাতালের সার্কাস প্রভৃতি কয়েকটি অভিনয় বড় ভাল লেগেছিল। আমি থিয়েটারের বিশেষ পক্ষপাতী নই—কিন্তু বিদেশে নানা ভাবের ভিতর দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা লাভের জন্যই বিদেশী থিয়েটারগুলিও আগ্রহের সহিত দেখতাম। বিলাতের থিয়েটারগুলি দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই অভিনয় শেষ করে। প্রত্যেক থিয়েটারই সন্ধ্যার পর আরম্ভ করে দু'বার অভিনয় করে। এ দিন সন্ধ্যা ৫টায় আরম্ভ হয়ে ৭৷৷৹টায় শেষ হল।

ধর্ম্মভাব

থিয়েটারের পর রাস্তায় বের হয়ে একস্থানে দেখলাম, প্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচার করছে, খানিকটা দাঁড়িয়ে শুন্‌লাম, আমার বড়ই ভাল লাগল—কারণ এখানে এ দিন প্রচারকেরা প্রত্যেকে আপন জীবনে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ যা প্রত্যক্ষ করেছে, সেইগুলিই প্রাণের আবেগে বলছিল। স্ত্রী-পুরুষে ৪।৫ জনের প্রচার শুনলাম—সবই চমৎকার। একটী মেয়ে উপাসনা করল, সজল নেত্রে দীর্ঘ সময় ব্যাপী উপাসনা। বাস্তবিক ভগবানের সঙ্গে পরিচয় না হলে কি এমন ভাবের উপাসনা করা যায়?

প্রচার সভা ভঙ্গের পর এদের কর্ত্তৃপক্ষীয় একটী যুবক আমার সঙ্গে পরিচয় করলেন, বাস্তবিক আমিও তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে মনে মনে আশা করছিলাম। যুবকটী পরদিন রবিবারের উপাসনা-সভায় যোগ দিতে আমাকে অনুরোধ করলে আমি সানন্দে স্বীকৃত হলাম।

১৪ই ডিসেম্বর রবিবার সকালে আহারাদি শেষ করে ১১টায় তাদের উপাসনা মন্দিরে গেলাম। প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশ ও প্রার্থনাদি শুনলাম, তারপর উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর ভিতরের কয়েকজনে উপাসনা করলেন। প্রত্যেক উপাসনার মধ্যেই এঁদের গভীর ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পেলাম। ইংলণ্ড এবং স্কট্‌লণ্ডবাসীদের চেয়ে আয়র্লণ্ডবাসীরাই বেশী ভগবৎ-পরায়ণ বলে মনে হয়।

পরে এঁদের সোমবারের রাত্রির একটী বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়েও বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। এ দিন একটী যুবক সকলকে কয়েকটী নূতন গান শুনালেন আর একটী মহিলা উপদেশ দিলেন।

পল্লীর তাঁত বোনা

১৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। এদিন সকালের আহারাদি শেষ করেই আমি পল্লীগ্রামের তাঁতে কাপড় বোনা দেখবার জন্য ট্রেণে বেলফাষ্ট থেকে ৩০ মাইল দূরে Lurgan নামক স্থানে গেলাম। ট্রেণে চলতে পথে আইরিশ পল্লীর সৌন্দর্য্য দেখে বড় আনন্দ পেলাম। এদের সমস্ত দেশ-গুলিই উঁচু-নীচু পাহাড়ে পূর্ণ। এক ঘণ্টার মধ্যেই Lurgan পৌঁছলাম। এটী নিতান্ত পাড়াগাঁ নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি ছোট সহর। বেলফাষ্টের একটী ভদ্রলোক আমাকে Lurgan এর Mrs. Weir নাম্নী একটী মহিলার বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিলেন (17, James Street) আমি তাঁর বাড়ীতে উঠলাম। Mrs. Wier বৃদ্ধা।

প্রথমতঃ তিনি আমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলেন, পরে পরিচিত লোকের চিঠি আমার হাতে পেয়ে আমাকে খুবই যত্নের সহিত গ্রহণ করলেন। তিনি রান্না করছিলেন। এসব দেশে শীত কালে প্রতি ঘরেই সর্ব্বদা আগুন জ্বালান থাকে, দেখলাম—মহিলার পৃথক রান্নাঘর নাই, এই সদর ঘরের আগুনেই রান্না করছেন। আমি খানিকটা পথ হেঁটে এসেছি, পায়ে বড় শীত বোধ করছিলাম, তাই ঐ আগুনের কাছে পা রাখলাম। বৃদ্ধা তখন পৃথক গ্যাসের উনুন জেলে রান্না আরম্ভ করলেন, আর এই কয়লার আগুনে আমার গা, পা গরম করতে বললেন। এই পল্লীকুটীর খানির প্রত্যেক জিনিষটী আমার কাছে নূতন লাগছিল। আমার ভাব গতিক দেখে বৃদ্ধা আমাকে বলেই ফেললেন যে, আপনি সবই নূতন রকম দেখছেন,—নয় কি? এই বলে বৃদ্ধা তার গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম খুটিনাটি সব আমাকে আনন্দের সঙ্গে দেখালেন।

একটু দূরে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনছিলাম, কিসের শব্দ জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা

বললেন, আপনি যা দেখতে এসেছেন সেই তাঁত বোনা হচ্ছে। তখন বৃদ্ধা আমাকে তার বয়ন কার্য্যালয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি খুবই আগ্রহের সহিত তাঁত বোনা দেখলাম। লিনেন সূতায় খুব বড় টেবিল ক্লথ বোনা হচ্ছিল। প্রকাণ্ড বড় তাঁত—কোন মেসিনে Power এর ব্যবহার নাই, সমস্তই হাতে পায়ে কাজ হচ্ছে। সেই আমাদের দেশের তাঁতীদের মতই ঠক্ ঠকি তাঁত, কিন্তু অনেক উন্নত ভাবের পরিবর্ত্তন দেখলাম। কাপড়ের উপর সাদা সূতায় চমৎকার লতা ফুল ঐ সঙ্গেই বোনা হয়ে যাচ্ছে। তার বিশেষ বর্ণন এখানে করবার স্থান হবে না।

বিকালে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথ চলতে পথে অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল, তারা কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে। বাড়ীতে তারা নানা রকম সূঁচের কাজ আর লেস্ বোনার কাজ করেছে, সেগুলি কারখানায় নিয়ে চলেছে। আমি ঐ সব দেখতে চাওয়ায় তারা অনেক রকমের কাজ আমাকে দেখাল। তাদের কাছে জানলাম—এ অঞ্চলে প্রত্যেক মেয়েই এই সব শিল্পকর্ম্ম করে। সন্ধ্যায় ট্রেণে বেলফাষ্ট ফিরলাম।

ঐ রাত্রিতেই জাহাজে লিভারপুল রওনা হলাম। অনেক রাত্রিতে জাহাজ আইল অব্ ম্যান নামক দ্বীপে ধরেছিল। আইল অব্ ম্যান আইরিশ সাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপ। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে বহুলোক এখানে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যে এসে থাকেন। আইল অব ম্যানের রাজধানী ডগ্‌লাস সহর বহুপ্রকার আমোদ-প্রমোদের স্থান। গ্রীষ্মকালে সমুদ্র-স্নান ও বালির চড়ার উপর খেলা-ধূলা করা এখানকার বিশেষ উপভোগ্য।

বেলফাষ্ট উত্তর আয়র্লণ্ডের শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এখানে জাহাজ তৈরীর এমন কয়েকটি বড় কারখানা আছে, যত বড় সমগ্র পৃথিবীতে আর নাই। জাহাজে ব্যবহারার্থ দড়া, কাছি প্রস্তুতেরও খুব বড় বড়

কারখানা আছে। এই সকল কারখানায় বহু দরিদ্র শ্রমজীবী কাজ করে' জীবন ধারণ করে। এখান হতে উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত



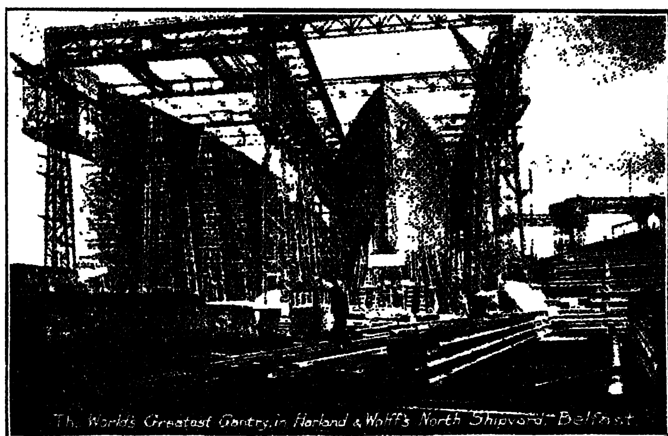
ডগ্‌লাসের সমুদ্রোপকূল

কয়েকটি বড় বড় জাহাজ লাইন আছে, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া আহারাদিসহ ১৮ পাউণ্ড মাত্র।

গরীবের দেশ

সমগ্র আয়র্লণ্ড দেশটাই গরীবের দেশ। ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের মত বড় বড় কল কারখানা এখানে কমই আছে। এখানকার বহু পল্লী-বাসী গৃহশিল্প দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে থাকে। বহু পরিবারে মেয়েরা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে। লেস্, তোয়ালে, টেবিল ক্লথ,

খাবারের ঢাক্‌না প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ মহাজনেরা অর্ডার দিয়ে মেয়েদের দ্বারা তৈরী করিয়ে বিদেশে চালান দেয়। হাতের কাজ বলে' আমেরিকা প্রভৃতি ধনীর দেশে সেগুলি উচ্চমূল্যে বিক্রী হয়। আয়র্লণ্ডের লোকগুলি গরীব হলেও একটু ধর্ম্মপরায়ণ; এই দারিদ্র্যের মধ্যেই তাদের বেশ একটা শান্তি আছে।



বেলফাষ্টে জাহাজ তৈরীর কারখানা

বেলফাষ্টে কয়েকদিন স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির একটা হোষ্টেলে ছিলাম। এখানকার স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির এই হোষ্টেলটি খুব বড়। স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির কাজ প্রধানতঃই গরীব দুঃখীদের নিয়ে, তাই এদের হোষ্টেলগুলিতে গরীবেরাই বেশীর ভাগ স্থান পায়। যে লোকের চাকরী নাই, যে লোক সামান্য পেনসন্ পায় কিংবা যার হাতে পয়সা কড়ির নিতান্ত অভাব বা যে উপার্জ্জনে অক্ষম—এই রকম লোক স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির হোষ্টেলে স্থান

পায়। আমার খুব খরচ বাঁচানো আবশ্যক না থাক্‌লেও গরীবদের অবস্থাটা উপভোগ করবার জন্যই তাদের হোষ্টেলে স্থান নিয়েছিলাম। ইংলণ্ড কি স্কট্‌লণ্ডে যত গরীব হোষ্টেলই হোক না কেন রাত্রির শোবার দৈনিক ভাড়া তিন শিলিংএর অর্থাৎ দু'টাকার কমে হয় না : আর সমস্ত দিনের আহারাদি সমেত দৈনিক আট দশ শিলিংএর কমে চলে না, কিন্তু বেলফাষ্টের এই স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির হোষ্টেলে মাত্র দু'পেনিতেও শোয়ার ব্যবস্থা আছে। আহারাদি সমেত দৈনিক দু'তিন শিলিং খরচেও কেউ কেউ চালায়। বিলাতে হোটেল-খরচ সাধারণতঃ এক বেলা ৩ শিলিং বা ২ টাকা কিন্তু এই স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির হোটেলে মাত্র ৬ আনাতেও একবেলা মোটামুটি খেতে দেখেছি। এক আনার পরিজ বা যব সিদ্ধ, এক আনার আলু সিদ্ধ, দুই আনার ভাজা মাছ, এক আনার মিষ্টি ডুমুর, আর এক আনার চা—এই ছ'আনায়ই এক রকম খাওয়া হয়। অনেক রকম আমোদ উৎসবও গরীবদের কম খরচে দেখবার ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটারে মাত্র আট আনা দামের শ্রেণীতে গরীবদের সঙ্গে বসে দেখে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছি। অনেক গরীব মেয়েদের দেখেছি কম্বল গায় দিয়ে শীত কাটায়; আবার কম্বলের এক পাশে কোলের ছেলে মুড়ে সেই কম্বলটি আবার ফিরিয়ে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে উপরের কোণটি সেপ্‌টিপিনে এঁটে দেয়। এতে ছেলে কোলে করে দু'হাত ছেড়ে দিয়েও বেড়াবার বা কাজকর্ম্ম করবার বেশ সুবিধা হয়।

আয়র্লণ্ডে প্রচুর পরিমাণে গোল আলু ও নানারকম কপি জন্মে। কোন কোন স্থানে ভেড়ার চাষ আছে। এখানে অনেক ডায়রী ফার্ম্‌ আছে; তা' থেকে উৎকৃষ্ট গোদুগ্ধ সহরে সরবরাহ হয় এবং প্রচুর পরিমাণে মাখন তৈরী হয়।

সহর থেকে দূরে কয়েকটি পল্লীতে গিয়ে দেখেছি, অতি কম খরচে

ছোট ছোট গৃহস্থ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে। তাদের ঘর-বাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদ একটুও অপরিষ্কার নয়। জেলেদের বাড়ী-ঘর, মুচীদের বাড়ী-ঘর, এ সব খুব ছোট ছোট হলেও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অর্থের দায়ে এদের সারাদিন পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু দেখলাম মনে শান্তি আছে। আয়র্লণ্ডের গরীবদের দেখে শিখলাম—দারিদ্র্য মানুষকে বেশী অসুখী করতে পারে না, অজ্ঞতাই মানুষের দুঃখের কারণ।

আয়র্লণ্ডের উত্তর প্রান্তে আট্‌লান্টিক মহাসাগর তীরে ভ্রমণ করতে করতে অনেক বার মনে হত, পৃথিবীর এক প্রান্তে এসে পড়েছি।

অষ্টম অধ্যায়

[শিল্পবাণিজ্যের দেশ]

লিভারপুল

১৭ই ডিসেম্বর বুধবার রাত্রি ৯টায় জাহাজে বেলফাষ্ট থেকে রওনা হয়ে সকাল ৮টায় লিভারপুল পৌছলাম। ১০ নং নর্থ ষ্ট্রীটে, চিঠি দিয়ে ঠিক করা হোটেলে বাসা নিলাম। দেখলাম, কলকাতার চিঠি লণ্ডন থেকে ফেরত হয়ে হোটেলে মজুত রয়েছে। এখন আমি নূতন সহর ঘুরতে একটু পাকা হয়েছি, গাইড্ বই সঙ্গে নিয়ে নানাস্থান দেখলাম। মিউজিয়ামটি অন্যান্য সহরের মত, তবে আর্ট গ্যালারীতে বড় সুন্দর সুন্দর ছবি দেখলাম। আর্ট-গ্যালারীর সম্মুখে দ্বারের দুই পাশে জগৎ বিখ্যাত চিত্র-শিল্পিদ্বয় র‍্যাফেল ও ম্যাঞ্জেলার মর্ম্মরমূর্ত্তি রয়েছে। এখানকার অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে মার্সি নদীর তীরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই লিভারপুল বন্দরটি সারা জগতের বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র সুতরাং জাহাজী ব্যাপার যে এখানে কি রকম বিশাল তা ভাবলেও বিস্ময়ে অবিভূত হতে হয়। সমুদ্রের নিকটে মার্সি নদীর মোহনায় লিভারপুল। মার্সি নদীর পশ্চিম পারে লিভারপুল আর পূর্ব্ব পারে বার্কেন-হেড্ বন্দর। এখানে নদীটি এক মাইলের উপর প্রশস্ত। নদীর দুই ধারে ক্রমাগত ৮ মাইল পর্য্যন্ত কেবল জাহাজে মাল বোঝাই করবার ডক্।

এত বড় জাহাজের ডকের শ্রেণী পৃথিবীতে আর নাই। ছোট ছোট জাহাজগুলি অনবরত এপার ওপার খেয়া দিচ্ছে। এই খেয়া-পারের জাহাজগুলিও সংখ্যায় ৩০ খানার কম নয়। আর যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল জাহাজের শ্রেণী। সমুদ্রের মোহনায় গিয়ে দেখলাম, নানা দিক থেকে জাহাজ আসছে যাচ্ছে।

লিভারপুল থেকে এই সুপ্রশস্ত নদীর নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গপথে রেল গিয়েছে। আমি কখনও কখনও নীচে সুড়ঙ্গ পথে ট্রেণে নদীর অপর পারে গিয়ে বার্কেনহেড্ সহর দেখতাম। বার্কেনহেডের পাহাড় বড় সুন্দর। লিভারপুল নদীর তীরে আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় দেখবার আছে—ক্রমাগত ৮।১০ মাইল পথ ৯৬টি ডকের পাশ দিয়ে রেল গিয়েছে। একে ওভারহেড্ রেলওয়ে বলে। বিশ হাত উপর দিয়ে লোহার থামের উপর বরাবর রেলপথ। এই ট্রেণে উঠে ডক্‌গুলি দেখতে ও নদীতীর ভ্রমণ করতে বড়ই আনন্দ হয়। আমি দুই দিন এই ট্রেণে চড়ে সমস্ত দেখেছি। নদীর অপর পারে তিন মাইল দূরে পোর্টসান্‌লাইট অর্থাৎ সুবিখ্যাত সান্‌লাইট সাবানের বন্দর।

সান্‌লাইট সোপ ফ্যাক্টরী

১৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্নে আমি জাহাজে পার হয়ে সান্‌লাইট বন্দরে সাবানের কারখানা দেখতে গেলাম। জাহাজ-ঘাটে নেমে মটরবাসে চড়ে খানিকটা গিয়ে সান্‌লাইট বন্দরে তাদের প্রধান আপিসে উঠলাম। নানা স্থানের বিদেশীরা এসে এই জগদ্বিখ্যাত সাবানের কারখানাটী দেখে থাকেন। দেখবার জন্য কোম্পানি থেকে গাইড্‌ম্যান অর্থাৎ প্রদর্শক নিযুক্ত আছে। ম্যানেজার ভিজিট বইতে আমার নাম

ঠিকানা স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে একজন প্রদর্শককে আমার সঙ্গে দিলেন। কার্য্যক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চিত্র সম্বলিত একখানি মনোহর পুস্তক উপহার পেলাম। ভিতরে গিয়ে যা দেখলাম, এই বিদেশ ভ্রমণের মধ্যে এটি একটী দেখবার মত বড় বিষয়।

প্রথমে আমরা সাবানের জ্বাল ঘরে গেলাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার চৌবাচ্চায় সাবান জ্বাল হয়ে এক একটি নালা দিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে শীতল হচ্ছে। কয়েক শত স্ত্রী-পুরুষে সেগুলি কলে দিয়ে লম্বা সাবানের ছড় তৈরী করে রাখছে। আর একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে প্রায় দুই হাজার স্ত্রীলোক সেইগুলিকে কলের ডাইসে সাবান তৈরী করে বাক্সে প্যাক্ করছে। এ সবই চমৎকার কলে হচ্ছে। চার হাজার পুরুষ আর ছয় হাজার স্ত্রীলোক এই কারখানায় কাজ করে। পরিশ্রমের কাজগুলি প্রায়ই পুরুষেরা আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহজ কাজগুলি স্ত্রীলোকেরা করছে। বাক্স তৈরীর কারখানা ও ছাপাখানা অতি বিরাট। শুনলাম, এ রকম দ্রুত কাজের উৎকৃষ্ট ছাপাখানা পৃথিবীতে কমই আছে। এরূপ বিরাট কারখানা এটাই প্রথম দেখলাম।

এই কারখানায় এবং এই কারখানার কাজ সম্বন্ধে বাইরে এত অধিক লোক কাজ করে যে, এই কোম্পানিকে এর জন্যই একটী বন্দর তৈরী করতে হয়েছে। কেবল এই সান্‌লাইট সাবানের কাজ ভিন্ন এখানে আর কিছু হয় না। যারা এখানে কাজ করে, তাদের বাসের জন্য সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী হয়েছে। এদের জন্য হাট, বাজার, হোটেল, রেলষ্টেসন, মটরবাস লাইন, ডাকঘর প্রভৃতি নূতন ভাবে তৈরী হয়েছে। ইংরেজ জাতি আমোদ ছাড়া থাকে না, এজন্য এদের খেলার নানা রকম বড় স্থান, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতিরও স্থাপন করা হয়েছে। একটি চমৎকার আর্ট গ্যালারীও এখানে স্থান পেয়েছে; মাত্র এখানে এর শেষ নয়।

পৃথিবীর নানা স্থানে এই কোম্পানি সান্‌লাইট সাবানের কারখানা খুলেছে। আমেরিকায় নিউইয়র্কে এদের কারখানা এখানকার কারখানার চেয়েও বড়। তবে এইটাই এদের আদি স্থান।

পৃথিবীর নানা স্থানের প্রদর্শকেরা এই সান্‌লাইট সাবানের কারখানাটি দেখতে আসেন। দর্শকদের দেখবার জন্য এই কোম্পানি এতই সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন যে, এমন বন্দোবস্ত আর কোথাও দেখি নাই। কার-খানার ঘরগুলিতে নীচেয় হাজার হাজার লোকে কাজ করছে, আর উপর দিয়ে দর্শকদের দেখাবার জন্য রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। এতে অল্প সময় মধ্যে বহুদূরের কাজ দেখবার সুবিধা হয়েছে। সেই পথগুলির নাম রাখা হয়েছে—"ভিজিটরস্ রুট" অর্থাৎ দর্শকদের পথ। একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে সুগন্ধি সাবান ও ডাক্তারদের ব্যবহার জন্য নানারূপ মূল্যবান সাবান তৈরী হচ্ছে, এগুলি সব মেয়েরাই করছে। এগুলি হাত মেসিনে প্রেস করে তৈরী হচ্ছে। কারণ জিজ্ঞাসায় জানলাম, হাতের মেসিনে যেমন ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ হয়, কলের মেসিনে তেমন হয় না।

আমার সঙ্গের গাইড্ যুবকটি প্রত্যেক বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিতে-ছিলেন। উপরে এক স্থানে নিয়ে সমস্ত সানলাইট বন্দরটি দেখালেন। দেখলাম, তিন মাইল দীর্ঘ প্রস্থ এই সান্‌লাইট বন্দরটি কেবল এদের কাজেই খাটছে। মাত্র কারখানাটী দেখতে আমাদের ৫ ঘণ্টা সময় লাগল, অনেক রাত্রি হয়েছিল বলে আর্টগ্যালারী প্রভৃতি বিষয়গুলি দেখা হল না। রাত্রি ৯ টায় সান্‌লাইট কোম্পানির মটরবাসে ফিরে এলাম।

লিভারপুল সহর ছেড়ে দূরে একদিন নির্জ্জন পাহাড়ে' অঞ্চল ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদের বাস দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। সেদিন রবিবার, অনেক লোক বেড়াতে বের হয়েছিল।

পাহাড়ে' পল্লীর একটি উচ্চস্থানে উইণ্ড্ মিল অর্থাৎ একটী বায়ুচালিত

কল দেখলাম। উচ্চ স্তম্ভ করে তার গায়ে প্রকাণ্ড চারখানা পাখা লাগান হয়েছে, যে দিক থেকে বাতাস আসে সেই দিকে পাখার মুখ ফিরিয়ে দিলে পাখা বাতাস পেয়ে ঘুরতে থাকে, তার শক্তিতেই কল চলে। এই কল এক শতাব্দী পূর্ব্বে ব্যবহৃত হত, ষ্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার হ্রাস পায়। এগুলি সাধারণতঃ জমিতে জল দিবার জন্য এবং গৃহস্থদের গম পেষণ করবার জন্য ব্যবহৃত হত।

দেখলাম, উইণ্ড্ মিলটা পুরাতন অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এখন এটা কেবল একটি দৃশ্য মাত্র।

আমার মনে হয়, এই মত কল আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত। জমিতে জল দিবার পক্ষে এরূপ কল বড়ই উপযোগী। অন্যান্য অনেক কাজ এই কলে করা যেতে পারে।

বহুকাল থেকে আমাদের ঢেকিতে ধানভানা, ঘানিতে তেল প্রস্তুত করা হয়ে আসছে, বর্ত্তমানে বিলাত থেকে নানা রকম কল আমদানি হচ্ছে, আমাদের দেশের পক্ষে এটা খুবই আশঙ্কার কথা যে, পাছে ঐ সব কলের বহুল প্রচলন হয়ে দেশের লোকের যা-কিছু একটু কাজকর্ম্ম ছিল তাও বন্ধ করে দেয়। তাই আমার মনে হয়, উইণ্ড্‌মিলে দেশের লোকের যে পরিশ্রমের লাঘব হবে, তাতে বিশেষ কোন খরচের কারণ নাই ; বরং নানা দিকেই সুবিধা।

ম্যাঞ্চেষ্টার

২২শে ডিসেম্বর সোমবার—এ দিন সকালে আমি লিভারপুল থেকে ট্রেণে রওনা হয়ে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে এলাম। একটা হোটেলে উঠে আহারাদি শেষ করে জিনিস পত্র হোটেলে রেখে সহরে বেড়াতে বের হলাম। আমার

বার্ম্মিংহামের প্রতিই মন টান্‌ছিল, এজন্য ম্যাঞ্চেষ্টার সহরটি এক দিনের মধ্যে দেখে শেষ করতে মনস্থ করলাম।

ম্যাঞ্চেষ্টার কাপড় তৈরীর জন্য বিখ্যাত। প্রথমে সহরের একখানা গাইড্‌ বুক কিনে নিয়ে দেখলাম যে, কোন স্থানে কি বিশেষ দেখবার জিনিস আছে। পরে তার মধ্য থেকে ক্যানাল ডক্‌, পিকাডিলি, মিউজিয়াম, আর্টগ্যালারী ও একটি থিয়েটার এক দিনের মধ্যে দেখবার প্রোগ্রাম তৈরী করলাম। সমস্ত পথেই ট্রাম ও মটরবাস্‌ রয়েছে, চলতে ফিরতে মোটেই অসুবিধা নাই। আর গাইড্‌ বুকের বন্দোবস্তের গুণে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবারও বিশেষ দরকার হয় না।

ট্রামে চার মাইল দূরে গিয়ে ক্যানাল ডক্‌টি দেখলাম। লিভারপুল থেকে খুব প্রশস্ত প্রায় আশী মাইল পথ খাল কেটে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত আনা হয়েছে। এই পথে ম্যাঞ্চেষ্টারে জাহাজ আসে। এই সব জাহাজেই আমাদের দেশের তূলা ওদেশে যায় আর কাপড় তৈরী হয়ে আমাদের দেশে আসে। সহরের রাস্তায় অনেক মটর লরীতে তূলার গাঁট বোঝাই চলতে দেখলাম। জাহাজ থেকেও তূলা নামছে। আমি প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত জাহাজপূর্ণ ডক দেখে ফিরলাম। কতদূর পর্য্যন্ত এই ভাবে খালের ডকে জাহাজ সাজান রয়েছে জানবার সুযোগ হয় নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আর্টগ্যালারিতে গেলাম, এখানে আর্টগ্যালারী এবং মিউজিয়াম একই সঙ্গে। সমস্ত আর্টগ্যালারী ও মিউজিয়াম দেখা শেষ হলে পিকাডিলিতে গেলাম। এটি সহরের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এবং প্রায় সমস্ত বড় বড় বিষয়গুলিই এইখানে। লণ্ডনের পিকাডিলি লণ্ডনের মধ্যে সব চেয়ে জমকালো, এই ম্যাঞ্চেষ্টারেও পিকাডিলিই সবচেয়ে বেশী সৌন্দর্য্যময়। আমি স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে একটি ভাল থিয়েটারে প্রবেশ করলাম। লিভারপুলে দু'দিন থিয়েটার দেখেছি, এই ম্যাঞ্চেষ্টারেও এক



বার্ম্মিংহামের কুয়াসাচ্ছন্ন পথে গ্রন্থকার

১৬৮ পৃষ্ঠা

দিন দেখলাম, কিন্তু পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানে যে সব আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখেছি তা অপেক্ষা অনেক নূতন দেখা গেল। থিয়েটারগুলিতে রবিবার ভিন্ন আর সব দিনই অভিনয় হয়।

বার্ম্মিংহাম

২৫শে ডিসেম্বর (১৯২৪) তারিখে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে বার্ম্মিংহামে এলাম। সমস্ত বড় বড় সহরে খৃষ্টীয় যুবক সমিতি (Y. M. C. A.) এবং স্যাল্‌ভেসন আর্ম্মির হোটেল আছে। খৃষ্টীয় যুবক সমিতিগুলি একটু অবস্থাপন্ন ধরণের লোকেদের জন্য। সে সব হোটেলে থাকতে দৈনিক ১২ শিলিং (প্রায় ৯৲ টাকা) থাকা আর খাওয়াতেই খরচ হয়। স্যাল্‌ভেসন আর্ম্মির হোটেল-গুলিতে বিছানার জন্য দৈনিক এক শিলিং এবং খাওয়ার জন্য ছয় সাত শিলিঙেই এক রকম চলে। আমি স্যাল্‌ভেসন আর্ম্মির হোটেলেই ছিলাম। বড় দিনের এবং নূতন বৎসরের উৎসব এই হোটেলেই দেখলাম। বড় দিনে বেশ সাজ গোছ ও আহারাদির ঘটা। গীর্জ্জায় এবং অনেক গৃহস্থ পরিবারে এই সময় খৃষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে সভা সমিতি ও ধর্ম্মাচরণ হয়। আমি স্যাল্‌ভেসন আর্ম্মির হোটেলে বড় দিনের উৎসব করলাম। আহারের খুব ধুমধাম ছিল, সাধারণের জন্য যে সব আহারের ডিস্ সাজান হয়েছিল, আমার জন্য তা অপেক্ষা একটু পৃথক বন্দোবস্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা করেছিলেন, আমি খাদ্য সম্বন্ধে একটু বাছ-গোছ করি তা এঁরা আগেই জেনে নিয়েছিলেন।

বৎসরের শেষ দিনে স্যাল্‌ভেসন আর্ম্মির যে সভা হয়েছিল, আমি সে সভায় মানবাত্মার ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে একটী ছোট বক্তৃতা দিয়েছিলাম। যদিও বিষয়টি গুরুতর তথাপি মনের ভাব প্রকাশ করতে কোনখানে বাধা

পেয়েছিলাম না, বেশ প্রাণের সঙ্গে বলতে পেরেছিলাম। আমার পরবর্ত্তী দুই জন বক্তার মুখে আমার বক্তৃতার উচ্চ সমালোচনা শুনে বুঝলাম, আমার বলা শ্রোতাগণের ভাল লেগেছিল। আমার বলায় একটু বৈষ্ণবীয় গন্ধ ছিল, কাজেই এঁদের কাছে একটু নূতন লেগেছিল। আমি এই কথাটিই পরিষ্কার করে বলছিলাম যে, ভগবানের প্রাকৃত (Natural) শক্তির সহায়তায় মানুষ কোনমতে জীবন কাটাতে পারে মাত্র কিন্তু আত্মার উন্নতি তাতে হয় না—আত্মার উন্নতির জন্য তাঁর অলৌকিক শক্তি (Miracle) অনুভব করা চাই। এ সম্বন্ধে নিজ জীবনে যতটুকু অনুভব করেছি, তারও কয়েকটি ঘটনা বলেছিলাম। বর্ষ শেষের সভায় আমার এ প্রসঙ্গের অর্থ এই যে, সারা বৎসরে কতটুকু আত্মার উন্নতি হয়েছে, তার খতেন করতে হবে এবং এই আত্মার উন্নতি যতটুকু হয়েছে সেইটুকুই মাত্র তার এ বৎসরের 'লাভ', আর যত কাজ-কর্ম্ম সবই বাজে জমা-খরচ।

বিলাত-ফেরতাদের মুখে শুনতাম, বিলাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম মোটেই নাই কিন্তু আমি যত লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করেছি, তার মধ্যে অনেককেই ধর্ম্মপরায়ণ দেখেছি।

বার্মিংহামে আমাদের কার্য্য

শিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাই বার্ম্মিংহামের বিশেষত্ব। এত বড় শিল্পের সহর ইংরেজ রাজত্বে আর নাই। সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এটাই কলকারখানার গুরুত্বে শ্রেষ্ঠ। আমি বার্ম্মিংহাম সহরের বাইরে ট্রামে বা মটরবাসে কখন কখন ৭।৮ মাইল দূরে গিয়েছি; কিন্তু যে দিকেই যাই, যত দূরেই যাই কেবল বড় বড় কারখানা দেখতে পেয়েছি। বার্ম্মিংহামের ৩০।৪০ মাইল দূর পর্য্যন্ত চারদিকে এই রকম বড় বড় কলকারখানায় পূর্ণ।

ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধীয় কারখানাগুলির এক একটা যে কি বিশাল তা' আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কিছুই ধারণা করা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের পদ্মা নদীর পোল যে কোম্পানি গড়েছে, তাদের কারখানা দেখলাম। এরা সমস্ত পৃথিবীতে বড় বড় পোল গড়ে। এই মত ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের, ভিন্ন ভিন্ন রকমের কারখানা রয়েছে।

এই বার্ম্মিংহামই আমার বিলাত আসা বেশী সার্থক করেছে। এখানে অনেক কারখানায় প্রবেশ করে কাজ কর্ম্ম দেখেছি। খুব বড় একটা পিতলের কারখানায় পিতল ও তামার পাত এবং তার প্রস্তুত করার সমস্ত কার্য্য দেখেছি। এই পিতলের পাত ও তার প্রস্তুতের কারখানা আমাদের দেশে করতে আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা, এই জন্য এই কারখানার কাজ অতি তন্ন তন্ন করে দেখেছি। মনে হয়, দেশে যৌথ কারবার করে এই পিতলের কারখানা স্থাপন করতে পারলে বিশেষ সুবিধা হতে পারে। ইচ্ছা রইল, হবে কি না জানি না। আমাদের জুয়েলারী কারখানা সম্বন্ধে অনেক কাজ এখানে সম্পন্ন করলাম। এখানকার পৃথিবী বিখ্যাত পালিশের কল ও পালিশের মসলা প্রস্তুতকারক ডব্লিউ, ক্যানিং কোম্পানির সঙ্গে আমাদের আগে থেকেই কারবার রয়েছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদের কাছ থেকে আমরা পালিসের কল কিনে নিয়েছিলাম। বর্ত্তমানে আমরা এদেরই পালিশের কল ও মসলা ব্যবহার করি। এদের সঙ্গে দেখা করে খুবই আনন্দ পেলাম এবং এদের কাছ থেকে ইলেক্ট্রো প্লেটের কাজ শিখলাম। ইলেক্ট্রো প্লেট সম্বন্ধীয় অনেক মূল্যবান সরঞ্জাম এদের কাছ থেকে কিনে এনেছি।

আর একটি বড় কারখানা হতে বারশত টাকার ছোট ছোট জুয়েলারী মেসিন প্রভৃতি কিনে এনেছি। এর সাহায্যে মেয়েরা ঘরে বসেই অনেক

ছোট ছোট অলঙ্কার তৈরী করতে পারবেন। আমাদের জুয়েলারী কারখানার মহিলা বিভাগে এই সব হ্যাণ্ড-মেশিনের দ্বারা অনেক সুবিধা হবে। আর আর অনেক কাজ যা দেখে এসেছি, তার কিছু কিছুর সম্বন্ধে ক্রমে ভাল করে বুঝে সুজে পরে অর্ডার করব ঠিক করলাম। আমাদের সোনার শাঁখার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও বার্মিংহামে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

লণ্ডনে এবং আর আর বড় সহরগুলিতে আমি জুয়েলারী দোকানের অলঙ্কারগুলি খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখেছি, আধুনিক ধরণের যত রকম ব্রেস্‌লেট বিলাতে এ পর্য্যন্ত হয়েছে, আমাদের প্রস্তুত প্লেন শাঁখা, চুড়ী প্রভৃতি যে সেগুলির সমান আসন পেতে পারে, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি। অল্প সোনায় হস্তাভরণ প্রস্তুতের পদ্ধতি আমরা যা করেছি এ রকম পদ্ধতি বিলাতে এখনও হয় নাই।

বার্মিংহাম জুয়েলারী কাজের অতি প্রধান স্থান, এত বড় বড় জুয়েলারী কারবার লণ্ডনে নাই। আমি বার্মিংহামের অনেকের ভাল ভাল কাজ কর্ম্ম দেখলাম। রোল্ড্ গোল্ড্ এবং ইলেক্ট্রো প্লেটিং সোনার অলঙ্কার-গুলি সবই মেসিনে প্রস্তুত হয়। এরও কিছু কিছু এখানে শেখা গেল।

তামা ও পিতলের কারখানা

উইলিয়ম কুপার এণ্ড গুড্ কোম্পানির তামা পিতলের কারখানা বার্মিংহামের একটী অতি পুরাতন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। প্রায় শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বে ইহা স্থাপিত হয়েছিল এবং এর খ্যাতি এক্ষণে দেশ বিদেশে সুবিস্তৃত ভাবে ব্যাপ্ত।

৯ই জানুয়ারী (১৯২৫) সকালের আহারাদি সম্পন্ন করে বেলা ১১টায় ঐ কোম্পানির কারখানার আপিসের দরজায় রিং কর্‌লে একটি মেয়ে

এসে দাঁড়াল। আমি তা'কে বললাম, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই। মেয়েটী ব'ল্‌ল, ম্যানেজার একঘণ্টা পরে আস্‌বেন, আপনার কি দরকার? আমার দ্বারা কোন সাহায্য হতে পারে কিনা জান্‌তে চাই। আমি বল্‌লাম, আমি কারখানার কাজকর্ম্ম দেখতে এসেছি।

সে আমার কার্ড চাইল এবং আমি উহা দিলে সে একঘণ্টা পরে আমাকে আসতে ব'লে তখনকার মত বিদায় করল।

যথা সময় আমি পুনরায় কারখানার আপিসে গেলে ঐ মেয়েটী আবার আমাকে জানাল, দু'টার সময় বড় ডিরেক্টর আস্‌বেন, তাঁর আদেশের অপেক্ষা করতে হবে। বাইরের হাওয়ায় বেরিয়ে এসে আমার বড় শীত ধ'রেছিল, আমি কাছেই একটা Radiator পেয়ে সেখানে গিয়ে গা গরম করে নিলাম। মেয়েটি আমাকে একটী নির্জ্জন কামরায় বস্‌তে দিয়ে কয়েকখানা দৈনিক খবরের কাগজ আমার টেবিলে দিয়ে গেল।

ডিরেক্টর সাহেব এলে একটী সাহেব আমাকে ডিরেক্টরের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে ম্যানেজার এবং আর কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিল, ডিরেক্টর সাহেব আমার মোটামুটি পরিচয় নিয়েই সসম্মানে বসতে দিলেন এবং তিনি ভারতে গিয়েছিলেন, বম্বে ও কলকাতায় তাঁর এজেন্ট আছে সে সব জানালেন।

তারপর আমি কেন এই কারখানা দেখ্‌তে চাই, সে সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি কি ব্যবসায়ী এবং আমার সেই ব্যবসায় সম্বন্ধে এখানে কি কি উৎকর্ষ লাভ ক'রলাম, সে সকলেরও বিশেষ ক'রে খবর নিলেন। আমি সবই সোজাসুজি উত্তর ক'র্‌লাম। এই সমস্ত কলকারখানা দেখে আমাদের দেশীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশ ক'র্‌ব, সেকথাও জানালাম। ডিরেক্টর সাহেবটী অতি উচ্চ অন্তঃকরণের লোক, তিনি আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়েছেন বুঝ্‌লাম এবং একটী উচ্চশিক্ষিত

যুবককে ডাকিয়ে এনে আমার সঙ্গে দিয়ে আমাকে সমস্ত কার্য্য দেখাবার জন্য তাকে উপদেশ দিয়ে দিলেন।

বেলা ৩টার সময় আমরা কারখানা বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ ক'র্‌লাম। আমরা একেবারে কাজের প্রথম আরম্ভ থেকে, পরপর কার্য্য প্রণালী দেখ্‌ব এইরূপ স্থির ক'র্‌লাম। সর্ব্বপ্রথমে একটা বৃহৎ গুদাম ঘরে গিয়ে দেখ্‌লাম, তামা ও দস্তার ইট (Ingot) সাজান র'য়েছে। অন্য একটী ঘরে ভিন্ন ভিন্ন কারখানার বাতিল চাদরের ছাঁট রয়েছে ; পাশে একটী ছোট ঘরে ঐ ছাঁটগুলি কলে প্রেস করে খুব আঁটা পিণ্ড তৈরী করা হ'চ্ছে। পরবর্ত্তী ঘরে ঐ পিণ্ডগুলির সঙ্গে আবশ্যক মত তামা ও দস্তা ওজন করে পৃথক পাত্রে রাখা হচ্ছে, প্রতি পাত্রে সাড়ে তিন মণ পরিমাণ মিশ্রিত তামা দস্তা রাখা হ'চ্ছে দেখ্‌লাম। ঐ পাত্রগুলি এক একটী ছোট চার চাকার গাড়ীর উপর আঁটা। দেখ্‌লাম যে, ঐ পিতল পূর্ণ পাত্রগুলি জ্বাল ঘরে টেনে আনা হ'চ্ছে।

পরে আমরা জ্বাল ঘরে ঢুক্‌লাম। মাটির নীচেয় চৌকো গর্ত্তের ভিতর কয়লার আগুন রয়েছে। বড় মুচিতে একটি পাত্রের সমস্ত পিতলগুলি পূর্ণ ক'রে ঐ মাটীর নীচে আগুনে মুচিগুলি সাজিয়ে তার উপর কয়লা ঢাকা দিয়ে উপরে লোহার চাকায় জমি ঢেকে রাখা হয়েছে। অনেক আগে যেগুলি রাখা হয়েছে, সেইগুলি গ'লে গিয়ে তরল হবার নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করা আছে। যথাসময় জ্বালের মুখের ঢাকা খুলে বেড় সাঁড়াসীতে মুচি ধ'রে কপিকলের শিকলির সঙ্গে সাঁড়াসীর গোড়া আট্‌কিয়ে টেনে ঐ গলিত পিতল পূর্ণ মুচি তোলা হ'চ্ছে। পূর্ব্ব থেকেই লোহার ছাঁচ সাজান রয়েছে দেখ্‌লাম। একটী মুচির সমুদয় পিতল দু'টী ছাঁচে ঢালা হ'ল। জান্‌লাম যে, ঐ গলিত তরল পিতল এগার শত ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়।

কারখানার জ্বাল ঘরে যে পিতল ঢালাই ক'রতে দেখ্‌লাম, সেগুলি তখন চার ফিট দীর্ঘ; দেড় ফুট প্রস্থ এবং দুই ইঞ্চ পুরু ঢালাই হয়েছিল, পরে ঐগুলি ছেনি দ্বারা দাগ কেটে প্রতিখানা দু'ভাগে ভাগ করে সাজিয়ে রাখা হ'চ্ছিল।

পরে আমরা Rolling machineএ প্রেস করার ঘরে ঢুক্‌লাম্। এই ঘরটি অতি বৃহদায়তন। বিভিন্ন রকম পাতের জন্য অনেকগুলি—অনুমান ২০৷২৫টী রোলিং মেশিনে কাজ হ'চ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সাইজের পিতলের ঢালাই Ingot সাজান র'য়েছে এবং প্রেস করা হ'চ্ছে দেখ্‌লাম। এই কারখানায় কেবল মাত্র সাধারণ কাজের উপযোগী পাত ও তার তৈরী হয়। তারেব জন্য ২″×২″ ইঞ্চ মোটা এবং দৈর্ঘ্যে ৮৷১০ ফিট রড্ প্রস্তুত করা হয় এবং প্রথমে চৌকো তারের রোলারে প্রেস ক'রে ক্রমে সরু করা হয়, তারপর তার টানা কলে আবশ্যক মত তার প্রস্তুত হয়। দুই তিনবার প্রেস করার পর একবার পোড়ান হয়। পোড়ান কাজটীও অতি বিরাট ব্যাপার। খোলা রেলগাড়ীর মত একটা ফ্লাট গাড়ীতে পোড়াবার জিনিষগুলি সাজিয়ে সেই গাড়ীখানি এর উপরের ডালাটী সমেত কলের সাহায্যে আগুনের মধ্যে দেওয়া হয়। এইসব কাজের প্রত্যেকটীই অতি বিরাট ব্যাপার, সবিস্তারে বর্ণন করা দুঃসাধ্য। *

আমরা তারপর পাত ও তার প্রস্তুতের সমস্ত ব্যাপারগুলিই দেখ্‌লাম। পাতলা পিতলের পাতগুলি খুব চমৎকার পালিস হ'য়ে প্রস্তুত হয়। তার প্রস্তুত জন্য প্রথমে রোলারে সরু ক'রে নিয়ে পরে যাঁতায় যেমন আমাদের দেশের স্বর্ণকারেরা তার তৈরী করে, তেমন ভাবেই তৈরী হয় কিন্তু সমস্তই কলের সাহায্যে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। এ দেশের সবই অদ্ভুত। এই

* কলকাতার উত্তরে ইছাপুর গান ফ্যাক্টরীতে স্বল্পায়োজনে ইহার কিছু কিছু কাজ হয়।

কারখানাটীর নীচে দিয়ে একটা ক্ষুদ্র নদীর মত খুব খরস্রোতে জল চ'ল্‌ছে দেখ্‌লাম। এই রূপ নীচে দিয়ে নদী চ'ল্‌তে অনেক বড় বড় সহরে দেখেছি। এই সমস্ত নদীতে মাল বোঝাই নৌকা ঘোড়ার দ্বারা গুণ টেনে নেওয়া হয়। উপরে বাড়ী, ঘর, রেল, ট্রাম ইত্যাদিতে এমনই আঁটা যে ক্বচিৎ কোনখানে উপরে থেকে নদীর চিহ্ন দেখা যায় মাত্র।

এর পর আমরা তার ঝালাই করা অর্থাৎ দু'টী তারের মুখ একত্র জোড়া দিবার ঘরে গেলাম। একটী কলে দু'টী তারের মুখ একত্র ক'রে আর একটা কল টিপ্‌লেই একটা আওয়াজ হ'য়ে তারের দুই মুখ ইলেকট্রিকের আগুনে লাল হ'য়ে জুড়ে যায়, পানের আবশ্যক হয় না। এখানে একটা খুব পুরাতন বড় কয়লার ইঞ্জিন আছে, আমরা সেই ইঞ্জিনের সমস্ত কল দেখ্‌লাম। এই কারখানার বড় বড় রোলারগুলি ষ্টিম্ ইঞ্জিনের সাহায্যে চালান হয়, আর অল্প শক্তি সাপেক্ষ কাজগুলি ইলেকট্রিক পাওয়ারের সাহায্যে করা হয়।

এর পর আমরা Laboratory ঘরে প্রবেশ ক'র্‌লাম। দোতলার উপর অতি পরিষ্কার ঘরে Laboratoryটী অবস্থিত। এখানে পিতল পরীক্ষা করা হয়। কোন্ পিতলে কতটুকু তামা, কতটুকু দস্তা আছে এইখানে তা নির্ণয় করা হয়। এই কাজটী খুব শক্ত নয়, তবে একটু শিক্ষার দরকার। পিতলের কিছু গুঁড়া নিয়ে নাইট্রিক এ্যাসিডের সাহায্যে দস্তার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। পিতলের পোড়া ও প্রেসে আঘাত করার জন্য যে নরম ও শক্তের পার্থক্য হয় তা নির্ণয় ক'র্‌বারও একটা কল আছে। কলের সাহায্যে পিতলের পাতের খানিকটা অংশ চাপ দিয়ে উঁচু করে তোলা হয়, যখন সেই স্থানটীর পিতল কেটে যায় তখন কলে একটী শব্দ হয় আর সেই পরিমাণ বলের স্থানে যত point নম্বর থাকে; তাই তার শক্ত নরমের পরিমাণ ধরা হয়।

ডিরেক্টার সাহেব যে লোকটিকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন, তিনি এই Laboratoryর একজন কার্য্যকারক, তিনি সকল বিষয়ই আমাকে বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

সমস্ত কারখানার কাজকর্ম্ম হাতে তোলা-পাড়া ক'রে দেখ্‌তে আমার হাত খুব ময়লা হয়েছিল, আমরা Laboratory ঘরে সাবান জলে হাত পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে বিশ্রাম কর্‌লাম।

তারপর পুনরায় আপিস ঘরে গিয়ে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। ডিরেক্টার তখন উপস্থিত ছিলেন না। ম্যানেজার সাহেব আমাকে চা দিয়ে আপ্যায়িত ক'রলেন। পিতলের শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথাও তাঁর সঙ্গে হ'ল। পুরা আড়াই ঘণ্টা কারখানার কাজ দেখে সাড়ে পাঁচটার সময় বিদায় নিলাম।

সন্ধ্যার পর এখানকার রয়াল থিয়েটারে অভিনয় দেখ্‌লাম। লণ্ডনে এবং স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের বড় বড় সহরে অনেক ভাল ভাল থিয়েটার দেখেছি। স্কট্‌লণ্ডের নাচ অতি আশ্চর্য্য, কিন্তু এই বার্ম্মিংহামের থিয়েটারের বিশেষত্ব এই যে, বৈজ্ঞানিক শিল্পের সাহায্যে এমনই আশ্চর্য্য কৌশল দেখান হয় যে, অধিকাংশ দৃশ্যগুলিই যাদুকরের অলৌকিক কৌশলের মত মনে হয়। বার্ম্মিংহাম শিল্প বিজ্ঞানের কেন্দ্র, তাই এখানকার থিয়েটারেও শিল্প বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ দেখান হয়। বার্ম্মিংহাম আমার বড় ভাল লেগেছে।

ল্যাঙ্কাসায়ার

ম্যাঞ্চেষ্টার একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প সম্বন্ধীয় নগর। তূলার কাপড় সরবরাহ কার্য্যে এই সহরটি সমগ্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। এটি ল্যাঙ্কাসায়ার নামক জেলায় অবস্থিত। কিন্তু ল্যাঙ্কাসায়ার, চেসায়ার, ডার্ব্বিসায়ার প্রভৃতি কয়েকটি জেলা নিয়েই এই ম্যাঞ্চেষ্টারের কল কারখানার প্রভাব। মাত্র এই অঞ্চলটুকু নিয়েই ইংলণ্ডের তিন ভাগের এক ভাগের উপর অর্থাৎ প্রায় দু'কোটী লোক বাস করে। এদের অধিকাংশই শিল্পকর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করে থাকে। লাঙ্কাসায়ার অঞ্চলটি বার মাসই কুয়াসায় ভরা থাকে, আর ঝিমঝিমে বৃষ্টি হয়। এই রকম হাওয়া-বৃষ্টি যুক্ত দেশ তূলার সূতা তৈরী করবার পক্ষে সুবিধাজনক অর্থাৎ বাতাসে জল থাকলে সূতার পাক আঁটে ভাল। এইরকম বৃষ্টি কুয়াসা সত্ত্বেও যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই কেবল কলকারখানায় পূর্ণ দেখা যায়।

বার্ম্মিংহাম সহরটি অতি প্রকাণ্ড। শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য বিষয়ে এটা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ছেলেদের ভূগোল শিক্ষার মানচিত্রে আমরা কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি কয়েকটি স্থান বড় বড় অক্ষরে অঙ্কিত দেখতে পাই; কিন্তু বিলাতে বার্ম্মিংহাম, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, সেফিল্ড, গ্লাসগো, বেলফাষ্ট প্রভৃতি শিল্প বাণিজ্যের স্থানগুলিই বড় বড় অক্ষরে অঙ্কিত। আমাদের দেশে শিক্ষা বলতে বি-এ, এম্-এ ডিগ্রী নেওয়া বোঝায়। বিলাতের বড় শিক্ষার বিষয়—বাণিজ্যতত্ত্ব, শিল্প, নৌবিদ্যা, খনিতত্ত্ব, কৃষি, পশুপালন, মৎস্যব্যবসায় প্রভৃতি, অর্থাৎ কেবল ভাত-কাপড়ের চিন্তা নিয়েই এদের শিক্ষাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয়।

আমার এই কথাগুলো হয়ত আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিত লোকদের

মোটেই ভাল লাগবেনা কিন্তু তথাপি আমি বলব, আমাদের দেশে যে শিক্ষার ধারা চলছে, তা জীবন ধারণের উপযোগী কোন কার্য্যকরী শিক্ষাই নয় : এমন কি, সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ল প্রভৃতি যে সব উচ্চ শিক্ষা—এগুলিও কার্য্যকরী শিক্ষার নামে একটা বিলাতী অনুকরণ মাত্র।

বিলাতে চাষবাসের জমি কম, আবশ্যক খাদ্য দেশে জন্মান সম্ভব হয় না, তাই আবার কেউ কেউ ছোটে নানা দেশে। নানা দেশ থেকে কাঁচা মাল এনে ব্যবহার্য্য দ্রব্য তৈরী ক'রে দশগুণ, বিশগুণ, শতগুণ দামে বিদেশে বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহ করে। এদের দেশের শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই এই সব শিল্প বাণিজ্য নিয়ে। চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা দেশ, এর সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগরগুলি বাণিজ্যপ্রধান আর ভিতরের নগরগুলি শিল্পপ্রধান। শিল্প বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই ইংরেজ গোটা পৃথিবীটাকে ভোগ করছে।

নবম অধ্যায়

[ওরিয়েণ্ট্ লাইনের জাহাজে]

প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প

বার্ম্মিংহামে বড়দিনের উৎসব দেখছি, এমন সময় দেশ থেকে কনিষ্ঠ সহোদরের চিঠি পেলাম—দেশে ফেরা আবশ্যক। বাস্তবিকই প্রায় একটি বৎসর সুদূর বিদেশে কাটাচ্ছি, এদিকে যতই আনন্দে থাকি না কেন, যতই অভিজ্ঞতা লাভ করি না কেন—দেশে চারদিকে ছড়ান কাজ কারবার ও আর-আর নানা দিকে আমার অভাবে অনেক ক্ষতি হচ্ছিল।

তখন আমেরিকায় ফিলাডেল্‌ফিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন চলছিল, তাতে শিল্প-বিভাগের কিছু সাহায্যের জন্য আমার ডাক পড়েছিল, এবং পৃথক ভাবে আমাদের জুয়েলারী ষ্টল করবার জন্যেও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। কিন্তু দেশে যাওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে আমেরিকায় যাওয়া ক্ষান্ত দিলাম।

দেশে ফিরতে হবে; লণ্ডনে অনেক কাজকর্ম্ম বাকী ছিল, অনেক দেখাশুনাও বাকী ছিল, তাই লণ্ডনে ফিরলাম এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে লণ্ডনের কাজকর্ম্ম শেষ করবার বন্দোবস্ত করলাম। আমি আসবার সময় সিটি লাইনে এসেছিলাম, এবার নূতন পথে আরও কিছু দেখেশুনে ফিরতে হবে—তাই ওরিয়েণ্ট লাইনের জাহাজে একটু ঘুরে যাওয়া মনস্থ করলাম। ওরিয়েণ্ট লাইনের যে জাহাজ লণ্ডন থেকে দক্ষিণ-ইয়োরোপপথে

অষ্ট্রেলিয়া যায়, সেই জাহাজে কলম্বো পর্য্যন্তের জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কিনলাম—দাম ২৮ পাউণ্ড মাত্র ; অর্থাৎ প্রায় চারি শত টাকা। তার পর কলম্বো থেকে ট্রেণে মান্দ্রাজের পথে কলকাতা যাওয়া যাবে।

লণ্ডন পরিত্যাগ

লণ্ডন, সোনার লণ্ডন, ইন্দ্রপুরীতুচ্ছকারী লণ্ডন ! সহজে মন তোমাকে ফেলে যেতে চায় না। মাত্র আর তিনটি সপ্তাহ তোমাকে দেখতে পাব ; আবার যে এ জীবনে তোমাকে দেখতে আসব, সে আশা বৃথা কল্পনা মাত্র—ভেবে বড় দুঃখ হচ্ছিল। দেখা শুনাও কত বাকী থেকে গেল—কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা দেখি, কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা কিনি। ভেবেছিলাম, একবার দূরে দরিদ্র পল্লীতে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে দু'চার সপ্তাহ বাস করে বিলাতের কৃষকজীবন ভোগ করে দেখব, সেটা আর ঘটল না—পরদিনই বাইরে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে মটর-বাসে গিয়ে কিংষ্টন অঞ্চলের কয়েকটি কৃষক পল্লী এক দিনের মধ্যে ঘুরে দেখে এলাম মাত্র। দেখলাম—বিশ-পঁচিশ ঘর কৃষক এক-একটী পল্লী করে প্রান্তর মধ্যে বাস করছে,—ছোট ছোট বাড়ী, ছোট ছোট ঘর। লাঙ্গলের জন্য ঘোড়া আছে, এ ছাড়া গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগী আমাদের দেশেরই মত। ঘর বাড়ী মোটেই নোংরা নয়।

লণ্ডনের বাকী দেখা শুনাগুলি অতি দ্রুত শেষ করলাম। ওয়েম্লীতে গিয়ে একজিবিশনের বাড়ীগুলি একদিন গিয়ে দেখে এলাম। দেখলাম যেখানে ছয়টি মাস পর্য্যন্ত কাটিয়েছি, দৈনিক তিন লক্ষ করে লোকের সমাগম দেখেছি, সেই স্থানের প্রকাণ্ড অট্টালিকাগুলি জনশূন্য

হয়ে পড়ে রয়েছে—তিন চার মাইল বেষ্টনীর অন্তর্গত সমস্ত প্রদর্শনী ক্ষেত্রটি একেবারে ফাঁকা ধূ ধূ করছে; কারণ শীতের ক'টি মাস প্রদর্শনী বন্ধ ছিল। প্রদর্শনীর কয়েকটি মনোরম দৃশ্যের ফটো নিলাম।

প্রায় একটি বৎসর লণ্ডনে বাস করে দেশী-বিদেশী যে সকল বন্ধু লাভ করেছিলাম, দু'চার দিনের মধ্যেই তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে এলাম— দু'একজন ইংরেজের সঙ্গে এতই সম্বন্ধ হয়েছিল যে, বিদায় নেবার সময় জীবনে আর দেখা হবার আশা নাই—এই কথাটা স্মরণ করে প্রাণ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিল।

৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৫) বেলা ৯টায় টিলবেরী ডক্ থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। এ সময় আমি লণ্ডনের পূর্ব্বপ্রান্তে "লিভারপুল-ষ্ট্রীট্ হোষ্টেল"টিতে বাস করছিলাম। এদিন প্রত্যূষে জিনিষ পত্র ঠিক করে ট্রেণে টিলবেরী ডকে এসে জাহাজে উঠলাম। জাহাজখানির নাম "Oronsay." এই লাইনের কয়েকখানি জাহাজের মধ্যে যে দু'খানি সব চেয়ে বড় তারই একখানা এই। অপরখানির নাম "Orama," এই দু'খানি জাহাজ একই গঠনে একই সময়ে গ্লাসগোতে প্রস্তুত হয়। একই লাইনের একই প্রকৃতির এই দু'খানিকে লোকে 'দুই বোন' বলে থাকে। এত বড় জাহাজ আমাদের কলকাতার দিকে দেখা যায় না— দীর্ঘে ছয় শত আটান্ন ফিট। প্রত্যেক খানিতে বিশ হাজার টন অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার মণ মাল ধরে। খুব বড় দু'খানির একখানি বলে আমি আগে থেকেই এই Oronsay জাহাজখানিতে যাত্রা করা মনোনীত করেছিলাম। দেখলাম, আড়াই হাজার অষ্ট্রেলিয়া যাত্রী ইংরেজে জাহাজখানি পূর্ণ হয়েছে।

টিলবেরী ডক থেকে জাহাজখানি ছাড়তেই মনে একটা বিশেষ রকম শূন্যতা অনুভব করলাম। জাহাজ সাগর অভিমুখে চলতে আরম্ভ করল,

আমার নয়ন, মন কিন্তু লণ্ডনের পানে চেয়ে রইল। বেলা ১২টায় জাহাজ সমুদ্রে এল। দেখলাম, পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত টেমসের দু' ধারে কলকারখানা প্রভৃতিতে ভরপুর।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা ডোভর্ বন্দরের নিকট দিয়ে চললাম, কিছু দূরে যেতেই সন্ধ্যায় ডোভর্ বন্দর আলোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শেষ রাত্রিতে পোর্টস্‌মাউথে জাহাজ ধরেছিল।

বিস্কে উপসাগর

পরদিন বিস্কে উপসাগরে পড়লাম। বিস্কে উপসাগরে সর্ব্বদাই পাগলা ঢেউ। সকল যাত্রীই বিস্কে উপসাগরে জাহাজের দোলানীতে কাতর হয়ে পড়েছিল। সারাদিন পর্য্যন্ত কমিবেশী ভাবে এই ঢেউয়ের দোলানী ভোগ করলাম। এর মধ্যে পাঁচ বার বমি হয়েছিল। সেদিন কিছুই খেতে রুচি হয় নি। তার পর দুই দিন পোর্টুগালের ধার দিয়ে জাহাজ চলেছিল কিন্তু তীরে জমির পাড় ব্যতীত আর বিশেষ কিছু দেখি নি। পোর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন সহর প্রায় সমুদ্রেরই তীরে অবস্থিত, কিন্তু সে স্থান রাত্রিতে কি দিনে অতিক্রম করলাম তাও বুঝি নি। জাহাজে পঁচিশ শত যাত্রী ছিল, এর দুই হাজারের উপর তৃতীয় শ্রেণীর। দ্বিতীয় শ্রেণী নাই, বাকী সব প্রথম শ্রেণীর। অধিকাংশই অষ্ট্রেলিয়া যাত্রী ইংরাজ।

আমাদের জাহাজ কুয়াসার দেশ ছেড়ে পোর্টুগাল ও স্পেনের কাছে পরিষ্কার মধুর রৌদ্রের দেশে এসে পড়তেই সমস্ত প্যাসেঞ্জার ডেকের উপর যার যার চেয়ার নিয়ে এল। তখন থেকে সারাদিন ডেকের উপরেই আমোদ আহ্লাদে কাটতে থাকল। পুরুষরা অনেকেই বই নিয়ে,

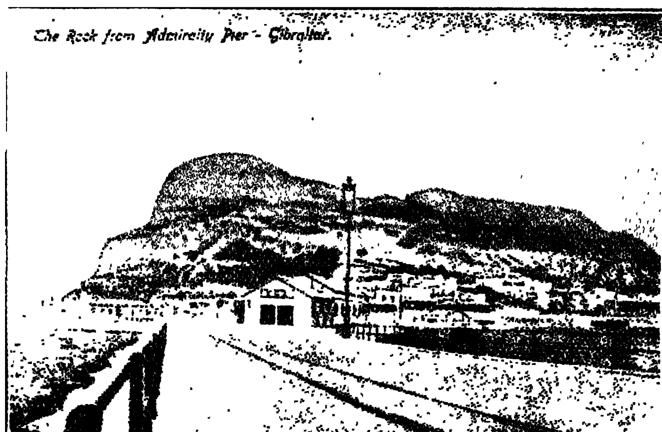
মেয়েরা কেউ বা বই, কেউ সেলাইএর কাজ নিয়ে ডেকের উপরেই রয়েছিল। ছেলে মেয়েগুলি আনন্দে সারাদিন ডেকের উপরেই নানা রকম খেলা করত।

জিব্রাল্টার (স্পেন)

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সকাল ৮ টায় জাহাজ জিব্রাল্টার বন্দরে এসে ধরল। জিব্রাল্টার স্পেনরাজ্যের অন্তর্গত ইংরাজাধিকৃত সামরিক বন্দর। পোতাশ্রয়টি পরম রমণীয়। প্রায় তিন দিকেই পাহাড়ে ঘেরা, উপরে বন্দর ক্রমে উঁচু হয়ে পাহাড়ের কটিদেশ পর্য্যন্ত উঠেছে—তার পর দুর্গ। পোতাশ্রয়টি অনেক জাহাজে পূর্ণ, তার মধ্যে দু'খানি বড় যুদ্ধ জাহাজ দেখা গেল। বহুদূর বিস্তৃত কত কি আপিস সমুদ্রের ধার দিয়ে রয়েছে।

বেলা ৮টায় প্রাতর্ভোজনের পর জাহাজের যাত্রী আমরা প্রায় সকলেই সহর দেখতে তীরে নামলাম। নেমেই আমি প্রথমে সহরের সদর রাস্তার বড় বড় দোকানগুলি দেখলাম। আগের রাত্রে জাহাজের দোলানিতে আমার ঘড়িটির কাচ ভেঙ্গে গিয়েছিল। যাবার সময় একটি দোকানে সেটি মেরামতে দিলাম, এক ঘণ্টার মধ্যেই দিতে হবে জানিয়ে গেলাম। চার্জ্জ করল এক শিলিং। দেখে শুনে ফিরবার পথে ঘড়িটি নিলাম। দেখলাম, ইউরোপের নানা জাতীয় লোকের দোকান পসার এখানে রয়েছে। ভারতীয় একটি বিরাট দোকান দেখে বড়ই আনন্দ অনুভব করলাম। স্বত্বাধিকারী বোম্বাই প্রদেশী হিন্দু। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় বেশ চলল। ভারতীয় রেশম, মহীশুরের চন্দন কাঠের দ্রব্য, কাশীর ও মোরাদাবাদের পিতলের খেলনা ও বাসন, হস্তীদন্তের ও কাল কাঠের

খেলনা, নানা প্রকারের মালা প্রভৃতিতে দোকানখানি সুসজ্জিত। কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা জিনিসপত্র বিক্রি করছেন। স্বত্বাধিকারী আমাকে চা খেতে অনুরোধ করায় আমি চা বিশেষ খাই না জানাতেই গরম দুধ ও ওখানকার লঘু খাবার কিছু আমাকে খাওয়ালেন। বিদেশে ভারতবাসীর এত বড় কাজ-করবার দেখে আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করলাম। জিব্রাল্টারে আরও কয়েকখানি ভারতবাসীর দোকান আছে।



জিব্রাল্টার

এখানে ভারতীয় লোক সংখ্যা ষাট জন মাত্র। এর বেশী ভারতীয় এখানে থাকতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন না।

তার পর পাহাড়ের উপর খানিকটা উঠে চারদিকের দৃশ্য দেখলাম। স্পেন রাজ্য—তবুও কথাবার্ত্তা করতে বিশেষ অসুবিধা নাই—কারণ অনেকেই ইংরেজী জানে। পাহাড়ের উপরেই বিখ্যাত দুর্গ, আমি দুর্গের

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে দেখে এলাম। দুর্গের উপরে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি কামান সাজান রয়েছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর এবং পশ্চিম-উত্তরে জিব্রাল্টারের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে নয়ন মন তৃপ্ত করলাম। বহু দিন পরে চক্‌চকে সূর্য্য কিরণ পেয়ে বেশ নূতন লাগল। উপর থেকে হারবারের মধ্যস্থ জাহাজ সমূহ বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাদের জাহাজখানিই ছিল সবচেয়ে বড়। পশ্চিমে অনতিদূরে Alg. ciras বন্দর দেখা যাচ্ছিল, এইখান থেকে ইউরোপের নানা দেশে রেল গিয়েছে।

পাহাড় থেকে খানিকটা নেমেই পথে আমাদের জাহাজের ইংরেজ সহযাত্রী অনেককে পাহাড়ে উঠতে দেখলাম। খানিকটা নেমে সহরে প্রবেশ করতেই দু'টি স্কুলের মেয়েকে সঙ্গী পেলাম। তারা উপরে বেড়াতে এসেছিল। জানলাম, জিব্রাল্টার ইংরেজাধিকৃত হলেও স্পেনীয়েরা স্কুলে ইংরেজী শেখে না, স্পেনীয় ভাষাই মাত্র শেখে। তাদের একটি সামান্য ইংরেজী জানে, তাই তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চলল। দেখলাম, প্রায় ইংরেজের মতই তারা অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আলাপ করল এবং পাহাড়ের আরও দু'একটা অংশ আমাকে দেখাল।

ফিরবার পথে জিব্রাল্টার বাজার দেখলাম। বাজারে অনেক প্রকার শাক তরকারী দেখা গেল, ইংলণ্ডে এমন টাট্‌কা শাক তরকারী দেখা যায় নাই। স্পেনের মিঠেকুমড়া খুব বড় আর সুমিষ্ট। আমি দোকান-দারদের কাছ থেকে খুব বড় কুমড়ার বীজ কতকগুলি কাগজে মুড়ে নিলাম।

জাহাজে ফিরতে পথে অনেক ছবির দোকান দেখলাম। স্থানীয় দৃশ্যের কার্ড কয়েকখানি কিনলাম। কয়েকটি মিশর দেশীয় লোক রাস্তায় পাথরের মালা, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি অনেক রকম জিনিস বিক্রয় করছিল,

সাহেবেরা কেউ কেউ দূরবীক্ষণ কিনলেন। মিশরীয় ঐ লোকগুলি খুবই ঠগ, বেশী দাম চায় কিন্তু অতি কমে বিক্রি করে।

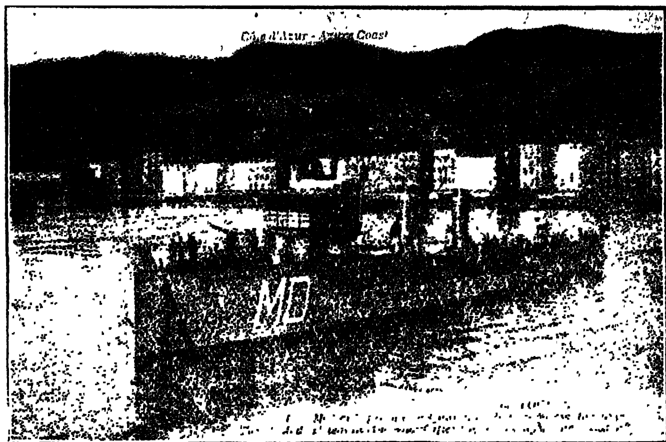
বিকাল ৪টায় জাহাজ জিব্রাল্টার থেকে ছেড়ে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করল। ক্রমে দূরে যেতে পাহাড়ের উপরকার দুর্গটিকে সীমান্ত-পথে যেন দুর্জ্জয় প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্ব্বাভিমুখে ডাইনে আফ্রিকা মহাদেশ, বামে স্পেন রাজ্য রেখে চলল।

টুলন (ফ্রান্স)

ইভিজা, মিজর্কা, মিনর্কা দ্বীপগুলি দক্ষিণে রেখে পরদিন আমরা ফরাসী রাজ্যের টুলন বন্দরে এলাম। টুলনটিও ফরাসী রাজ্যের সামরিক বন্দর। বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত রয়েছে, তিনখানা সবমেরিণ জাহাজ জলের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত যেতে দেখলাম। সবমেরিণের উপরিভাগ সামান্য মাত্র দৃষ্ট হয়, জল ভেদ করে প্রচণ্ড বেগে চলতে থাকে।

টুলন বন্দর জাহাজ নির্ম্মাণ, মৎস্য ব্যবসায়, লেস প্রস্তুত, মদ্য প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। বেলা ৯টায় বন্দর দেখতে বের হলাম। একা একা চলছি, যাকে যা জিজ্ঞাসা করি সকলেই মাথা নেড়ে কেবলমাত্র একটি "ন্যা" প্রকাশ করে, আর কোন উত্তর দিতে পারে না—অর্থাৎ একজনও ইংরেজী জানে না—সকলেই ফরাসী ভাষা বলে। ব্যাঙ্কে যাওয়া আবশ্যক ছিল, আমার Letter of Credit এর হিসাব থেকে কিছু টাকা তুল্‌তে হবে। ব্যাঙ্কের লেটার অব ক্রেডিট নিয়ম হয়ত অনেকে জানেন না। ব্যাঙ্কের হিসাব থেকে কিছু টাকা খরচ লিখে নিয়ে লেটার অফ

ক্রেডিট কিনতে হয়। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় বড় বড় যায়গার ব্যাঙ্কের যোগাযোগ থাকে। ঐ লেটার অব ক্রেডিটে খরচ লিখে নানা দেশের ঐ সকল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লওয়া যায়। আমি ব্যাঙ্কে যাবার জন্যে একটি পুলিশকে জিজ্ঞাসা করায় যখন সে কিছুই বুঝল না,

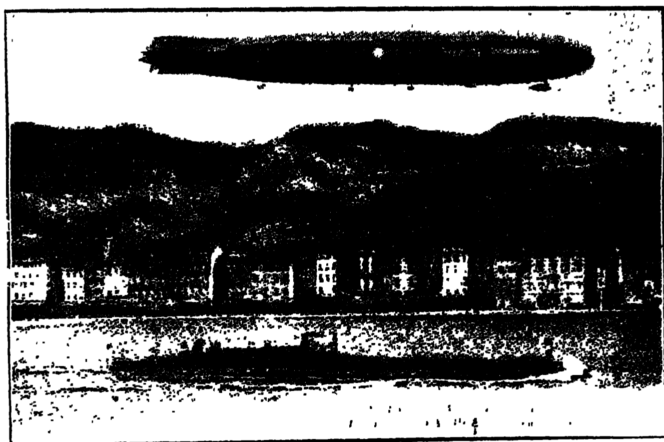


টুলনবন্দরে যুদ্ধ জাহাজ

তখন টুলনের সেই ব্যাঙ্কটির নাম লিখে দেখালাম, তখন পুলিশ আমাকে একটি ট্রামে তুলে দিল। ট্রামের কণ্ডাক্টরকে সেই ব্যাঙ্কে যাবার নাম করে একটা টিকিট দিবার জন্য একটি ছ-পেনী হাতে দিলাম কিন্তু বিলাতী টাকা ওখানে চলে না তাই কণ্ডাক্টর কিছু না নিয়েই আমাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে নামিয়ে দিল।

ট্রাম থেকে নেমে কোন্‌দিকে যাব কিছুই বুঝি না, একটু হেঁটে গিয়ে

একটা চৌমাথায় এগিয়ে দেখলাম, একটি যুবতী নানা রকমের লোজেঞ্জুস বিক্রীর জন্য রাস্তার উপর সুন্দর একখানি দোকান সাজিয়ে বসে আছে ; দোকানের জিনিসের একপাশেই একখানি কাগজের বোর্ডে লিখে রেখেছে "Engl sh spoken" অর্থাৎ ইংরেজীতে কথা কইতে পারি। দেখেই হেসে তাকে বললাম—তুমি ত ইংরেজী কইতে পার দেখছি। সেও হেসে



টুলনে টর্পেডো ও সব্‌মেরিণ

বলল—হাঁ আমি একটু ইংরেজী জানি। তখন তার কাছ থেকে টুলনের প্রধান প্রধান দেখবার বিষয় জেনে নিলাম, আর আমার ব্যাঙ্কের স্থান নির্ণয় করে নিলাম। ব্যাঙ্কে গিয়ে এক পাউণ্ড চাইতেই তারা এক পাউণ্ড মূল্যের ফরাসী মুদ্রা দিল। একশত "সেন্টিম"এ এক "ফ্রাঙ্ক", পঁচিশ ফ্রাঙ্কে এক পাউণ্ড হয়। আমি সেই English spoken এর কাছে পুনরায় ফিরে এসে দেশে নেবার জন্য নানারকমের লোজেঞ্জুস ও চক্‌লেট কিনলাম।

তারপর সহরের উত্তর প্রান্তে গিয়ে একটা পাহাড়ের গাঁয়ে কতকটা উঠে সারা সহরটির সৌন্দর্য্য দেখলাম। একটা বড় স্কুলের টিফিনের ছুটীতে অনেকগুলি ছেলে বাইরে আসতেই তাদের সঙ্গে ফরাসী দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নিলাম। তারা আমাকে পেয়ে খুব কৌতূহলের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল। টুলনের বড় থিয়েটার ঘরটি দেখলাম—বাইরেও চমৎকার সাজানো। বড় বড় চৌমাথায় মেয়ে বুরুষওয়ালী পথিক লোকের জুতা বুরুষ করছে—সে আয়োজন অতি গুরুতর। বড় টেবিলের উপর চেয়ার, সেই চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা রেখে লোকে জুতা সাফ্ করাচ্ছে, আর বুরুষকারিণী মহিলা নীচের চেয়ারে বসে পা খানি ধরে বুরুষ দিয়ে জুতা সাফ করে দিচ্ছেন! অর্থাৎ চেয়ারে বসে টেবিলে কাজ করা হচ্ছে।

মাদাগাস্কারী ভাই

পথে দু'টো কালো যুবক দেখলাম, বুঝলাম এরা ইয়োরোপীয় নয়—পরিচয়ে জানলাম, এরা ফ্রান্সের অধিকৃত মাদাগাস্কার দ্বীপের অধিবাসী ফরাসী পুলিস। মাদাগাস্কার পূর্ব্ব আফ্রিকার একটি দ্বীপ। তাদের সঙ্গে পরিচয় করতেই তারা আমার পরম আত্মীয় হয়ে দাঁড়াল। তারা আধা ইংরেজীতে আমাকে জানাল যে তারা হিন্দু, আর আমিও হিন্দু, কাজেই তারা আমার জ্ঞাতি ভাই। দু'একটা ফরাসী লোককেও ধরে শুনাল যে, দেখ আমাদের জাত ভাই দেখ এরা হিন্দু আর আমরাও হিন্দু। তারা আমাকে খুবই আদর করে সহর ঘুরিয়ে দেখাতে ইচ্ছা প্রকাশ করল, আর খুব ভাল জায়গায় নিয়ে আমাকে উপস্থিত করবে, তাতে আমার

অনেক আনন্দ হবে ইত্যাদি জানাল। তাদের "অতি ভক্তি" আমার কাছে "চোরের লক্ষণ" বলেই মনে হল। আমি তাদের কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে আমাকে কিছু খাবার কিনে খেতে হবে বলে ফিরলাম। তারা দু'জনেও আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। একটা সুসজ্জিত খাদ্য দ্রব্যের দোকানে তারা আমাকে নিয়ে গেল। বহু প্রকারের নূতন খাদ্য দ্রব্য দেখে কোনটা রেখে কোনটা কিনব ভেবে আমি একেবারে 'বাঁশ বনে ডোম কানা' হয়ে গেলাম। পরে সুন্দর অয়েল পেপারে মোড়া ভিতরে খাদ্য দ্রব্যের সবুজ আভা স্বচ্ছ কাগজের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দেখে সেই জিনিসটা ছয় আনার তুল্য ফরাসী মুদ্রা দিয়ে কিনলাম। তারপর সেই মাদাগাস্কারী জ্ঞাতি ভাইরা আমাকে একটা মদের দোকানে নিয়ে যেতে চাইল—তখন বুঝলাম আমি তাদের কতখানি জ্ঞাতি ভাই। সম্ভবতঃ তারা আমাকে আরও বেশী রকমের কুস্থানে নিয়ে যাবার মতলব করছিল। যা হোক আমি সেইখানেই তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। নূতন বিদেশী যাত্রী পেয়ে ঠকাবার চেষ্টা ইংলণ্ডে, স্কট্লণ্ডে, আয়র্লণ্ডে কখনও দেখিনি।

রকমারী

তারপর আমার নূতন রকমের খাদ্যদ্রব্যটার কাগজের মোড়ক খুলে দেখলাম, সবুজ পাতায় জড়ানো কাঁচা মাছের ডিম একজোড়া। নূতন জিনিষটি কিনে একেবারে ফেলে দিতে মন সহজে রাজী হল না, তাই পকেটে রেখে দিলাম। পরে এক ফাঁকা যায়গায় দেখলাম, একটি দোকানে চেষ্টনাট্ নামে কাঁঠাল বীজের মত একপ্রকার জিনিস বালিতে ভেজে বিক্রী

করছে ; আমি সেই দোকানদারটাকে বললাম—আমার এই ডিম জোড়াটি তোমার ঐ বালিতে ভেজে দেবে ? সে তাতে অস্বীকার জানাল। ইংরেজদের দেশে হলে কিন্তু ইংরেজ আমার এই অভদ্রোচিত অনুরোধটুকু রক্ষা করতে পরাঙ্মুখ হত না। দেখলাম—ইংরেজ জাত থেকে ফরাসীর পার্থক্য।

সন্ধ্যার আগেই জাহাজের দিকে ফিরলাম—সমুদ্রের দিকে হারবারে এসেই দেখলাম, তীরভূমি অতি সুন্দররূপে বাঁধা। তীরে একটি ফরাসী বীরের সুশোভন প্রস্তর মূর্ত্তি সাগরমুখী হ'য়ে দণ্ডয়মান রয়েছে। পরে সারি সারি রেষ্টুরেণ্ট হারবারের কূলে মনোহর ভাবে সজ্জিত রয়েছে দেখলাম। বহু পরিমাণ রবারের গাছ তীরে সাজান রয়েছে। সন্ধ্যায় জাহাজের নিকটে এসে আমার ফরাসী মুদ্রাগুলির দু'চারটি নমুনা রেখে বাকিগুলি মণিচেঞ্জারের নিকট থেকে ইংরাজী মুদ্রায় বদলি করে নিলাম। সামান্য কিছু কমিশন নিল।

আমাদের জাহাজে উঠবার খেয়া নৌকাখানির জন্য আধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল, এই অবকাশে একটি যুবতী নানারকম কেক বিস্কুট নিয়ে আমাদের কাছে বিক্রী করতে এল। এসময় আমাদের জাহাজের অনেক যাত্রীই পার ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছিল। মেয়েটির আধা ইংরেজী রসিকতার চোটেই অনেকে তার কেক্ বিস্কুট কিনতে বাধ্য হয়েছিল। আমি যে নিতান্ত নীরস মানুষ, আমিও তার রসে একটু দ্রবীভূত হয়ে তার কিছু বিস্কুট কিনেছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা জাহাজে পৌছলাম। সেদিনকার রকমারী কথার আর একটু বাকী রাখি কেন ? সেই কাঁচা মাছের ডিম জোড়াটির কথা। জাহাজে খাবার জিনিসের অভাব নাই, তবু মনের ঔৎসুক্য রইল, সেই ডিম জোড়াটির স্বাদ গ্রহণের জন্য। জাহাজে যাত্রীদের জন্য উনানের কোন ব্যবস্থা নাই,

আগুন জ্বালবারও হুকুম নাই। তখন স্নানের ঘরে গিয়ে রুমালে ঐ ডিম মুড়ে বাষ্পযুক্ত প্রবল গরম জলের কলের মুখে বেঁধে কল খুলে দিলাম। পনর মিনিট মধ্যেই সুসিদ্ধ হয়ে গেল, অধিকন্তু সেই লোণা ডিমের তীব্র লবণত্ব ধুয়ে গিয়ে একটু মধুর হল। ডিম খেয়ে দেখলাম, আমাদের দেশের মাছের ডিমের মত সুস্বাদু নয়, যা হোক খাওয়া গেল।

সেই রাত্রেই জাহাজ ছেড়ে দিল। পরদিন সমস্ত দিন সাগর-পথেই চলে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোরে ইটালীর অন্তর্গত বিখ্যাত আগ্নেয় পর্ব্বত বিষুবিয়স দেখা গেল। এই বিষুবিয়সের পাদমূলে ভূমধ্য সাগরের একটি খাঁড়ীর মধ্যেই নেপলস্ বন্দর। জাহাজ নেপল্‌সে পৌঁছবার বিশ মাইল দূর থেকেই বিষুবিয়স পর্ব্বতের ধূমোদ্গীরণ দেখা যাচ্ছিল।

বিষুবিয়স ও পম্পী *

৩রা জুন (১৯২৫) সকাল ৭টায় ইটালীদেশের নেপলস্ (Naples) বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়ল। যাত্রীরা সব পূর্ব্ব হতেই সহর দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ৮টার সময় প্রাতর্ভোজন শেষ করে আমরা প্রায় ৯০০ যাত্রী সহর দেখবার জন্য জাহাজ থেকে নাবলাম। যাত্রীদের অনেকের সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে ছিল, তারা খুবই স্ফূর্ত্তির সহিত নামতে

* আমি পম্পী নগরে যাই নাই। আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান অতুলচন্দ্র পরবর্ত্তী বৎসর বিলাত যাত্রাকালে উহা দেখিয়াছে। বিষুবিয়স ও পম্পী, পম্পীর কথা ও পম্পীর ধ্বংসাবশেষ—এই তিনটি অংশ তাহারই লিখিত। উপযোগীতার হিসাবে বিষয়টি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।—আমার নেপলস্ দর্শনের বিবরণ ২২৭ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ।—গ্রন্থকার

লাগল। যাত্রীদের মধ্যে কেউ সহর, কেউ নেপলসের মিউজিয়াম, কেউ বিষুবিয়স আগ্নেয়গিরির উপরিভাগ, কেউ বা ভূগর্ভোত্থিত পম্পী (Pompie) সহর দেখত মনস্থ করেছিল।

নেপলস্ সহরটি সমুদ্রের কিনারা হতে আরম্ভ করে ক্রমে উচ্চ হয়ে পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত অবস্থিত। খুব উচ্চ স্থানের তিন-চারতলা বাড়ীগুলি সমুদ্রতীর হতে ছোট ছোট তাসের ঘরের মত দেখা যাচ্ছিল। নেপল্‌সের এই পোতাশ্রয় (Harbour)টির তিনদিকে ক্রমোচ্চ বিস্তীর্ণ পাহাড়ের গায়ে সহরের সৌধশ্রেণী, আর দক্ষিণদিকে ধূ ধূ সমুদ্র। পূর্ব্বদিকে বিষুবিয়স আগ্নেয়গিরির শীর্ষদেশ হতে অনর্গল শ্বেত ও ধূসর বর্ণের ধূম্ররাশি নির্গত হয়ে মেঘের মত চলে যেতে দেখছিলাম। শুনলাম, কোন কোন সময় বিষুবিয়সের শিখরদেশ দিয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বের হয়ে পর্ব্বতোপরিস্থিত নীলাকাশ অগ্নিবর্ণ করে তোলে। এই বিরাট আগ্নেয়গিরিই একদিন বহু ধনজনপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী পম্পী সহরটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল—সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন, মূল্যবান রত্নরাজি এবং বহু পরিশ্রম-কৃত ইটালীর অমর কীর্ত্তিসমূহ লুপ্ত করে দিয়েছিল।

আমরা তিনজন বাংলাদেশের যাত্রী ইংলণ্ডে চলছি। তিন জনই হিন্দু। অপর তুইজন—ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা আর সুরেন্দ্রনাথ দাস, ঢাকা; আমরা তিনজনেই পম্পী দেখতে মনস্থ করেছিলাম। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের আরও আট-নয় জন ভারতীয় যাত্রী ছিলেন, তাঁরা সকলেই বড়লোকের ছেলে, কাজেই পম্পী সহর দেখবার জন্য তাঁরা জাহাজ ভিড়বার এক দিন পূর্ব্বেই টমাস কুক (Thomas Cook) কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে Wireless যোগে বন্দোবস্ত করেছিলেন। টমাস কুক উপযুক্ত অর্থ নিয়ে মোটর গাড়ী, গাইড (পাণ্ডা), মধ্যাহ্ন-ভোজন ও চা. প্রভৃতির ব্যবস্থা করে থাকেন। ধীরেনবাবু ও

হরেনবাবু এই কোম্পানীর তত্ত্বে পম্পী দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে আমি অমত প্রকাশ করে তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম যে, কোন নূতন স্থান দেখতে হলে নিজেদের তত্ত্বে দেখা শুনাই ভাল, তাতে আনন্দও প্রচুর হয় এবং নিজেদের অভিজ্ঞতাও অনেক বেড়ে যায়, এটা আমি দাদার কাছে শিখে ভালরূপই হৃদয়ঙ্গম করেছি। এতে তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। আমরা নিজেদের তত্ত্বেই সহর দেখব স্থির করে জাহাজ হতে নামলাম। কলম্বো হতে ৪৫৯০ মাইল এসে এই ইউরোপখণ্ডে প্রথম পদার্পণ করলাম।

জাহাজ-ঘাটেই কয়েকটি টাকা পয়সা বদল করবার আপিস (Exchange Office) আছে। দেশ হতে যে নোট ও টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম, কলম্বোয় জাহাজে উঠবার সময় সেগুলি বদল করে ইংলণ্ড-দেশের পাউণ্ড, শিলিং, পেনী করে নিয়েছিলাম। ইটালীদেশে ইটালীয় মুদ্রার আবশ্যকে এখান হতে ১০ শিলিংএর বদল নিলাম। হিসাবমত ১০ শিলিংএ ইটালীয় মুদ্রা ৬০ লেরা (Lera) স্থলে ৫৫ লেরা পেলাম। ৫ লেরা তারা লাভ করল। এক একটি লেরা আমাদের দেশের আধুলীর মত, নিকেলে তৈরী। ৫ লেরার নোটগুলি প্রায় এক টাকার নোটের মত। তিনজনেই কিছু কিছু ইংলিশমুদ্রার পরিবর্ত্তে ইটালীয় মুদ্রা নিয়ে রাস্তায় বের হলাম। ক্ষণকালের মধ্যেই কয়েকটি গাইড্ জুটল। প্রত্যে-কেই বলতে লাগল—“আমি খুব কম ব্যয়ে আপনাদিগকে ভাল করে সব দেখিয়ে শুনিয়ে আনব।” এতে বেশ একটু গোলমাল হয়ে উঠছিল, তখনই একজন সশস্ত্র ইটালীয় পুলিস আমাদের নিকট এসে ভদ্র-ভাবে ইংরাজীভাষায় বলল—“আপনারা অনুগ্রহ করে এখানে গোলমাল করবেন না, রাস্তায় গিয়ে আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা বলুন।” আমাদের পূর্ব্ব হতেই ঠিক ছিল যে, আপাততঃ কোন গাইডের সাহায্য নেব না; কারণ আমি দাদার মুখে এই সকল দেশে বিদেশীদের অনেক লাঞ্ছনার বিবরণ

ইতিপূর্ব্বে শুনেছিলাম। পথে কয়েকটি ভদ্রলোকের নিকট পম্পী যাবার পথ এবং আমাদের আবশ্যকীয় অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করে নিলাম। ইটালীর শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য ইংরেজী জানে, তাই কোনমতে কথাবার্ত্তা চলে। শুনলাম, পম্পী যাবার ট্রেণ ধরবার ষ্টেশন প্রায় এক মাইল দূরে। জাহাজ হতে নামবার সময় সিঁড়ির সম্মুখে খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখে এসেছি—"যাত্রিগণকে বিকাল ৬টার মধ্যে জাহাজে ফিরবার জন্য বিশেষভাবে জানান যাচ্ছে। অন্যথায় জাহাজ ফেল করলে কোম্পানী দায়ী নয়।" কাজেই সময় আমাদের খুব সংক্ষেপ। অল্প সময়ে ষ্টেশনে পৌঁছবার জন্য একখানা ফিটন গাড়ী ১০ লেরা ভাড়ায় ঠিক করলাম। এখানকার গাড়োয়ানেরা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পোষাক-পরিচ্ছদও তাদের বেশ কিটফাট্।

বেলা ১০টার সময় ষ্টেশনে পৌঁছলাম। ১১টার সময় ট্রেণ ছাড়বে। এই এক ঘণ্টা সময় বৃথা বসে না থেকে নিকটবর্ত্তী স্থান দেখতে বের হলাম। ষ্টেশনের নিকটেই ইটালীদেশ সম্বন্ধীয় অনেক ছবি ও নানা বিষয়ের রাশি রাশি বই কিনতে পাওয়া যায়। আমরা কয়েকখানি বই কিনলাম। রাস্তায় কর্ম্মশীল লোকজন অনবরত দ্রুত-পদক্ষেপে যাতায়াত করছে। অনেকে আমাদের কৃষ্ণবর্ণ চেহারার পানে বেশ একটু স্থিরদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। রাস্তার দু'ধারে আমাদের কলকাতার মতই বড় বড় বাড়ী—কতক পাথরের, কতক বা ইটের। পাহাড়ের উপর সহর, কাজেই রাস্তাগুলি পাথরের। কলকাতার মত সোজা রাস্তা নয়। দোকানগুলি বেশ সুন্দর সাজান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এদেশের লোকের গায়ের রং ফর্সা, কিঞ্চিৎ রক্তাভ। চুল, ভ্রূ, চোখের তারা সাহেবদের মত ধূসর বর্ণের নয়, অনেকটা আমাদের বাঙ্গালীর মতই কালো। মেয়েরা এখানকার রাস্তাঘাটে অবাধে গতিবিধি করে। তিন-চারটে করে মেয়ে চামড়ার

ব্যাগের ভিতর পুস্তকাদি নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দ্রুতপদে বিদ্যালয়ে চলছে দেখলাম। অন্যান্য কর্ম্মশীলা মেয়েরাও বেশ সচ্ছল গতিতে আপন আপন কাজে যাতায়াত করছে। মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ মোটেই এলো-মেলো নয়, বেশ আঁটসাঁট। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও স্বাধীন দেশ দেখি নাই; স্বাধীন দেশের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুক্ত প্রাণের পরিচয় কখন পাই নাই; শিশুকাল হতে তারা যে কিরূপ স্বাধীন চিন্তার ভিতর দিয়ে বড় হতে থাকে, তাও কখন অনুভব করি নাই। তাই এই ইটালীবাসীদের কাজকর্ম্ম, গতিবিধি সবই আমার কাছে বড় নূতন রকমেরই লাগছিল।

দেখতে দেখতে একঘণ্টা কেটে গেল। যথাসময়ে ষ্টেশনে গিয়ে প্রতি-জনে ৮ লেরা ১০ সেণ্ট দিয়ে এক একখানি যাতায়াতের টিকিট কিনলাম; ২০।২২ ফিট নিম্নগামী সিঁড়ি দিয়ে প্লাটফরমে পৌঁছতেই ট্রেণ এসে পড়ল। আমরা ট্রেণে চেপে পম্পী অভিমুখে যাত্রা করলাম। তখন বেশ একটু গরম বোধ হচ্ছিল, ইউরোপ শীতের দেশ হলেও শীতের তুলনায় ইটালীটাই একটু গরম। জ্যৈষ্ঠ মাস, তাই মাঝে মাঝে বাতাস এসে বেশ আরাম দিচ্ছিল। এদেশের গাড়ীগুলি যদিও আমাদের দেশের Broad Gaugeএর গাড়ীর অপেক্ষা একটু ছোট, তবু আমাদের দেশের মত চাপা-চাপি করে বসতে হয় না, এবং তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীগুলি আমাদের দেশের তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা অনেক ভাল। ট্রেণ ছাড়বার ৩।৪ মিনিট পরেই প্রত্যেক কামরায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা হল এবং অল্প পরেই গাড়ীখানি একটি অন্ধকার সুড়ঙ্গের (Tunnel) মধ্যে প্রবেশ করে খানিকটা গিয়ে পুনরায় মুক্ত জায়গায় বের হল। খানিক দূর যাবার পর একটি বক্রস্থানে গিয়ে গাড়ীখানি খুব বেঁকে চলল। এখানি বৈদ্যুতিক এঞ্জিনের ট্রেণ। কলকাতার ট্রামলাইনের মত উপরে বৈদ্যুতিক তারের

সঙ্গে গাড়ীর সংযোগ আছে, নীচের লাইন ঠিক ট্রেণের লাইনেরই মত।

গাড়ীতে পথের দুই ধারের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখে বড়ই আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। ক্রমাগত দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকাশ্রেণী—সব গুলিই সুন্দর সুন্দর ফুলভরা লতাপাতা ও গাছ দিয়ে সাজানো। প্রাচীর, গৃহ সবই পাথরে তৈরী। কিছুদূর গিয়ে পথের দুইধারে সতেজ শাক-সব্জির ক্ষেত, আর বাগানের শ্রেণী ; এই সব ক্ষেত ও বাগানে এক ভুট্টা গাছ ব্যতীত আর কোন গাছই চিনলাম না। মেয়েরা আঁটসাঁট পোষাক পরে এই সব ক্ষেত ও বাগানে কাজ করছে। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে তাদের ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, কেঁউ কেউ বা ধবধবে সাদা বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে। বাগানের কাজকর্ম্ম করতে মেয়েদেরই বেশী দেখলাম, পুরুষ ক্কচিৎ কোন স্থানে দেখা গেল। পাহাড়ী পথ—ট্রেণ খুব এঁকে বেঁকে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ফাঁকে কখন সমুদ্র, কখন নেপলস্ সহর, কখনও সধূম বিষুবিয়স শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। যখন পাহাড়ের গা দিয়ে ট্রেণ চলছিল তখন পাহাড়ের গভীর নিম্নদেশ দেখে প্রাণে একটা আতঙ্ক হচ্ছিল, পাছে ট্রেণখানা গড়িয়ে পড়ে। এই দেখি বিষুবিয়স্ বামদিকে, পরক্ষণেই দেখা গেল ডানদিকে। এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে একঘণ্টা পঁচিশ মিনিটে আমরা পম্পী ষ্টেশনে পৌছলাম। নেপলস্ হতে পম্পী ১৫ মাইল দূরে। পাহাড়ে' উঁচু-নীচু আঁকাবাঁকা পথ বলে এই ১৫ মাইল পথ আসতেই এত সময় কেটে গেল।

পম্পীর কথা

পম্পী ষ্টেশনটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বহু যাত্রী এই ষ্টেশনে নামল, অধিকাংশই আমাদেরই জাহাজের সহযাত্রী। একজন গাইড্ আমাদের সঙ্গ ধরল, লোকটি বড় সাদাসিদে, আমাদের অল্প সময় মধ্যে অনেক দেখে নিতে হবে, তাই এবার তাকে নিয়ে একখানা ফিটন গাড়ীতে উঠলাম।

প্রথমে একটি নবনির্ম্মিত সহরের প্রশস্ত পথ দিয়ে খানিক গিয়ে একটি গির্জ্জার নিকট আমাদের গাড়ী থামল। বাইরে থেকে গির্জ্জাটির বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না—একটি প্রকাণ্ড সাদাসিদে বাড়ী বা একটি বিরাট বাড়ীর ঢাকনার মত দেখা গেল। দরজায় দুইজন বন্দুকধারী পাহারা-ওয়ালা। ভিতরে প্রবেশ করলাম, প্রবেশ করে যা দেখলাম তা এখন আমার নিকট স্বপ্নের মতই বোধ হয়। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, ভাস্কর্য্য, চিত্র ও স্থপতিবিদ্যায় ইটালীই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, এখন তা স্বচক্ষে দেখে নয়ন মন চরিতার্থ করলাম। গির্জ্জাটি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়েছে—কিন্তু দেখে মনে হয় যেন সদ্য প্রস্তুত। নিখুঁত শ্বেত পাথরে নানাবিধ মনোরম কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি খোদিত করে গির্জ্জাটি প্রস্তুত হয়েছে। প্রস্তর-প্রাচীরের উজ্জ্বল আভায় ভিতরটি ঝক্‌মক্ করছিল।

আমরা চারদিক দেখে ভিতরের দিকে একটু অগ্রসর হলাম। দেখলাম প্রায় ৪০।৫০ জন নরনারী মাথা নীচু করে নীরবে প্রার্থনা করছেন। ভিতরে প্রবেশ করবার অবাধ আদেশ আছে। ভিতরে গিয়ে সম্মুখে বেদীর উপর মাতৃক্রোড়ে শিশু খৃষ্টমূর্ত্তি—শরীর দিয়ে যেন আলোক-ছটা বের হচ্ছে। মূর্ত্তিটি অনেকগুলি মণিমাণিক্য দ্বারা সজ্জিত। ঐ সকল মণিমাণিক্যের মূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। আমি যদিও

একজন জুয়েলার হিসাবে দু'একখানা দামী পাথর দেখেছি তথাপি ঐ সকল রত্নরাজির গুরুত্ব নিজ অভিজ্ঞতার ফলে বুঝতে একটুও দাবী করতে পারি না ; গাইড্ আমাদিগকে কিছু কিছু বুঝিয়ে দিল। বড় বড় মুক্তায় গাঁথা একগাছা মালা ব্যতীত বিশেষ কিছুই চিনলাম না। মুগ্ধনেত্রে খানিকক্ষণ দেখে আমরা অন্য একটি ঘরে প্রবেশ করলাম। এখানেও একটি খৃষ্ট মূর্ত্তি রয়েছে। কয়েকটি স্ত্রীপুরুষকে করযোড়ে উপাসনায় নিযুক্ত দেখলাম ; তাঁদের দু'এক জনের চখে জল ঝরছিল।

তারপর আমরা আর একটি প্রকাণ্ড ঘরে প্রবেশ করলাম। তার মধ্যস্থলেও শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটি ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টমূর্ত্তি—রক্তাক্ত দেহ। আমি কোন দিনই যীশুখৃষ্টের ভক্ত নই, তথাপি এই মূর্ত্তিটি দেখে কেন যে আমার চোখ ছল ছল করছিল তা জানি না। ধবধবে সাদা পোষাক-পরা একটি শান্তমূর্ত্তি স্ত্রীলোক স্থিরভাবে উপবেশন করে কতকগুলি ফুল নিয়ে হিন্দুদের দেবপূজার ন্যায় শুদ্ধান্তঃকরণে এক একটি করে ফুল খৃষ্টের পদতলে প্রদান করছিলেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর পূজা দেখছিলাম। ফুল দেওয়া শেষ করে তিনি হিন্দুদেরই মত ভক্তিভরে একটি প্রণাম করলেন। আমিও কেন যেন মনে মনে খৃষ্টের চরণোদ্দেশে অন্তরের প্রণতি জ্ঞাপন করলাম।

এর পর আমরা অপর একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম। সে ঘরটির মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক, কতক বিক্রয়ের জন্য, কতক বা বিতরণের জন্য সজ্জিত রয়েছে। এই ঘরে আমাদের নাম ধাম লিখে দিতে হল। একজন মৃদুভাষী ধর্ম্মপ্রাণ বৃদ্ধ কয়েকখানি ধর্ম্মপুস্তক, নিকেলের খৃষ্টমূর্ত্তি, সুন্দর তিনখানি লকেট এবং খৃষ্টের কতকগুলি ছোট ছোট ছবি আমাদের দেবার জন্য এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনারা কি রোম্যান ক্যাথলিক?" আমরা বললাম "না, আমরা ভারতীয় হিন্দু।" উত্তর শুনে বৃদ্ধ একটু

বিষণ্ণভাবে মাটীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমাদের গাইড (পাণ্ডা) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করল—"আপনারা ধর্ম্মমন্দিরকে বিশ্বাস করেন?" আমরা বললাম—"বিশ্বাস করি।" কথাটি শুনবামাত্র বৃদ্ধ খুব আনন্দে মুখ তুললেন এবং আমাদের বই, লকেট ও ছবি দিয়ে অনুনয় বিনয় সহকারে অভ্যর্থনা করলেন।

সময় সংক্ষেপ বলে এখানেই আমাদের গির্জ্জা দর্শন শেষ করতে হল। অতঃপর আমরা পুনরায় সেই গাড়ীতেই পম্পী অভিমুখে রওনা হলাম। তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ষোড়শোপচারে বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুরের পূজা করি আমরা, কিন্তু ঠাকুরের কৃপা ভোগ করছে এই সব দেশের লোক। অল্পক্ষণের ভিতরই পম্পী সহরের সামুদ্রিক দ্বারে (Marine Gate) উপস্থিত হলাম। সহরে প্রবেশ করবার জন্য আমাদের ছয় লেরা (বার-আনা) দিয়ে টিকিট করতে হল।

পম্পীর ধ্বংসাবশেষ

বহুকাল পূর্ব্বে এই পম্পী সহর একটি সুবৃহৎ নগর ছিল, তখনকার আমলে ইউরোপে যতগুলি প্রধান স্থান ছিল তন্মধ্যে এই পম্পী একটী বৃহৎ ও পুরাতন নগর। বন্দরটীর একদিকে সমুদ্র ও অপরদিকে ১০।১২ মাইল দূরে বিষুবিয়স পর্ব্বত। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-জন, শিল্প, সৌন্দর্য্য, বিদ্যালয়, শিক্ষালয় প্রভৃতির গৌরবে এবং নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে এদেশ সর্ব্বদা ভরপুর থাকত। তখন কেউ ভাবতেও পারে নি যে, এই সুবৃহৎ সহরটী একদিন ধনে প্রাণে সর্ব্বসমেত ধ্বংস হয়ে যাবে, চিহ্নটী পর্য্যন্ত লুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে।

খৃষ্টের মৃত্যুর ৭৯ বৎসর পরে, অকস্মাৎ বিষুবিয়স-শিখর হতে ভীষণ ভাবে ধূম, অগ্নি, নানাবিধ গলিত ধাতু নির্গত হওয়ায় অতি অল্প সময় মধ্যে ঐ পর্ব্বতের পাশের বহু দূর ব্যাপী স্থান এরূপ ভাবে চাপা পড়ে যে, বড় বড় অট্টালিকা ও বৃক্ষাদি প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে ঐ স্থান চাপা পড়েছিল যে বহু স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা জীবজন্তু এক সঙ্গে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায়। পরে ঐ সকল স্থান ক্রমে ক্রমে বৃক্ষাদিপূর্ণ স্বাভাবিক স্থানের মত হয়ে যায়।

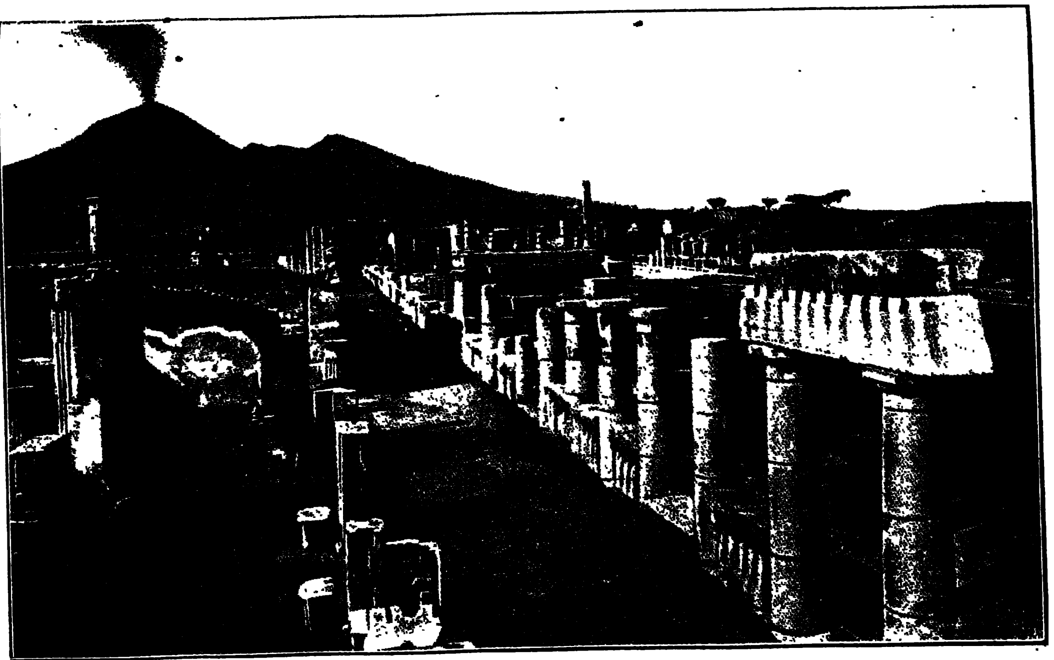
পম্পী ধ্বংস হবার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, ক্রমে ঐ সহরের অবস্থান প্রভৃতির বিষয় লোকে বিস্মৃত হতে থাকে এবং ক্রমে একেবারে ভুলে যায়। এইরূপে ১৬ শত বৎসর পরে বারবণের রাজা ৩য় চার্লস্ প্রাচীন তত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্যে এবং উৎসাহে সেই বিস্তীর্ণ স্থান সমূহ থেকে সন্ধান করে পম্পী নগরটীর স্থান নির্দ্দেশ করে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অনেক নীচে প্রাচীন সহর পম্পীর নিদর্শন দেখতে পান।

তারপর বহু বর্ষ ধরে বহু লোক বহু অর্থ ব্যয়ে সহরটী খুঁড়ে বার করায় প্রায় ৪ হাজার বৎসর আগেকার কীর্ত্তিসমূহ বর্ত্তমানে মানবগণের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পূর্ব্বে রোমানদের সহর নির্ম্মাণ কার্য্য কিরূপ ছিল তা এই সহরটি দেখলে অনেকটা অনুমান করা যায়।

এই ভূগর্ভোত্থিত সহরে প্রবেশ করে যা যা দেখলাম নিম্নে তার কিছু কিছু উল্লেখ করছি। মেরিণো গেট নামক সহরের প্রধান দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেই প্রথমে নজর পড়ে—

(১) মিউজিয়ম ;—এই মিউজিয়মে সেই পূর্ব্বকালের পম্পী সহরের গৃহ-ব্যবহার্য্য জিনিস, পোষাক পরিচ্ছদ, ও ধ্বংসীভূত মানবের কঙ্কালরাশি অতি যত্নে সাজান আছে।

(২) Amphi Theatre ;—কুড়িহাজার দর্শক বসবার উপযুক্ত



ধ্বংসীভূত পম্পীর একাংশ—দূরে বিষুবিয়সের ধূমোদ্গারণ দেখা যাইতেছে।

করে গোলাকারে প্রস্তুত। এই স্থানে পূর্ব্বে বন্য সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে এ দেশের শক্তিমান অস্ত্র ক্রীড়কদের যুদ্ধ দেখান হত।

(৩) School of the Gladiators ;—অস্ত্র বিদ্যালয় ও সৈন্যাগার। এটি একটি বিরাট অট্টালিকা। এর ভেতরে প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র এবং নরকঙ্কাল সজ্জিত রয়েছে।

(৪) টেম্পল অফ্ ফরচুন ;—(Temple of Fortune) মারকাস্ টুলিয়াস্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পর্ব্বের সময় এখানে খুব আমোদ প্রমোদ হত।

(৫) টেম্পল অফ্ ভেনাস ;—(Temple of Venus) এই মন্দিরটি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত ভেনাসের নামে উৎসর্গীকৃত। বর্ত্তমানে অনেকগুলি ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক এখানে নানাবিধ ব্যায়াম চর্চ্চা করে।

(৬) টেম্পল অফ্ জুপিটার ;—(Temple of Jupiter)। রোমানদিগের অতি প্রাচীন মন্দির। এখানে জুপিটার, মিনার্ভা ও জুলিয়াস্—এই তিনজন স্বর্গীয় দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল।

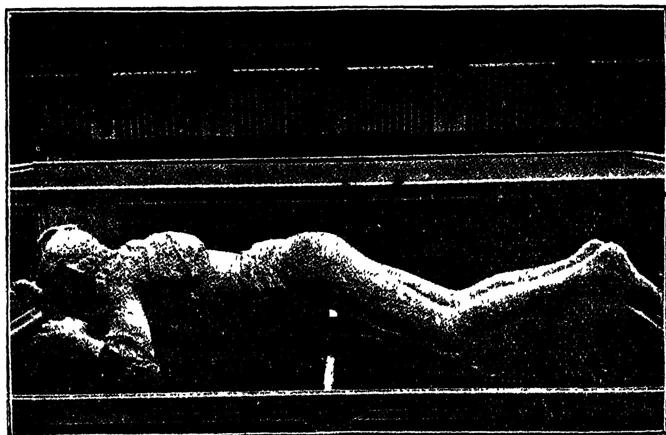
(৭) ব্যাসিলিকা ;—(Basilica)। প্রাচীন মনোরম মন্দির।

(৮) ট্রাজিক থিয়েটার ;—(Tragic Theatre) পাঁচ হাজার লোক বসবার উপযুক্ত স্থান সমেত একটি থিয়েটার বাড়ী। গ্রীষ্মকালে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি দ্বারা বাড়ীটিকে ঠাণ্ডা করে দর্শকদের আরামের ব্যবস্থা করা হত।

(৯) হাউস অফ্ দি প্লেয়ার্স ;—সুন্দর সুন্দর চিত্র, ব্রোঞ্জের ও শ্বেত প্রস্তরের মূল্যবান মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত। এই বাড়ীটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। দেখলে বিগত যুগের পম্পীর অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।

ধ্বংসীভূত অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই প্রস্তরে প্রস্তুত। অধিকাংশ বাড়ীর ছাতই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাস্তাগুলিও প্রস্তর নির্ম্মিত, বেশী প্রশস্ত

নহে। ফুটপাথগুলি কলকাতার ফুটপাথের অপেক্ষা অনেক উঁচু। রাস্তার দু'ধারে জল রাখবার পাথরের ট্যাঙ্ক এবং স্নানের জন্য সরকারী স্নানাগার। অনেক স্থানে ঔষধের দোকান, মদের দোকান এবং মদ তৈয়ারী করা ভাঁটীগুলির চিহ্ন রয়েছে। সহরের সর্ব্বস্থান হতেই বিসুবিয়স্-শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল।



চার হাজার বৎসরের নরকঙ্কাল প্রস্তরে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

অপরাহ্ন ৩॥০ টার সময় দেখাশুনা শেষ করে পাণ্ডার প্রাপ্য দিয়ে ট্রেণ ধরবার জন্য আবার ষ্টেশনে যাত্রা করলাম। ষ্টেশনের পথে একজন লোক পম্পীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গলিত ধাতু (Lava) সংলগ্ন একখণ্ড লৌহ আমাদের নিকট বিক্রয় করল, আমরা সামান্য মূল্য দিয়ে তা ক্রয় করলাম। অল্পকাল পরেই আমরা ট্রেণ ধরে পুনরায় নেপলস্ অভিমুখে রওনা হলাম।

নেপলসে পৌঁছে আমাদের ইচ্ছা হল, হেঁটে একটু সহরটি দেখে যাব। একটি বড় রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। পথে এক বৃদ্ধার দোকান হতে একটি মণিব্যাগ ও একটি লোহার তালা কিনলাম। রাস্তার দু'ধারে খাবারের দোকান প্রচুর। 'ম্যাকরণি' (ময়দায় প্রস্তুত) ইটালীর একটি প্রধান খাদ্য। ফলমূলও এখানে যথেষ্ট মেলে। অনেক হোটেলের সাইনবোর্ড রাস্তার ফুটপাথের উপরে ঝোলান, তার পিছনে একটি ঘণ্টা ঠং ঠং করে বেজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নেপলস্ সহরে বিদেশী লোক দেখলে অসৎ আমোদপ্রমোদের জন্য প্রলুব্ধ করবার অনেক লোক আছে। আমাদেরও একবার এরূপ কয়েকটি লোকের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল; তাদের সে চেষ্টা অবশ্য বিফল হয়েছিল।

রাস্তায় চলতে চলতে আমরা অনেকদূর গিয়ে পড়েছিলাম, জাহাজ-ঘাটের রাস্তা কোন্ দিকে ঠিক করতে না পারায় একজন পুলিশকে ঘাটের পথের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। পুলিশটি আমাদের আকার-ইঙ্গিতেই বুঝেছিল যে আমরা পথহারা হয়েছি। যথেষ্ট সম্মান ও ভদ্রতার সঙ্গে সে আমাদের গন্তব্য পথ বেশ করে বুঝিয়ে দিল। আমরা তার কথামত ঠিকঠাক জাহাজে উপনীত হলাম। ক্ষুধায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছিল, সুখের বিষয় জাহাজে পৌঁছবার অল্প পরেই চা খাওয়ার ঘণ্টা বাজল। চা-এর সঙ্গে জলযোগটি বেশ উত্তমরূপে সম্পন্ন করে উপরতলের ডেকের উপর একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসে যাত্রীদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। আবার আমাদের বিশাল জাহাজখানি সমুদ্রবক্ষে গা ভাসিয়ে দিল।

নেপল্‌স্‌

ফ্রান্সের টুলন সহর থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাহাজ ছেড়ে ১৫ই তারিখে ভোরে আমরা ইটালীর কাছে এসেছি। জাহাজ ক্রমে এগুতেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিষুবিয়স পর্ব্বত ও তার পাদমূলে রমণীয় নেপল্‌স্‌ বন্দরটি ফুটে উঠলো। ক্রমে আমরা ছোট্ট উপসাগরটির মধ্যে



নেপল্‌স্‌ বন্দর

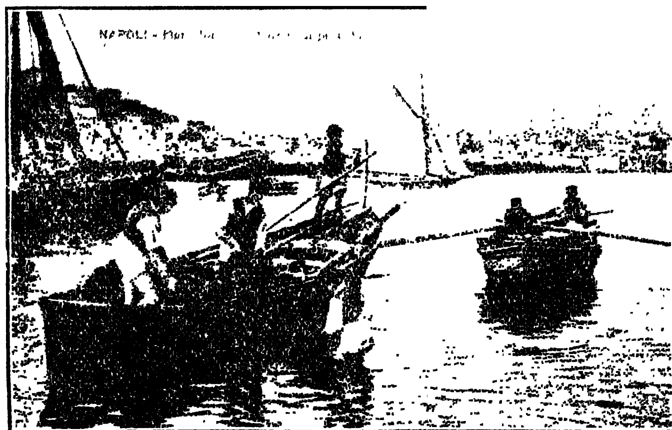
প্রবেশ করলাম। এটি আট-দশ মাইল পরিধি বেষ্টিত ভূমধ্যসাগরের অংশ। এই বৃহদায়তন জলাশয়টির তিন দিক বেষ্টন করে এই নেপল্‌স্‌ বন্দর। এই ঘন সন্নিবদ্ধ সহরের বেষ্টনী আবার ক্রমে পর্ব্বতের গায়ে ঊর্দ্ধগামী হয়েছে। সকলের শেষে বিরাট বিষুবিয়সের শীর্ষদেশ আকাশ

ছেয়ে ধূম উদ্গীরণ করছে। পাঠক একবার ক্ষণকাল এ দৃশ্যটি চিন্তা করুন। জাহাজ ক্রমে তীরে আস্তে সবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সকাল ৯টায় প্রাতর্ভোজন শেষ করতেই জাহাজ তীরে বাঁধা হল।

সকাল ১০টায় নেপলস্ সহর দেখ্তে বের হলাম। বিদেশে একা বেড়াতে আমি ভালবাসি ; কারণ আমার রকমারি দেখাশুনার দৌরাত্ম্যের ভাগী হবার মত লোক মেলে না। আমি যে রাস্তাটি ধরে চললাম, সেটি অতি প্রশস্ত আর সেটাই সহরে প্রবেশের মুখপাত। প্রথমে সহর দেখানো পাণ্ডাদের, তারপর ঘোড়ার গাড়ীওয়ালাদের দৌরাত্ম্যের হাত কোনমতে কাটিয়ে এসে পড়লাম রাস্তার দু'ধারের ফেরিওয়ালাদের দৌরাত্ম্যের মধ্যে। নেপল্‌সে নানা দেশের যাত্রীর জাহাজ ধরে, কাজেই রাস্তার দু'ধার দিয়ে ফেরিওয়ালার সংখ্যা খুবই বেশী। বিক্রির জিনিসের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ছবি, ছুরি, পুতুল, খেলনা, ময়দার তৈরী দেশের বিভিন্ন রকমের খাবার— এই সবই বেশী। আমার সহর দেখ্তেই মন, তাই কোন জিনিসই না কিনে বরাবর সুপ্রশস্ত বহুল জনাকীর্ণ রাস্তাটি ধরেই চল্‌লাম।

একটি সুন্দরী, মুখখানি তার কমনীয় বালিকার মত, আমার অতি নিকটে এসে জানাল—একবার তার গৃহখানিতে পদার্পণ করতে হবে! আমি প্রথমে কিছুই বুঝলাম না ; আবার সে বলল, ঐ-যে আমার গৃহখানি দেখা যাচ্ছে—চলুন আমার বাড়ীতে। আমি বললাম—কেন? সে বলল, একটু আনন্দ দান করতে চাই আপনাকে, আমি নাচগান করব, আপনি দেখে খুসী হবেন। সে আধা ইংরাজিতে কথা বলছিল কিন্তু তার সরলতা আর অমায়িকতার কোন বৈলক্ষণ্য বুঝতে পারিনি। আমাদের দেশে আমরা যাকে গণিকা বলি, এ তাদের মতই একজন। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেই সে বলল, কেন যাবেন না? আমি বললাম —আমি তোমার এ সকল প্রস্তাব ঘৃণা করি ; আমি তোমায় আমার

ভগ্নীর মতই দেখতে চাই। সে বলল—হাঁ ভগ্নীর মতই দেখবেন—আসুন। নিকটেই একটা ইটালীয় পুলিশ দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমাদের এ রঙ্গ দেখছিল, সে কাউকে কিছু বলবার প্রয়োজন মনে করল না। সুন্দরী কথা কইতে কইতে একেবারে আপন প্রিয়জনের মত আমার কাঁধের উপর তার সুকোমল হাতখানি দিয়ে দাঁড়াল। আমি যেমন নূতনত্বপ্রিয়, তাতে তার এই নূতন রকমের আকর্ষণের একটা সঙ্গত সীমা



ইটালীর জেলে

পর্য্যন্ত উপভোগ করছিলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে, বিশেষতঃ একটা অসতী মেয়ের সঙ্গে এতটা ভাল নয়। তখনই ছুটে পালিয়ে গন্তব্যপথাভিমুখে চললাম।

খুব আঁটা সহরের মধ্যে এসে পড়েছি, এখন কোথায় যাব কিছু ঠিক হচ্ছে না, লোককে জিজ্ঞাসা করেও কোন ফল নাই, কারণ তারা কথা

বোঝে না। নিকটেই দেখলাম মাছ তরকারীর বাজার, তখন বাজার প্রায় ভেঙ্গে গেছে। অনেক সন্ধানের পরে এক জেলে দোকানদারকে পেলাম অতি ভাঙ্গা ইংরাজি জানা। তাকে দিয়ে সহরের প্রধান প্রধান দেখ্‌বার জিনিষগুলো বুঝে নিলাম। প্রথমেই ডাকঘরের খবর নিয়ে চিঠি দিতে গেলাম। একটা সতর আঠার বছরের যুবক এসে আমায় পরিষ্কার ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করল—আপনি বিদেশী বোধ হয়? তাকে পেয়ে প্রাণভরে কথা বলে নিলাম। সে আমার সঙ্গে ডাকঘরে গেল এবং ইটালীয় ষ্ট্যাম্প কিনে চিঠিগুলো পোষ্ট করে দিল। জাহাজ-ঘাটা থেকে ইটালীয় টাকা পয়সা কিনে এনেছি। ডাকঘরের কাজ শেষ করে দিয়েও সে আমার সঙ্গে চলল। পরিচয়ে জানলাম, আমেরিকার ক্যানাডায় তার বাড়ী, চিত্র বিদ্যা শিখ্‌বার জন্যে এদেশে এসে একটা কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। অযাচিতভাবে আমার সঙ্গে চলতে দেখে আমি তাকে বললাম, তোমার কাছে আমি খুবই সাহায্য পাচ্ছি বটে, কিন্তু তুমি আমার কাছে কিছু পয়সা কড়ি আশা কর না ত? সে একটা 'না' উত্তর দিয়েই অন্য কথা কইতে চলল। সহরের অনেক নূতন কথা আমাকে শোনাল। আমি আবার তাকে বললাম, তোমাকে কিছুই দেব না জেনো কিন্তু। সে বলল, বিদেশী ভ্রমণকারীরা আমায় কিছু কিছু দিয়ে থাকে; আপনাকে সহরের অনেক স্থান দেখাব, আপনি কি কিছুই দেবেন না? আমি বললাম, না কিছুই দেব না। সে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিয়ে পরে আবার বলল, একটু মদের দোকানে যাবেন কি? আমি বললাম, 'না'। সে যখন আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই পেল না, তখন অন্ততঃ পক্ষে বোধ হয় একটু মদ খাওয়ার ভাগী হতে আশা করছিল। সে আধঘণ্টা কাল একটা বিদেশী লোকের বেগার দিয়ে কিছু না পেয়েও খুসি হয়ে বিদায় নিল দেখে আমি তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম।

তারপর আমি সহরের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রস্তর মূর্ত্তির বেদীতে বসে বিশ্রামের সঙ্গে দূরে পর্ব্বতমালা সমাকীর্ণ রমণীয় প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিলাম, একটি বেঁটে লোক এসে আমায় বল্‌ল, এখানে বসে রয়েছ কেন? আমি বললাম, সহর দেখে এসে বিশ্রাম করছি। সে সহরের দু'একটা নূতন কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় কুৎসিৎ প্রলোভনের গল্প তুলল। সহজেই বুঝলাম, সে এই সম্বন্ধে একটি পাকা



ইটালীর ম্যাকরণী নামক খাদ্য প্রস্তুত

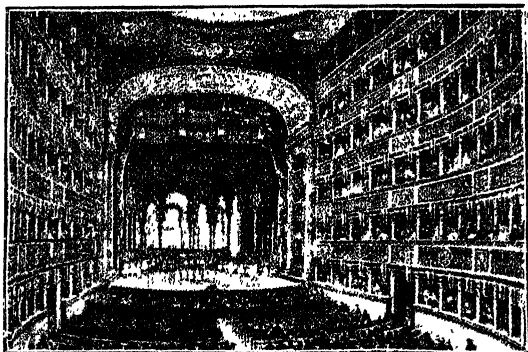
দালাল। এই দালালটির সে সব কথা আমি কাউকে শোনাতে পারবো না। ভাবলাম, এই নেপল্‌স্ কী বিশ্রী সহর। তারপর একটা নামজাদা খাবারের দোকানে গিয়ে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াটা সম্পন্ন করলাম। ইটালীর ময়দায় প্রস্তুত নানা প্রকার খাদ্য খুবই প্রসিদ্ধ। আমি হোটেলের কর্ত্তাকে জানালাম,—তোমাদের বিশেষ বিশেষ খাবারের জিনিষগুলোরও কিছু কিছু আমায় দাও। তারা কয়েক প্রকার পিষ্টক আমাকে খেতে দিল।

দেখ্‌লাম, বিলাতি কেকের চেয়ে এগুলি আমাদের মুখ রুচির অনুকূল। হোটেল ওয়ালা ভাল ইংরাজি না জানলেও এমনই একটু বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে আমাকে খাওয়াল, যাতে কোন অসুবিধা ত হলই না বরং খেয়ে বেশ তৃপ্তি হল। খাওয়ায় খরচ হল প্রায় তিন টাকা।

তারপর এখানকার প্রধান প্রধান দেখবার বিষয় কিছু কিছু দেখলাম। এস্, কার্লো থিয়েটার পৃথিবীর মধ্যে একটি নাম করা রঙ্গালয়। এর অভ্যন্তরটি অতি বিশালায়তন ও মনোরম। রোম ষ্ট্রীট্‌টি সবচেয়ে জমকালো রাস্তা। এখানকার টাউনহল, মিউজিয়াম, প্রধান বিচারালয় প্রভৃতি দেখলাম। সহরটি খুবই আমোদ প্রমোদে পরিপূর্ণ, তা এই একটি দিন ঘুরে দেখেই বোঝা গেল। ফিরবার পথে কতকগুলি দেশীয় বিস্কুট আর স্থানীয় দৃশ্যের সুন্দর সুন্দর ছবি কিনলাম। চিত্র শিল্পে আর স্থাপত্য বিদ্যায় ইটালী প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। সন্ধ্যার আগেই জাহাজঘাটে ফিরলাম। সমুদ্র ধারে আমাদের জাহাজ ঘাটায় আস্‌তে ভুলক্রমে দূরে সমুদ্র তীরে গিয়ে উঠলাম। যখন ঘড়ি দেখে জানলাম, আমাদের জাহাজ ঘাট এখনও অনেক দূরে আছে অথচ একঘণ্টা পরেই জাহাজ ছাড়বে, তখন প্রাণটা বড় চিন্তাকুল হয়ে পড়ল। সমুদ্রের তীরে তীরে দ্রুত চললাম খানিকটা এসে ঘোড়াগাড়ীর আড্ডা দেখতে পেলাম। আমাদের জাহাজ ঘাটার নাম ধরে তাদের কাছে দূরত্ব জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল, আমাদের গাড়ীতে এস পৌছিয়ে দেবো, কিন্তু পুনরায় দূরত্ব জিজ্ঞাসা করতেও ঐ কথাই বলল। আমি বরাবর দ্রুত ছুটে এসে জাহাজ ধরলাম—দেখলাম, জাহাজে সিঁড়ি তোলবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। জাহাজে উঠতেই ১৫ মিনিট পরে জাহাজ ছেড়ে দিল : তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

জাহাজখানি একটু দূরে আসতেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে

নেপল্‌স্‌ সহরের আলোকরাজি একটি একটি নক্ষত্রের পর্ব্বতমালা হয়ে ফুটে উঠলো। জাহাজের সমস্ত যাত্রীই আমরা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সেই আলোকের স্তূপ দেখছিলাম। ক্রমে ভূমধ্যসাগরের গভীর জলরাশির মধ্যে এসে পড়লাম। চারদিকে অনন্তব্যাপী অন্ধকার, দূরে সেই আলোকের



এস্‌, কার্লো থিয়েটার হলের অভ্যন্তর

পর্ব্বত মালাটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রাণের আনন্দকে জাগিয়ে রেখে ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। আজ ইয়োরোপের স্থলভাগ থেকে বিদায় নিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন

এরপর আমরা ক্রমাগত তিনটি দিন ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে চললাম, আজ দুই সপ্তাহ জাহাজে উঠেছি; একের পর আর একটি করে নূতন সহর, নূতন দৃশ্য আমাদের মনকে এমনই অভিভূত করে রেখেছে যে, দেশের দিকে চলেছি বলে মনেই হচ্ছিল না—যেন সমুদ্র পথে দেশ ভ্রমণই করছি।

এইবার আমরা আমাদের দেশের দিকে চলেছি। পার্শ্ববর্ত্তী কাণ্ডিয়া, রোডস্, সাইপ্রস (কুপ্র) দ্বীপগুলি এবং ইটালি, গ্রীস, ডামাস্কাস্, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলগুলি আমরা বাঁয়ে রেখে ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে চলছিলাম। ভূমধ্যসাগরের এই অংশ দিয়ে চলবার পথে কটা দিন জাহাজে সেণ্টপল্সের ধর্ম্মপ্রচার যাত্রা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এই অঞ্চলেই তিনি অতি দুঃখ কষ্টে কাটিয়ে সেই সেকালের নৌকার মত জাহাজে চড়ে খৃষ্টের বার্ত্তা প্রচার করেছিলেন। তাঁর তিনবারের প্রচার যাত্রার বিবরণ মানুষের কর্ত্তব্যের আকাঙ্খাকে প্রবুদ্ধ করে তোলে।

এর পরে আমরা পোর্ট-সৈয়দে এলাম। সেই সেবার যাত্রাকালে কত ভয়ে ভয়ে পোর্টসৈয়দে নেমেছিলাম, আর এখানকার ঠগদের হাতে কতই না নাকাল হয়েছিলাম কিন্তু এবার পোর্ট-সৈয়দে নাম্‌তে সে ভয় একটুও মনে এল না।

এর পর আমরা সেই আসবার বেলার পথ সুয়েজখাল, লোহিত সাগর হয়ে ভারত মহাসাগরে পড়লাম। এবার এডেন দেখা গেল না কিন্তু ডাইনে আফ্রিকার সোমালী উপকূলভাগ দূর থেকে কিছু কিছু দেখা গেল। এরপর আরব সাগর বাঁয়ে রেখে আমরা ভারত মহাসাগর দিয়ে কলম্বোর দিকে চললাম। এইবার গরম দেশে এসে পড়া গেল। প্রকাণ্ড বড় জাহাজখানি, প্রায় সমস্ত দিনই আমরা এ সময় ডেকের উপর খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদে কাটাতাম। প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে ডেকের উপর নাচের ধূম লেগে যেত। ৫০।৬০টি ইটালী ও গ্রীস দেশীয় স্ত্রী-পুরুষ অষ্ট্রেলিয়া যাত্রী নেপল্স্ থেকে উঠেছে। তাদের একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক আর বারো বছরের একটি মেয়ে মাত্র ইংরাজী জানে। আমাদের ক্যাবিনে ৪টি সিট ছিল, তার একটিতে চীনে, একটিতে ইংরেজ আর একটি এল এক ইটালীয়ান। এই শেষোক্তটির সঙ্গে কথা কইতে কেবল

হাত মুখ নেড়ে প্রকাশ করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। ইংরাজী সে একটুও বুঝত না।

ইটালীর নাচ বড়ই নূতন রকমের। ইংরাজের থিয়েটারের নাচে রকমারি আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ নাচঘরের নাচ তাদের বড়ই একঘেয়ে ধরণের। কিন্তু ইটালীর নাচ সর্ব্বত্রই নূতনত্বে পরিপূর্ণ। জাহাজে কোন



ইটালীর নাচ

কোন দিন ইটালীয়দের নাচ হত, সেদিন বিরাট ডেকটি দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। জাহাজে বিভিন্ন রকমের কনসার্ট, বিভিন্ন রকমের বায়স্কোপ প্রভৃতিও এক একদিন হত। বায়স্কোপে অষ্ট্রেলিয়ার চিত্রাবলীই বেশী দেখতাম।

পূর্ব্বেই বলেছি, জাহাজখানি অষ্ট্রেলিয়ায় চলেছে। অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ অধিবাসীই ইংরেজ। এদের অনেকের সঙ্গেই বড় প্রীতি জন্মে-

ছিল। সারাদিন অষ্ট্রেলিয়ার নূতন নূতন কথা শুনতাম। ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া যেতে যতটা পথ, ভারতবর্ষ থেকে অষ্ট্রেলিয়া যেতে তার তিন ভাগের এক ভাগেরও কম পথ। অষ্ট্রেলিয়ার লোক সংখ্যা সমগ্র গ্রেট বৃটনের লোক সংখ্যার আটভাগের একভাগ কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া দেশ গ্রেট-বৃটনের ২৪গুণ বড়। এই যে আমাদের বাড়ীর নিকট এতবড় অষ্ট্রেলিয়া দেশটি, এর বিশেষ কোন সংবাদই আমরা রাখি না। অষ্ট্রেলিয়ার সম্যক বিবরণ আমাদের জানা একান্ত কর্ত্তব্য।

২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সকালে আমাদের জাহাজ কলম্বো. পৌছল। আমি সকালের আহার শেষ করে কলম্বো নেমে জাহাজখানি হতে বিদায় নিলাম। কলম্বোতে আমি আটদিন ছিলাম এবং ঐ কয়েক দিনই কোন না কোন একটি বিশেষ বিষয় দেখতাম। এরপর সিংহলের মাঝ দিয়ে বরাবর ট্রেণে এসে তালাইমান্নার নামক স্থানে নেমে জাহাজে পার হয়ে একটি বৎসর পরে ভারতবর্ষে পদার্পণ করলাম। ভারতভূমিতে পদার্পণ করতেই সে কী আনন্দ!

এরপর ট্রেনে এক একটি দিন রামেশ্বর, মাদুরা, ত্রিচিনাপলী, শ্রীরঙ্গপত্তন, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানগুলিতে নেমে ভারত গৌরব দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মন্দিরগুলি দর্শন করলাম। পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীতে স্নান করে অনেক-দিন পরে স্নানের পবিত্রতা অনুভব করলাম। এরপর তিনটি দিন মান্দ্রাজে ছিলাম। তারপর ১১ই মার্চ্চ তারিখে কলকাতা হয়ে ২০শে মার্চ্চ (১৯২৫) তারিখে যশোহর জেলাস্থ আমার চিরপ্রিয় বাসভবন বাটাজোড় গ্রামে পৌঁছলাম। এদিন গ্রামে যুবক ছেলেদের আমোদ উৎসবের ও সভাসমিতির মধ্যে বিপুল অভ্যর্থনার কথা বাদ দিয়ে একটি কথা আমার মনে বড় হয়ে জেগে আছে—গ্রামের পথে যাত্রাকালে গ্রামের ছোটবড় মা-লক্ষ্মীরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে আমার মঙ্গল

কামনা করেছিলেন, মাথায় ধান দূর্ব্বা দিয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। মা-লক্ষ্মীদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে নিয়েই জীবনপথে চলেছি।

আমার বিলাত ভ্রমণ এখানেই শেষ হল। জানিনা, জীবনের যাত্রা-পথে আর কতকাল ভ্রমণ করতে হবে। শ্রীভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা—যেন সম্মুখের বাকি পথটুকু ভালয় ভালয় কাটাতে পারি।

* * *

ভ্রমণ ত শেষ হল, এখন বিলাতের আর কয়েকটি কথা বলে গ্রন্থ শেষ করব।

দশম অধ্যায়

[আমার অভিজ্ঞতা]

দৈনন্দিন জীবন

Dainandi Jiboni.

আমি বিলাতের পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ-জীবনে যে সব কাজকর্ম্ম দেখেছি, তার কিছু কিছু এখানে বলব।

বিলাতে গৃহিণীরা সাধারণতঃ সকাল ৬টায় ঘুম থেকে উঠে ৮টার ভিতর প্রাতঃকালের সামান্য খাবার প্রস্তুত করে। ছেলে মেয়ে এবং পুরুষেরা ৭টায় উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ৮টা থেকে ৯টার ভিতর পরিবারস্থ সকলে একত্র হয়ে এক টেবিলে প্রাতর্ভোজন সম্পন্ন করে। কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে সব জায়গাতেই এদের কাজের সময়গুলি ঠিক-ঠাক বাঁধা বাঁধি আছে। গৃহিণী ঠিক ৮টায় আহার তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে রেখেই ছোট একটী ঘণ্টায় টুন্ টুন্ করে শব্দ করে, তৎক্ষণাৎ যে যেখানে যে কাজেই থাকুক, এসে খাবার টেবিলে যার যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে। সকালের খাবার—সাধারণতঃ পরিজ (Porridge) অর্থাৎ ওট সিদ্ধ এক ছটাক আন্দাজ সামান্য দুধ ও চিনি মিশ্রিত করে খায়; সামান্য রুটী মাখন ও এক পেয়ালা চা ঐ সঙ্গে খায়। একটু অবস্থাপন্ন ঘরে তার সঙ্গে আধসিদ্ধ ডিম, Bacon অর্থাৎ আধ ভাজা শূকরমাংসের পাতলা এক

টুক্‌রা খায়। সকালকার সেই খাওয়াটী যেমন সামান্য রকম হয় তাকে আমাদের দেশে আমরা সিকিপেট খাওয়া বলতে পারি। খাবার সময় সকলেই কাঁটা, চামচ, ছুরি ব্যবহার করে, এতে খাবার জিনিষ হাতে ঠোঁটে মোটেই লাগে না। ছোট ছেলে মেয়েদের খাবার সময় বুকের উপর গলার সঙ্গে ছোট একটু রুমাল বেঁধে দেওয়া হয়, সামান্য খাদ্যদ্রব্য পড়লে সেই রুমালের উপর দিয়েই পড়ে, গায়ের জামা কাপড়ে লাগতে পারে না। ১৫ মিনিট মধ্যেই সকলে এক সঙ্গে এই সকালের আহার শেষ করে, পরে যে যার কাজে যায়।

৯টার পর পুরুষেরা কাজে যায়, ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায়। গৃহিণীরা এঁটো বাসনগুলি জলের টবে ফেলে ভিজিয়ে, খাবার টেবিলের কাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করে রেখে নিজের কাজে যায়। আর আর সকলে দৈনিক খবরের কাগজ পড়ার কাজটী সকালের আহারের পূর্ব্বেই শেষ করে ফেলে, গৃহিণীরা প্রায়ই কাগজ পড়বার সময় পান না। তাঁরা ৯টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর মুলতবী কাজ, অর্থাৎ জামা কাপড় সেলাই বা পরিষ্কার করা, ঘর পরিষ্কার করা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকেন, এর মাঝে একটু সময় করে খবরের কাগজাদি দেখেন।

গৃহিণীরা ঠিক ১২টা থেকে ১টার মধ্যে মধ্যাহ্নের আহার রন্ধন করে ঠিক ১টায় আবার আহারের ঘণ্টা দেন। এর আগেই যেখানকার যে এসে বাড়ীতে হাজির থাকে, খাবারের ঘণ্টা পড়লেই আবার যার যার স্থানে ঠিক হয়ে আহারে বসে। গৃহিণীরা কিছু কিছু খাবার প্রত্যেক ডিসে পরিবেশন করেন, পরবর্ত্তী খাবারের জিনিষগুলি টেবিলের মাঝখানে রাখেন। মধ্যাহ্নের আহার সাধারণতঃ প্রথমে সুপ অর্থাৎ সামান্য মাংস সিদ্ধ অথবা তরকারীর ঝোল। পরে পাউরুটীর সঙ্গে সিদ্ধ আলু, কপি, সিম প্রভৃতি কোন একটা তরকারী, কিছু সিদ্ধ মাংস বা ভাজা মাছ। তার পরে একটু

মিষ্টান্ন চাল বা ময়দার সঙ্গে সামান্য দুধ চিনি মিশ্রিত করে তৈরী করা। সকলের শেষে কিছু ফল ও কিছু বাদাম খাওয়ার রীতি আছে।

মধ্যাহ্নের আহার সাধারণতঃ আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়, আর বারো আনা রকম পেট ভরা খাওয়া হয়। আমাদের দেশে যেমন ষোল-আনা পেট পুরে খায়, বিলাতে তেমন কখনও কেউ খায় না। ভাল ভাল নিমন্ত্রণেও ঠিক রোজকার বাঁধাবাধি পরিমাণে খাওয়ার ব্যবস্থা। খাদ্য দ্রব্যগুলি প্রস্তুতে স্বাস্থ্যের দিকে যতটা লক্ষ্য রাখা হয়—স্বাদের দিকে ততটা লক্ষ্য রাখা হয় না। মসলাদির ব্যবহার এরা মোটেই করে না, তবে খাবার সময় লবণ, গোল মরিচের গুড়া, সরিষার গুড়া প্রভৃতি অতি সামান্য মিশ্রিত করে খায়। আহারের বস্তু স্ত্রীলোকদিগকে আগে পরিবেশন ক'রে তারপর পুরুষ-দের পরিবেশন করা হয় এবং স্ত্রীলোকে খাওয়া শেষ করে না উঠলে পুরুষের উঠা রীতি বিরুদ্ধ।

ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুল সকালে ৯টা থেকে ১২টা; পরে তারা বাড়ী এসে মধ্যাহ্নের আহার সম্পন্ন করে ও খানিকটা ঘরে বসে খেলাধূলা করে, তারপরে ২টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা আবার স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করে আসে।

বিকাল ৫টায় সকলে জলযোগ করে। এ সময় চা, কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি খাওয়ার ব্যবস্থা। বিকাল ৫টার পর স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা প্রায় সকলেই একটু বাইরে বেড়াতে বা পরিশ্রমের খেলা করতে বের হয়। ছেলে মেয়ে থেকে বুড়ো বুড়ী পর্য্যন্ত সকলেই একটু পরিশ্রমজনক খেলা-ধূলা করে' বেশ আনন্দে কাটায়। সহরে সর্ব্বত্রই চমৎকার খেলবার পার্ক আছে, গ্রীষ্মকালে এই সব পার্কের স্থানে স্থানে নানারকম লতা, পাতা, ফুলে অতি মনোরম শোভা ধারণ করে। গ্রীষ্মকালে পার্কগুলি লোকে লোকারণ্য হয়। আমি বনজঙ্গল বা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন বাড়ী

ঘর আছে কি না খুঁজতাম, পল্লীগ্রামে অনেক দূরে যেতাম কিন্তু কোনখানেই তেমন দেখতে পাই নাই, সব যায়গাতেই অতি সুন্দর সাজানো বাগান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর বাড়ী।

রাত্রি ৮টার আহারের বন্দোবস্ত সাধারণতঃ মধ্যাহ্নের মতই। গরীবেরা মাংসের সঙ্গে চাল, যব বা ওট্ মিশ্রিত সিদ্ধ খায়। এর সঙ্গে সামান্য নুণ ঝাল ব্যবহার করে, যারা একটু ভাল বন্দোবস্তে খায়, তাদের প্রত্যেক বারের খাবারের সময়ই টেবিলে জ্যাম, জেলী (আচার বা চাটনী), ভিনিগার (এক রকম টক্ জল) প্রভৃতি সাজানো থাকে, ইচ্ছামত কখন কখন ব্যবহার করে।

বিলাতের বড়লোকদের আহারের বন্দোবস্ত ঠিক এই মতই, তবে কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি জিনিসপত্র ও কৌটায় পোরা নানা রকম খাদ্য কিছু কিছু এর সঙ্গে খান।

রাত্রির আহারের পর ছেলে মেয়েরা ঘণ্টাখানেক পড়াশুনা করে। মেয়েরা কখন কখন পিয়ানোর সঙ্গে সঙ্গীতাদি করে। ছোট বড় প্রায় সকল ঘরেই এক একটা পিয়ানো আছে। সাধারণ গৃহস্থের ঘরের পিয়ানো একটার দাম কমবেশী এক হাজার টাকা।

ছেলে মেয়েরা রাত্রি ১০টায় এবং বয়স্কেরা ১১টায় নিদ্রা যায়। প্রত্যেকের পৃথক অপ্রশস্ত লোহার খাটে বিছানা। প্রসূতি শিশুকে পর্য্যন্ত পৃথক খাটে পৃথক বিছানায় রাখে। ছোট ছেলেরা ক্বচিৎ এক বিছানায় দুইজন শয়ন করে। শীতের ছয়মাস সব ঘরেই সব সময় আগুন জ্বালা থাকে, ঘরের মেঝেয়, দেওয়ালের গায়ে আগুনের জন্য স্বতন্ত্র রকমের স্থান প্রস্তুত আছে। স্কট্‌লণ্ডে খুব বেশী শীত, সেখানে শীতের দিনে বিছানার মধ্যে গরম জলের বোতল বা ব্যাগ ব্যবহার করে। স্কট্‌লণ্ডে শীতকালে কোন গৃহস্থ ৭টায়, কোন গৃহস্থ বা ৮টায় ঘুম থেকে ওঠে।

পারিবারিক রীতি নীতি

সহরে ঘর গরম রাখবার জন্য গরম জলের ষ্টিম গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক তাপের বহু রকম ব্যবহার আছে। রান্না গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে সম্পন্ন হয়। পল্লীগ্রামে কয়লার আগুনের ব্যবহারই বেশী, কোথাও গ্যাসের বন্দোবস্ত আছে। আয়র্লণ্ডের পল্লীগ্রামে দেখেছি—সাধারণ অবস্থার গৃহস্থেরা ঘরের উত্তাপের জন্য যে কয়লার আগুন ব্যবহার করে, সেই আগুনের উপরেই রান্নার অনেক কাজ সম্পন্ন হয়।

সকল বাড়ীতেই সর্ব্বদা গরম জলের বন্দোবস্ত থাকে, বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া সবই মেয়েরা গরম জলে সম্পন্ন করে। খাবার পরেই এঁটো বাসনগুলি ঠাণ্ডা জলের টবে ভিজিয়ে রাখে, তারপর সময়মত একটা হাতল দিয়ে জলের ভিতর বাসনগুলি তোলপাড় করে চিমটা দিয়ে তুলে পরিষ্কার গরম জলের পাত্রের মধ্যে দু'তিন মিনিট রেখে দেয়। পরে তুলে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে জল মুছে আগুনের উত্তাপের উপর বাসন রাখবার যে লোহার শিকের রেক আছে, সেখানে রেখে দেয়। খাবার বাসনগুলি সবই এনামেল মাটীর তৈরী, তাই খুব সহজেই পরিষ্কার হয়।

কাপড় পরিষ্কারের জন্যও বিশেষ জল ঘাঁটাঘাঁটির দরকার হয় না। কাপড়গুলি আগের দিন ক্ষার জলে একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখে, সেই পাত্রটী এমন ভাবে তৈরী যে, একটা হাতল ঘুরালেই জল ও কাপড় একসঙ্গে পাত্রের ভিতর তোলপাড় হতে থাকে। ৫।৭ মিনিট হাতল ঘুরাবার পর কাপড়গুলি অন্য একটী পরিষ্কার জলপাত্রে ফেলে ধুয়ে তোলে। অনেক ঘরেই কাপড় নিংড়াবার কাঠের রোলার আছে, ঘুরালেই দু'টা বেলুনের চাপে প্রায় সমস্ত জল নিংড়িয়ে যায়। আমরা যে ভাবে জোরে আঘাত

করে কাপড় কাচি, আর জোরে মুষড়ে নিংড়াই, তাতে কাপড়ের শীঘ্রই পরমায়ু ক্ষয় হয়, কিন্তু এই সব উপায়ে কাচায় কাপড় দীর্ঘকাল টেকে।

বিলাতের লোকেরা সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার কেউ বা দু'সপ্তাহে একবার মাত্র স্নান করে। স্নান করা মানে সাবান দিয়ে সব গা-মাথা পরিষ্কার করা। গরম জল ভিন্ন স্নানের উপায় নাই, তাই আবদ্ধ ঘরের মধ্যে লম্বা টবের ভিতর গরম জলে স্নান করে। শীতের দেশ বলেই রোজ রোজ স্নান করা পছন্দ করে না।

বিলাতের সন্তানপালন-পদ্ধতি বাস্তবিকই আমাদের শিখবার বিষয়। আমি মাত্র একটা কথা এখানে উল্লেখ করব। একটী বৎসর পর্য্যন্ত নানা স্থানের ইংরেজদের সঙ্গে বাস করেছি। রোজ রোজ কত ছেলে মেয়ে মায়ের তত্ত্বাবধানে দেখেছি, এর মধ্যে কোন মাকে ছেলেমেয়েদিগকে মারতে বা কোন বেশী শাস্তি দিতে দেখি নাই—গায়ে হাত তুলতেও দেখি নাই। একটা দিন মাত্র একটী শিশুকে তার মা ঠোনা মেরেছিল দেখেছিলাম, শিশুটি কেঁদে ফেলেছিল, ছেলেমেয়ে না-মারার দেশে হঠাৎ সেদিন মারতে দেখে আমার প্রাণে বেদনা লেগেছিল। মাত্র একটী দিন দেখেছি বলেই কথাটার উল্লেখ করলাম। ছেলে-পিলেকে এরা মোটেই মারধর করে না, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেয়; ছেলেমেয়েরাও সারাদিন ছুটাছুটী করে কিন্তু কেউ দুরন্তপনা, মারামারি বা ঝগড়া করে না। বিলাতে ঝগড়া-ঝাটী বিশেষ দেখি নাই।

বিলাতে প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া শিখান হয় একথা পূর্ব্বে আরও বলেছি। স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য নানাপ্রকার আমোদজনক উপায় আছে, শিশুরা কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে খেলার সঙ্গে নানা রকম শিক্ষা পায়। তারপর তাদিগকে ম্যাজিক লণ্ঠন, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখান ও নানাস্থানে ভ্রমণ দ্বারা প্রচুর

শিক্ষা দেওয়া হয়। শিখাবার জন্য ছেলে মেয়েদিগকে বেশী কিছু কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না।

আমাদের দেশে যেমন সকলেই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ব্যস্ত, বিলাতে তেমন নয়, অধিকাংশ ছেলে মেয়ে মোটামুটি শিক্ষা শেষ করেই কোন একটা কাজে যোগ দেয় এবং ক্রমে সেই কাজের উন্নতির জন্যই জীবনব্যাপী সাধনা করে। তারপর কাজের অবকাশের ভিতরে জ্ঞানলাভের চেষ্টায় সারাদিনই নানাপ্রকার গ্রন্থাদি পাঠ করে। দৈনিক সংবাদপত্র পড়া সকালে চাই-ই। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, নির্ধন, কৃষক, মজুর, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সংবাদপত্র পাঠ করে, দেশের যখনকার যে ঘটনা, তার খবর রাখে।

পল্লীর লোকের ধর্ম্মজীবন দেখে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করেছি। সহরের লোকে রবিবারে কেউ গীর্জ্জায় যায়, কেউবা বাইরে বেড়াতে যায় কিন্তু পল্লীতে প্রায় সকলেই রবিবারে গীর্জ্জায় যায়। ছোট বড় সব পল্লীতে একটি করে সুন্দর গীর্জ্জাঘর আছে। রবিবার ভিন্ন অন্যান্য বিশেষ দিনেও নানারকম সভাসমিতি হয়। ছোট ছেলে মেয়েরা রবিবারে সণ্ডে-স্কুলে যায়। সেদিন কেবল তাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম্মচর্চ্চার কথা বাদ দিলেও সততা, ভদ্রতা, পরোপকার-প্রবৃত্তি সেখানকার লোকদের মধ্যে অত্যন্ত বেশী।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একস্থানে তাঁর বিলাতভ্রমণ বিবরণে লিখেছেন—"এদেশের লোকেরা আমাকে এতই মূর্খ মনে করে যে, ফটোগ্রাফের বিবরণটাও আমাকে বুঝিয়ে দেয়।" আমি বলি ওটা তাদের মানুষকে শিখাবার একটা ঝোঁক। কোন আপিসের কাজে, ব্যবসায়ের কাজে যখন যেখানে গিয়েছি, সেখানেই নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে—তারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে বলে।

ভারতীয় ছাত্র ওখানে অনেক আছে। ভারতে যে যে স্থানে জাহাজ

ধরবার পোর্ট আছে অর্থাৎ কলকাতা, মান্দ্রাজ, কলম্বো, বম্বে, করাচী—এই সব যায়গার ছেলেই বেশী। বিলাতে ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে মান্দ্রাজ বোম্বাইএর মেয়েই বেশী এবং তাঁদেব শ্রম-কুশলতার গুণে তাঁরা ওদেশে বেশ শিক্ষা লাভ করেছেন। বাঙ্গালী মেয়েও অনেক দেখতে পেয়েছি।

ভারতীয় ছাত্রদের থাকবার লণ্ডনে প্রধান তিনটী স্থান আছে। একটী 21, Cromwell Roadএ, এটী ভারত গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে; একটী 112, Gower Streetএ, এটী ভারতীয় Y. M. C. Aর তত্ত্বাবধানে; আর একটী 54, Amherst Parkএ, এটী শ্রীরামপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল Rev. W. Sutton Page মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। Gower Streetএ নিরামিষভোজী হিন্দুদের জন্যে ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে একটি নিরামিষ ভোজনাগার সম্প্রতি হয়েছে। নেপালী রন্ধনকারী দ্বারা রন্ধন করান হয় কিন্তু পরিবেশন করে ইংরেজ মেয়েবা। ছেলেদের স্কুলের বেতনাদি সমেত মাসে কম পক্ষে দুইশত টাকা খরচ হয়। এদের মধ্যে কেউ গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিধারী, কেউ বা খুব বড় লোকের ছেলে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্যবসায় বাণিজ্য বা কারবার সম্বন্ধীয় ভারতবাসী বিলাতে নিতান্তই কম; যা আছে—বোম্বাই, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানের কয়েকজন মাত্র। বাঙ্গালীর ছেলেরা কেবল কলেজের ছাত্র আর তাদের ভবিষ্যৎ আশা কেবল চাকুরী। কিন্তু স্বাধীন দেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতির ভিতর দিয়ে তাদের চরিত্রের যতটুকু আমি অধ্যয়ন করেছি, তাতে শিখবার মত অনেক পেয়েছি।

সাধারণ অবস্থা

বিলাতে সকলেই কাজের লোক; বসে থাকা লোক বা আমাদের দেশের মত তাস-দাবা খেলা করা লোক সেখানে বড় একটা দেখি নাই। ধনীর ছেলে সেও কাজ করে, গরীবের ছেলে সেও কাজ করে। ভিক্ষুক নাই বললেই চলে। আমি যা দু'একটা ভিক্ষুক দেখেছি তা এই মত—

Charring Cross এ বহুলোকের সমাবেশ হয়। সেখানে দেখলাম, একটী অন্ধ ভিক্ষা করছে, তার গলায় একটা বোর্ডে লেখা "BLIND."

একদিন রাস্তার ধারে দেখলাম, কল ঘুরিয়ে একজন বাজনা বাজাচ্ছে—মুখে কোন কথাটী নেই, লোকে পয়সা দিচ্ছে, বুঝলাম সে একজন ভিক্ষুক।

টেম্‌সের ধারে প্রশস্ত রাস্তার এক পার্শ্বে দেখলাম, একটী লোক নানা রংয়ের খড়ি দিয়ে ফুট্‌পাথের উপর অতি চমৎকার ছবি আঁকছে। 'হাতে কাজ নাই,' 'কাজ চাই,' 'ভিক্ষা চাই' ইত্যাদি মাঝে মাঝে লিখে রেখেছে। এতে তার ভিক্ষা করা হচ্ছে, আর এই কাজ দেখে হয়ত কেউ তাকে কাজে নেবে। এই রকম ছাড়া নিছক ভিক্ষুক বিশেষ দেখিনি।

মেয়ে পুরুষ কাজকর্ম্মে রাস্তা ঘাটে সব যায়গাতেই সমান। আমাদের দেশের মেয়েদের মত মেয়েলী সঙ্কোচ ভাব ওদেশের মেয়েদের নাই। মেয়েদের সঙ্গে চলাফেরা কথাবার্ত্তা করতে একটুও মেয়ে মানুষ বলে বোধ হয় না—যেন পুরুষের সঙ্গেই কথা বলছি। মেয়ে পুরুষ সকলেই কাজকর্ম্ম করে কলের মত দ্রুত। আমরা বায়স্কোপের ছবিতে যেমন দেখি ঠিক তেমনই দ্রুত কাজ কর্ম্ম এদের। আর হাত পা চলার একটুও বে-দিশে নাই, সবই যেন প্রাক্‌টিস্‌ করে শেখা।

বৃটনবাসীদের গতিবিধির ভিতর দিয়ে এই শিক্ষাই আমাকে জাগিয়ে তুলেছে যে, কেমন করে আপন দেশকে, আপন সমাজকে ভালবাসতে

হয়। ও দেশের বহু লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—"ইংলণ্ড আপনার ভাল লাগছে ত? এদেশের লোকদের কাছে আপনি ভাল ব্যবহার পাচ্ছেন ত?" আমি অন্তরের সহিত উত্তর করতাম—"সবই ভাল দেখছি, সকলের কাছেই ভাল ব্যবহার পাচ্ছি।"

ঐ যে সারাজগতের নানাদেশে রাজ্যবিস্তার করেছে ওরা, ও কেবল নিজদেশকে পুষ্ট করবার জন্য। আপন জাতির উন্নতির জন্য ওরা অসংখ্য রকম বিধান করেছে। বেশীর ভাগ লোকেই আপন উপার্জ্জিত ধনসম্পদ সাধারণের কল্যাণকর এক একটা বিশেষ কার্য্যে দান করে। এই দানের পরিমাণ এতই বেশী যে, দেশের গরীব দুঃখীরা এই দানের উপর নির্ভর করেই মানুষ হয়ে ওঠে। গরীবেরা দেশের দান পেয়ে আপন দুরবস্থা কাটিয়ে পরে আপন উপার্জ্জিত অর্থ আবার অন্য গরীব দুঃখীদের জন্য দানের একটা ব্যবস্থা করে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের ধনসম্পদ অনেক হ্রাস পেয়েছে বটে, তথাপি এমন একটা লোক ওখানে দেখা যায় না, যার পরিধানে মলিন বস্ত্র, এমন লোক দেখা যায় না, যে খেতে পায় না, এমন লোক দেখা যায় না, যার অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যাঘাত হচ্ছে। প্রত্যেকেই যেন সমপরিমাণ সুখী। ধনীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা আছে—গরীবদের ছেলেমেয়েদের জন্য তার চেয়ে কোন অংশেই মন্দ ব্যবস্থা নয়। রাস্তা ঘাটে ধনী নির্ধনের সমান ব্যবহার, সমান অধিকার। 'ছোট লোক' কথাটার ব্যবহার ওখানে একেবারে নাই।

কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের সহিত কলেজের প্রফেসর বা উচ্চতর রাজকর্ম্মচারীদের সম্মানের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কর্ম্মের ছোট বড় নাই। যারা রাস্তা পরিষ্কার করে, যারা ধোবা নাপিতের কাজ করে, যারা রাস্তায় লোকের জুতা সাফ করে দেয়, তাদের কাজও কোন

অসম্মানের বলে গণ্য নয়। এই সম-সম্বন্ধের ফলেই এরা দেশের মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। এদের এই স্বজাতি প্রীতিকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি।

ইংলণ্ডবাসীদিগকে আমি সারাদিনই কাজ করতে দেখেছি, খুব বেশীর ভাগই পরিশ্রমের কাজ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি সারাদিনই ছুটোছুটি করে, ছেলেমেয়েরা পথে মা-বাপের সঙ্গে চলতে চলতে রাস্তার পাশের রেলিং ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। এরা এত বেশী ছুটোছুটি করে যে, আমাদের দেশে হ'লে আমরা এদেরই অসভ্য ছেলে বলে তিরস্কার করি। বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরাও সর্ব্বত্রই খুব ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়। সর্ব্বদাই এরা প্রফুল্লচিত্ত। বয়স্কেরা প্রায় প্রত্যেকেই শ্রমজনিত খেলা করে— এই স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে মুক্ত বায়ুতে খেলা করাই এদের মতে স্বাস্থ্য-বান হবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। সহরের মাঝে মাঝে যে সব বড় বড় পার্ক আছে, তার এক একটা পার্ক এতই বড় আর এমন বৃক্ষাদি পূর্ণ যে, সেখানে ঢুক্‌লে সহরে আছি বলে মনেই হয় না। প্রত্যেক পার্কেই খেলা করবার নানা রকম ব্যবস্থা আছে। অনেক পার্কে আঁকাবাঁকা সুদীর্ঘ খাল কাটা আর তার দু' ধারে বন জঙ্গল তৈরী করা, বিকালে বহুসংখ্যক লোক এই খালের ভিতরে ছোট ছোট নৌকা বেয়ে বেড়ায়, সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সহরের বাইরেও বেড়াবার, খেলা করবার অনেক ব্যবস্থা আছে। রেল কোম্পানী খুব কম খরচে এদের যাতায়াতের নিয়মিত ব্যবস্থা করেছে।

আমি পূর্ব্বে যে বাড়ীতে বাস করতাম সে বাড়ীর গৃহিনী অত্যন্ত মোটা, তিনি সারা দিন হাঁপাতে হাঁপাতে পরিশ্রম-জনিত কাজ করতেন, এক তিলও তাঁর ছুটোছুটির বিরাম ছিল না। যে দু'টী বয়স্থা কুমারী একজিবিশনে আমাদের ষ্টলে কাজ করত, তাদের যখন একটু পরিশ্রমের কাজ দিতাম তখন দেখতাম, হাতে কাজ পেলে তাদের সময় আনন্দে কাটে। ইংরেজের যেমন

শারীরিক বল যথেষ্ট, তেমনি নৈতিক বলও যথেষ্ট। আমি এদের প্রত্যেক গতিবিধির ভিতর দিয়েই কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করেছি। কেউই শ্রম-বিমুখ নয়, বড় বড় জিনিষপত্র পূর্ণ ব্যাগ প্রত্যেকেই নিজে বহন করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ওদেশে আমাদের দেশের মত মুটে দেখি নি। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে হাটবাজার করে আপন আপন জিনিষপত্র নিজেরাই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে নিয়ে পথে চলা ফেরা করে। মেয়েরা অনেকেই বড় বড় ঝুড়িতে বাজার সওদা কাঁকে নিয়ে চলে, ঝুড়ির ফিতে বা হাতল কাঁধে দিয়ে ঝুড়ি কাঁকে ঝুলিয়ে নেয়। ঝুড়ি বা ব্যাগগুলিও অতি সুন্দর, তাতে সওদাগুলিও এমন ভাবে রাখে যে, মনে হয় বহু চিন্তা করে ঝুড়িতে ঐ জিনিষগুলি সুন্দর করে সাজান হয়েছে। এদের এই কর্ম্মকুশলতার গতিবিধি দেখে কর্ম্মের প্রতি ভক্তি হত।

সময় ও দেশের লোকের কাছে বড় মূল্যবান। সময় আবার কেমন করে মূল্যবান হয় এটা আমাদের ধারণা করাই কঠিন। কিন্তু প্রত্যেক জিনিষের যেমন মূল্য ধার্য্য আছে—সময়ও ওদের তেমনি। শুধু সহরে কেন, আমার মনে হয়, ওদের কোন পল্লীতেও এমন লোক নাই যে, এক তিল সময় বৃথা নষ্ট করে। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, গল্পের সময় গল্প করা—এর কোনটাতেই সময়ের অপব্যবহার এরা করে না। আমাদের দেশে অনেকে ঘড়ি ব্যবহার করেন পোষাকী ধরণের, কিন্তু এদের প্রত্যেকেই সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্যই ঘড়ি ব্যবহার করে। আমাদের দেশে একাল পর্য্যন্ত ঘড়ি প্রস্তুত হয় নি কেন? এর মূলে চিন্তা করলে এই উত্তরই পাওয়া যায় যে, সময়ের মূল্য না জানলে ঘড়ির অভাব-বোধ জাগবে কেন? ঘড়ি তৈরী অতি শক্ত কাজ, পোষাকের জন্য যে ঘড়ির ব্যবহার তাতে কি আর অত শক্তি প্রয়োগ চলে? ঠিকঠাক সময়মত কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য এদের যে কত সুবিধা হয় তা আর

বলে শেষ করা যায় না। এরা কাজকর্ম্মে সময়ের ব্যতিক্রম মোটেই করে না।

বিলাতে রাস্তা ঘাট ঘরবাড়ী সবই অতি পরিষ্কার। সকলেই নিজের কাজ নিজে করে ; ঝি চাকর ওদেশে দরকার হয় না। দু' একটা বিলাসী বড়লোকের বাড়ীতে আবশ্যক মত কাজের জন্য লোক নিযুক্ত আছে বটে, কিন্তু অতি কম। আমাদের দেশে কাজ মাত্রকেই লোকে অপমানজনক মনে করে, এজন্য অধিকাংশ কাজ চাকর দ্বারা করায়, ওদের কাজের মান-অপমানের বালাই নাই, তাই প্রত্যেক কাজটি সংসারের লোকে নিজে হাতে করে। বাড়ীর ঘর লেপা-পোঁছা, পাইখানা পরিষ্কার করা—কোন কাজেই অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করে না। প্রত্যেক ধনী দরিদ্র গৃহস্থের ঘরের মেঝে সর্ব্বত্র গালিচা বা রং করা শক্ত কাপড়ে মোড়া, দেয়াল নানারকম চিত্রিত শক্ত কাগজে মোড়া, রান্নাঘর পাইখানাঘর পর্য্যন্ত রঙিন কাগজে মোড়া, সব অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভুলক্রমেও কখন কেউ দেয়ালে বা মেঝেয় থুথু ফেলে না, এক টুক্‌রা কাগজ পর্য্যন্ত যেখানে-সেখানে ফেলে না, এর জন্য পৃথক পাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। দিনের বেলায় পাইখানায় প্রস্রাব করে কিন্তু রাত্রির জন্য খাটের নীচে পাত্র থাকে। জিনিষপত্র সহজে পচে না বা দুর্গন্ধ হয় না। কোন পাইখানায় কখনও কোন দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না, সরকারী পাইখানা গুলিতেও কখন কোন দুর্গন্ধ দেখি নাই। খাদ্য-দ্রব্যগুলিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত টাটকা থাকে, এটা ওদেশের হাওয়ার গুণ। খাদ্যদ্রব্য পেটে গিয়ে কখনও অপাক উৎপাদন করে না, পেটে গিয়ে হজম হবার আগে পচলেই বদহজম হয়, ওদেশে তেমন প্রায়ই দেখা যায় না, সবই বেশ পরিপাক হয়।

ওখানকার খাদ্যদ্রব্যের বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী হয়। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে বেশীর ভাগ খাদ্য মাংস, মাখন,

ফল শস্যাদি চালান আসে। জাহাজে আসতে অনেক সময় লাগে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাখম, মাংস, ফল প্রভৃতি দ্রব্য জাহাজে আনবার বন্দোবস্তের গুণে ঠিক টাটকার মতই এসে পৌঁছে। অষ্ট্রেলিয়ার আঙ্গুর. আপেল, মিশর প্যালেষ্টাইনের কমলা, আফ্রিকার বড় বড় কলা, সেই সেই দেশ থেকে আমদানী করা, ইংলণ্ডে বসে একেবারে সদ্য গাছ থেকে তুলে খাওয়ার মত টাট্কা খেয়েছি। লণ্ডনে থেকে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থানের খাদ্য দ্রব্যই ভোগ করতে স্থযোগ পেয়েছি।

ওদেশে রন্ধনপ্রণালী যদিও বহুপ্রকার প্রচলিত আছে তথাপি বেশীর ভাগ জিনিষই সিদ্ধ ও ভাজা পোড়া খায়। পোড়ান ব্যাপারটী আমাদের দেশের মত আগুনের ভিতর দিয়ে পোড়ান নয়, এক রকম পাত্র আছে, তার ভিতর রেখে পাত্রটী উত্তাপপূর্ণ উনুনের মধ্যে রাখ্লেই অল্প সময় মধ্যেই সেকা হয়, এতে জিনিষের মৌলিক স্বাদ বৃদ্ধি পায়। নানা জিনিষ মিশ্রিত রান্না এরা বিশেষ পছন্দ করে না, সমস্তই পৃথকভাবে সিদ্ধ করে। আমার মনে হয়, এর মধ্যে একটী বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে, খাদ্যদ্রব্যকে যত স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা ক'রে খাওয়া সম্ভব হয়, ততই সেই দ্রব্যের প্রকৃত গুণ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। বড় বড় নামকরা হোটেলগুলিতেও এই ধরণের সহজ রান্না প্রচলিত।

ও দেশে যখন নিজে রান্না করে খেতাম, তখন আমার বেশী তৃপ্তি হত। আমাদের দেশের মত চাল, আলু, মটর, মুসুর ডাল, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মাছ, মাংস, দুধ সবই কিনতে পেতাম। ওখানে আমার শরীর আট সের বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার শোনা ছিল যে, বিলেতে গেলে স্বহস্তে পাক ক'রে খাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমার রান্না করে খেতে একটুও অস্থবিধা হ'ত না। ভারতীয় ছাত্রেরা বিলাতে ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে থেকে আমাদের অনভ্যস্ত আহার্য্য খেয়ে অজস্র অর্থব্যয় করেন, তা দেখে আমার

মনে বড় কষ্ট হত। আমি লণ্ডনে তাঁদের নিজেদের একটী ছাত্রাবাস করতে অনুরোধ করতাম।

ও দেশের প্রত্যেক সহরগুলির মিউনিসিপ্যালিটি সারা জগতের মানুষকে ডাকছে—আমার নগরটি দেখে যাও, এখানে এসে দু'দশ দিন থাক, আর আমার দেশের কিছু কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যাও। বিদেশী লোক এসে যাতে কোন অসুবিধা ভোগ না করে, স্থানীয়েরা তার ব্যবস্থা করে।

কেমন করে ইংরেজ পৃথিবীটাকে ভোগ করছে ভাবলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া এদের শস্যক্ষেত্র, আফ্রিকা এদের ফলের বাগান, নিউজিলণ্ড গো-শালা, ভারতবর্ষ ধন ভাণ্ডার, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার, নিজ দেশ গ্রেট-বৃটন শিক্ষা ও শিল্পাগার, আর সারাজগত বাণিজ্য ক্ষেত্র।

মোটের উপর দেখলাম—কেমন করে সারা জগতে রাজ্য বিস্তার করে প্রভুত্ব করতে হয়, কেমন করে সারা জগতের শিল্প বাণিজ্য আপন অধিকারে আনতে হয়, কেমন করে সারা জগতের উপভোগ্য ভোগ করতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার বিলাত-ভ্রমণ আমাকে অনেক দিয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

[বিলাতের খুটিনাটি ঘটনাবলী]

লণ্ডনে একদিন পথে চলতে হঠাৎ দেখলাম, মণিব্যাগ হারিয়েছি, খরচের পয়সা নাই—এক মাইল দূরে ব্যাঙ্কে গিয়ে খরচের টাকা আনতে যাব, অথচ আধ ঘণ্টার পরেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হবে। ট্রামে যাবার পেনিটি পর্য্যন্ত পকেটে নাই—তাই মনে হল, আজ পথের লোকের কাছে একটি পেনি চাইতে হবে। তারপর মনে একটা ঔৎসুক্য এল যে, এই পেনিটা চাওয়া যার তার কাছে চাইব না, এই চাওয়া উপলক্ষে দেশটাকেও বুঝতে হবে। তাই খুব গরীব পোষাক পরা একটি চৌদ্দ বছরের মেয়েকে পথে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখে তারই কাছে বললাম, ট্রামে যাবার পয়সা নাই, আমাকে একটি পেনি দেবে? বলতেই দেখলাম, দুটি অর্দ্ধপেনি আমার হাতে দিল। বোধ হয় আধ পেনি দুটি মাত্রই তার সম্বল ছিল, সে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না, আমার মুখের দিকেও চাইল না—পেনি দু'টি দিয়েই পূর্ব্ববৎ দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের দেশে এমন অপ্রত্যাশিত দান চাইতে হলে দাতার নিকট কিছু না কিছু কৈফিয়ৎ দিতে হত।

*

বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে আমাদের ষ্টলে একটী কারুকার্য্যপূর্ণ 'কাস্কেট' ছিল, তার দাম লেখা ছিল ২২ পাউণ্ড। একজন আমেরিকান

সেটা কিনবার ইচ্ছা করে বললেন—এটি আমাকে বিশ পাউণ্ডে দিতে পারবেন কি? বিলাতে দরদস্তুরের রীতি নাই, আমরাও কখন নির্দ্ধারিত দামের চেয়ে কমে বিক্রি করতাম না। লোকটি কম দাম বলায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কম দাম বলছেন কেন? তিনি বললেন, এখানকার জিনিষ আমেরিকায় নিতে বিশ পাউণ্ডের বেশী দাম হলে কাষ্টম ডিউটী আর পাঁচ পাউণ্ড অতিরিক্ত দিতে হয়, তাই বাইশ আর পাঁচ সাতাশ পাউণ্ড জিনিসটির দাম পড়ে। কিন্তু ঐ জিনিসের জন্য অত খরচ করতে পারি না, কুড়ি পাউণ্ডে পেলে আর কোন খরচ অতিরিক্ত বইতে হয় না। তাঁর এই কথা শুনে আমি যে উত্তর করলাম তা বলতে এখন লজ্জা হচ্ছে; আমি বললাম, আপনি যদি বাইশ পাউণ্ডে জিনিসটি আমার কাছে ক্রয় করেন তবে আপনার কাষ্টম ডিউটী বাঁচাবার জন্যে আমি বিশ পাউণ্ডের একটি রসিদ আপনাকে দিতে পারি। আমার এই প্রবঞ্চনার প্রস্তাব শুনে লোকটি আর আমার সঙ্গে কথা কইলেন না। ধীরে ধীরে যে ভাবে তিনি প্রস্থান করলেন, তাতে বেশ বুঝলাম, দেশকে ফাঁকি দিতে পরামর্শ দেয়—এমন লোকের কাছে জিনিস কিনতে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা বোধ করেন।

একদিন তের বছরের একটি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাইবেলের কোন বাক্যটি তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে? বালিকা উত্তর করল—"যাও, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই নাম (খৃষ্টের সুসমাচার) প্রচার কর।" বালিকার মুখে তেজপূর্ণ ভাষায় এই বাক্যটি বলতে শুনে আমি অবাক হ'লাম, ভাবলাম—এমন প্রাণ না হলে কি আর পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খৃষ্ট ধর্ম্মের এত প্রসার।

বালিকাটিকে আমি তার আর একটি মনোনীত বাক্য বাইবেল থেকে বলতে বলায় সে উত্তর করল—"সাইমন্ তুমি কি আমায় ভালবাস? সাইমন বলিল—হাঁ প্রভু, আপনি সবই জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি। প্রভু বললেন—তবে আমার মেষপাল (প্রিয় শিষ্যগণ) চরাও।" তার এই শাস্ত্রীয় বচনটি বলবার সময় আমি আবার তার অন্তরের ধর্ম্মভাব মুখে ফুটেছে দেখে আশ্চর্য্য বোধ করলাম।

*

একদিন ট্রেণে খুব ভিড় হয়েছে, অনেক লোক গাড়ীতে দাঁড়িয়েই চলছে। ও দেশে ট্রেণে প্রায় সকলেই বই বা খবরের কাগজ কিছু না কিছু পড়তে থাকে। একটি লোক অপরের ঘাড়ের উপর খবরের কাগজ রেখে পড়ছে আর লোকটি পাঠকের সুবিধার জন্য ঘাড় নত করে রয়েছে, অথচ এদের মধ্যে পরিচয় নাই। দেশবাসী সকলের মধ্যে কি সুন্দর একাত্মবোধ!

*

পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে মাত্র দু'টি ছেলে দু' জায়গায় দেখেছি, পথে চলতে তাদের পায়ে জুতা ছিল না। তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম—জুতা কিনবার পয়সার অভাব। এই দৈন্যকে তারা প্রকারান্তরে ঢাকতে চেষ্টা করে নাই। এইখানেই পেলাম তাদের মনের বলের পরিচয়।

*

একজিবিশনে আমাদের ষ্টলে একটি ১৫ বছরের মেয়ে কিছুদিন কাজ করেছিল, নাম তার ভায়োলেট, বড় ভাল স্বভাব। একদিন বেঙ্গল কোর্টের একটি বাঙ্গালী যুবক চা খাবার ঘরে তাকে একাকী পেয়ে হঠাৎ তার

মুখচুম্বনে অগ্রসর হয়েছিল। সে আমার ষ্টলে তার চেয়ে বড় যে মেয়েটি কাজ করত তার কাছে প্রকাশ করতেই বড় মেয়েটি বেঙ্গল কোর্টের প্রধান মেয়ে-কর্ম্মচারীর কাণে কথাটা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল কোর্টের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের নিকট কথাটা অভিযোগ রূপে উপস্থিত হল। সেই দিন বিকালেই বিচার হয়ে যুবকটির চাকরী গেল। পরদিন যুবকটি মর্ম্মাহত হৃদয়ে আমাদের ষ্টলে এসে আমাকে জানাল যে,সে ভায়োলেটের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমি তাকে তিরস্কার করে জানালাম, আমি ভায়োলেটের সঙ্গে তোমায় দেখা করতে দিব না। ভায়োলেট ষ্টলের ভিতরে ছিল, সে এসে আমাকে বলল, যুবকটি কি বলে ? আমি বললাম, তোমার তাতে প্রয়োজন নাই, পোড়ারমুখো তোমার সঙ্গে আবার কথা কইতে চায়! ভায়োলেট বলল—আমি যদি জানতাম, ওর চাকরি যাবে, তবে কথাটা আর প্রকাশ করতাম না, যাহ'ক, ও কি বলে আমি শুনতে চাই। আমি বাধা দেওঁয়া সত্বেও সে যুবকটির কাছে গেল। যুবকটি বলল—আমি আমার চাকরী এবং যশ দুই-ই হারালাম, তুমি যদি আমার জন্যে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের নিকট একটু অনুরোধ কর তবে আমি পুনরায় চাকরী পাবার জন্যে দরখাস্ত করতে পারি। ভায়োলেট তখনই ছুটে গিয়ে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের নিকট যুবকটির দোষ ক্ষমা করতে অনুরোধ করে তার চাকরী বহাল করে দিল। অপরাধীর প্রতি কি আশ্চর্য্য ব্যবহার! কি ক্ষমা! কি উদারতা!

*

একদিন একটি দোকানে তাদের কারখানায় নূতন ধরণের তৈরী চুল ঢাকা জাল বিলি হচ্ছিল। শত শত মেয়ে পুরুষ ঐ জিনিস পাবার জন্যে তাদের দোকানের সামনের প্রসারিত ক্ষেত্রে ভিড় করল। দোকানের

মালিক নিকটে বা দূরে যাকে লক্ষ্য করে ফিতে ছুড়ে দিচ্ছিল, কেবল সেই মাত্র হাত তুলে ফিতে ধরছিল, আর ফিতে পাওয়া মাত্রেই সে (আর ফাঁকি দিয়ে পুনরায় পাবার আশায় না থেকে) চলে যাচ্ছিল। আশ্চর্য্য এই যে, বহু বহু লোকের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ফিতে মিলেছিল কিন্তু এর জন্যে হুড়োহুড়ি নাই, চেঁচামিচি নাই, নীরব নিশ্চল হয়ে দর্শকগণ ফিতে পাবার আশায় দাঁড়িয়ে ছিল। এক একজনের হাতে ফিতে পড়তেই তার পার্শ্ববর্ত্তী দশ-পনরো জনে হেসে আনন্দ প্রকাশ করছিল। আমার মনে পড়ছিল আমাদের দেশের কথা—সভাক্ষেত্রে প্রোগ্রাম বিলির সময়েও লোকদের ধৈর্য্যের অভাবে সভাক্ষেত্র গণ্ডগোলময় হয়ে ওঠে।

*

আয়র্লণ্ডের বেলফাষ্ট সহরের একটি চৌ-মোহনার মুক্ত প্রান্তরে কতকগুলি লোকে ধর্ম্মপ্রচার করছিল, প্রচারের ধারা দেখলাম এই মত যে, প্রত্যেক বক্তা নিজ জীবনের অপরাধের উল্লেখ করে যে ভাবে তা থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের অনুগ্রহে আনন্দ রাজ্যে এসে পড়েছে, প্রাণস্পর্শী ভাষায় তারই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। একটী যুবতীকে দেখলাম, নিজের পূর্ব্ব জীবনের অপরাধের মুক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এবং তার ন্যায় অপরাধীদের দোষ মুক্তির জন্য উর্দ্ধের দিকে চেয়ে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছিল। সে দৃশ্য দেখে আমার মনে হচ্ছিল—একেবারে উর্দ্ধের দেবতার সঙ্গে যেন তার প্রাণের ভাব সূত্রের যোগ হয়ে গেছে, যেন ভগবানের সঙ্গে তার প্রাণের ভাবের আদান প্রদান চলছে। আমি বলতে চাইনা যে, এমন ভক্তিমতী আমাদের দেশে নাই—তবে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে অমন উপাসনা বড়ই শক্তির পরিচায়ক।

*

আমি এক সময়ে এক গৃহস্থ পরিবারের সঙ্গে থেকে নিজে রান্না করে খেতাম। ঐ পরিবারের সকলের কাছেই আমার বলা ছিল—আমার গতিবিধির মধ্যে যা কিছু রীতিবিরুদ্ধ দেখবে, তা আমাকে জানাবে। একদিন একটি সাত বছরের ছেলে আমার খাবার সময়ে আমার একটু ক্রুটী দেখেছে যে, মাছের সঙ্গে ভাত মিশিয়ে খাচ্ছি। তখন সে আমাকে উপদেশ দিল—আগে মাছটি খাও, তারপর চিনি মিশিয়ে ভাতগুলি খাও। উপদেশটি খুব বড় নয় বটে, কিন্তু অতটুকু বালক-উপদেষ্টা মহাশয়ের উপদেশ দানের চেষ্টাটাই আমার কাছে বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল।

*

একদিন ঐ পরিবারের একখানি চীনে মাটীর ডিস্ আমার রান্নাঘরে ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। আমি যখন এই সংবাদটি গৃহকর্ত্রীকে জানিয়ে একটু দুঃখ প্রকাশ করলাম, তখন গৃহকর্ত্রী হেসে বললেন—ডিস্খানি ভেঙ্গে আপনি কেঁদে ফেলেন নাই তো? ঘটনাটা বিশেষ না হলেও অমায়িকতার কথা বটে।

*

দু'টি ছেলে রাস্তায় মারামারি করছিল, রাস্তায় লোক সব দাঁড়িয়ে দেখছিল, যতক্ষণ তাদের ধস্তাধস্তি চলছিল ততক্ষণ কোন পথিকই তাদের এই কাণ্ডে বাধা দেয় নাই, কিন্তু যখন একটি ছেলেকে পরাস্ত করে অপরটি তার উপর বিষম মারপিট আরম্ভ করল তখন পথিকেরা দু'জনকে তুলে পৃথক করে দিল। আশ্চর্য্য এই, দুটি ছেলেই পরস্পর নীরবে মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের ক্ষোভ মিটিয়ে দু'জনেই "গুডবাই" বলে বিদায়

নিয়ে চলে গেল। ঠিক এমনই ঘটনা আর একদিন দু'টি মাতালের মধ্যে দেখেছিলাম, তেমনই বিদায়ের বেলায় "গুডবাই।" দেখলাম, ঝগড়া হ'ক, মারামারি হ'ক তবুও সারা দেশ যেন ভাই ভাই।

*

লণ্ডনে একটি ছাপাখানায় এক হাজার কাগজ ছাপার একটি অর্ডার দিয়ে একখানা চেক দিয়ে দাম শোধ করে পাঠিয়েছিলাম। ছাপা ওয়ালারা ডাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার লণ্ডনের বাসায় ছাপান কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কার্য্য গতিকে আমি তখন গ্লাসগোতে থাকায় সেগুলি গ্লাসগোতে আমার নিকট পৌছল। আমি দেখলাম, একটা অক্ষর বানান ভুল হয়েছে। গ্লাসগো হোটেলের ঝি-মেয়েটি এই বিষয়টি দেখেই আমাকে বলল, আপনি সেই ছাপাখানায় জানালেই তারা নূতন করে আপনাকে আবার ছাপিয়ে দেবে, তার জন্যে আপনাকে ছাপা খরচ, কাগজের দাম বা ডাক খরচ কিছুই দিতে হবে না। আমি ছাপাখানায় চিঠি দিয়ে জানাতেই ঠিক সময়ে আমার কাছে নূতন আর এক হাজার সংশোধিত ছাপান কাগজ এসে হাজির হয়েছিল। ছাপাখানার সততাটাই এখানে বড় কথা নয়—তার চেয়ে বড় কথা এই যে, একটি হোটেলের ঝিও নিঃসন্দেহে জানে যে, তাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কখনও গ্রাহককে ঠকায় না, বা গ্রাহকের মনে অসন্তুষ্টি থাকতে দেয় না।

*

লিপটন্ কোম্পানি কতকগুলি মেয়ের হাতে-মুখে কালো রং মাখিয়ে সিংহলী মেয়ে সাজিয়ে তাদের দিয়ে চায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করছিল।

সিংহলী ধরণের নূতন রকমের পিতলের তৈরি ঘটিতে পাতা চা পূর্ণ করে মাত্র পাত্রের দাম এক শিলিং নিয়ে চা দিচ্ছিল। তারা গ্রাহকের সামনে চা পূর্ণ পাত্রটি ধরে কেবলমাত্র 'শিলিং' 'শিলিং' রব করছিল—অর্থাৎ তারা যেন সত্যি সিংহলী মেয়ে—আর ইংরেজী কথা কইতে জানে না, তাই আর কোন কথা বলতে পারছে না। ভারি মজার চায়ের বিজ্ঞাপনটি! তাদের চমৎকার সিংহলী অনুকরণ দেখে খুবই গ্রাহকের ভিড় হয়েছিল। আমি মেয়েগুলিকে তামাসা করে বললাম—তোমরা সিংহলের চা বাগানের বেশ মেয়েকুলী সেজেছ বটে—কিন্তু এর চেয়ে আরও ভাল অনুকরণ হবে যদি পায়ের জুতা মোজা খুলে ফেলে দিয়ে পায়ে কালী মাখতে পার। আমার জানা ছিল, তারা উলঙ্গপ্রায় হয়ে নাচতে পারে, তবু পায়ের জুতা মোজা খুলতে পারে না।

*

একদিন ট্রেণে চলছি, পথে একদল স্কুলের ছোট মেয়ে ট্রেণে উঠল। ওখানে তৃতীয় শ্রেণীতেও প্রত্যেক জনের জন্য এক একটি পৃথক বসবার স্থান। মেয়েগুলি ট্রেণে উঠেই খালি সিট্‌গুলি অধিকার করে বসল, কিন্তু যখন দেখল, দশ বারোটি মেয়ে স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তারা সকলেই উঠে দাঁড়াল। তারপর অপরিচিত প্যাসেঞ্জারেরা ছোট মেয়েদিগের এক একটিকে টেনে নিয়ে কোলে বসাল, তারপর খালি সিট্‌গুলিতে আর সব মেয়েরা বসল। মেয়েদের মধ্যে একাত্মবোধ আর প্যাসেঞ্জারদের কর্ত্তব্যজ্ঞান দুই-ই উল্লেখযোগ্য।

*

একজিবিশনে আইল-অব-ম্যান নামক দ্বীপে ভিজিটর অর্থাৎ দর্শক আমদানী করবার উদ্দেশ্যে সেখানকার মনোরম দৃশ্য সম্বলিত উৎকৃষ্ট কয়েক

প্রকার ছবি বিতরণের জন্য এক স্থানে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে বিলি করবার জন্য কোন লোক রাখা হয় নাই, কেবল লেখা ছিল—"প্রত্যেক ছবির এক একখানা করিয়া মাত্র লইবে।" একটি ছেলে তার মায়ের সঙ্গে এসে ঐ ছবি এক একখানা করে নিয়েছে; তারপর তার পছন্দ-মত ছবিখানির আর একখানা নেবার জন্য তার মায়ের কাছে আদেশ চাইতেই মা বললেন—"না, তুমি কখনই এক একখানার বেশী নিতে পার না।" ছেলেই বা কেমন সুন্দর শিক্ষা পেয়েছে যে, আর একখানি নিজ ইচ্ছায় তুলে না নিয়ে মায়ের অনুমতি চাইল; আর মা যে উপযুক্ত শিক্ষাদাত্রী মা—তার তো কথাই নাই।

*

পল্লীগ্রামের টেম্‌সের তীরে একটি মুক্ত-উদ্যানে এক পাগল বুড়ীকে দেখেছিলাম। পাগলী বাগানের একখানি বেঞ্চে তার আসবাব-পত্র চারদিকে ছড়িয়ে বেঞ্চ জুড়ে বসে আছে। ভাবলাম, বুঝে দেখি বিলাতে পাগল আবার কি চরিত্রের! তার কাছে গিয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে চাই। বুড়ী এপাশ ওপাশ মুখ ঘুরিয়ে বলল—"না"। তার আসবাব পত্রগুলি হচ্ছে—ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়ার পুঁটলী, শুকনো ডালের টুক্‌রা, ময়লা টিনের পাত্র তার সঙ্গে একটুক্‌রা পাউরুটি। দেখলাম, পাগলের ধারা এদেশ ওদেশ সর্ব্বত্র একই রকমের।

*

ওদেশে কোন জন-সমাগমের প্রবেশ পথে যেখানে একটু ভিড় হয়, সেখানে ঠেলাঠেলি করে আগে যেতে কেউ চেষ্টা করে না—একের পর আর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে যায়। পর পর লোক এসেই শ্রেণীর পশ্চাতে দাঁড়ায়।

এ রকম শ্রেণী কখন একশত হাতের উপর দীর্ঘ হতে দেখেছি। একদিন দেখলাম, একটা উৎসব ক্ষেত্রের প্রবেশ দ্বারে উপরের আচ্ছাদনযুক্ত স্থান ছেড়ে লোকের শ্রেণী বাইরে অনেকদূর গিয়েছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এল তবু লোকগুলি শ্রেণী ভেঙে আচ্ছাদিত স্থানে এগিয়ে এলো না, পরে ধীরে ধীরে একে একে প্রবেশ করল। আমাদের দেশে কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে সাম্‌নের লোক পেছনে ফেলে আগে ঢোক্‌বার চেষ্টাটাই বেশী লোক করে, আর কোন কোনখানে এত লোকের চাপাচাপি হয় যে, তাতে কারো বা সার্দ্দিগর্ম্মি হয়, তার মাঝে আবার পকেটমার পর্য্যন্ত আমদানী হয়।

*

লিভারপুলের একটা বহুজনপূর্ণ হোটেলে একদিন সন্ধ্যার পর দেখলাম, একটি আমেরিকান যুবক একখানি পাউরুটি মাত্র খাচ্ছে। এই হোটেলটিতে অনেক গরীব লোক খায় বটে কিন্তু এমন শুধু রুটিমাত্র কিনে খেতে কাউকে দেখি নাই। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় জানলাম, সে একখানি জাহাজে রান্নার কাজ করে। জাহাজখানা আসতে দেরী হচ্ছে, এরই মধ্যে তার খরচের টাকা ফুরিয়ে গেছে। তার সিগারেট খাওয়া অভ্যাস আছে। কিন্তু পয়সার অভাবে রাস্তার সিগারেট টুক্‌রা কুড়িয়ে তাই দিয়ে সিগারেট তৈরী করে খায়। শোবার খরচ হোটেলে দৈনিক এক শিলিংএর কমে হয় না, তার অভাবে সে গত দুইরাত্রি রাস্তায় ঘুরে কাটিয়েছে। আমি বললাম, এই হোটেলে এত লোক বাস করছে, তুমি তোমার এই অভাবের কথা কাউকে বল নাই কি? সে বলল—"এদেশবাসী ইংরেজদের কাছে বলতে লজ্জা করে।" আমি সে রাত্রির শোবার জন্য এক শিলিংএর একটা টিকেট করে তাকে দিলাম। দু'দিন পরে তাকে আর একটি যুবকের সঙ্গে মিলে একখানা রুটিমাত্র দু'জনে খেতে দেখে সেদিন জানলাম, সে যে নূতন

বন্ধুটি পেয়েছে, তারও পয়সার অভাব, তাই দুজনেই পরস্পরের দুঃখের দরদী হয়েছে। আমি সেদিন তাদের সম্মতি নিয়ে তাদিগকে চারটি শিলিং দিলাম। তারা আমার ঠিকানা চাইল, আমি বললাম, এটা ধার দেওয়া নয়—শোধ করবার জন্যে ঠিকানা লওয়ার প্রয়োজন হবে না। এই যে বিদেশে এসে এত অর্থাভাবের মধ্যে পড়েছে তবু এদের কারও প্রাণে একটুও ভাবনা চিন্তার লক্ষণ দেখলাম না; বিদেশে এসে এদের মত মানুষ দেখে আমারও মনের বল একটু বেড়ে গেল।

ওদেশে বাইরের সরকারী পাইখানা ব্যবহার করতে একটি পেনি (আনা) দিতে হয়। একটি পাইখানা ব্যবহারের পর মেথরকে পেনিটি দিতেই সে বলল, এ পাইখানাটি এখান থেকে উঠে যাবে তাই পয়সা নেবার হুকুম নেই। তবে যদি আমার নিজকে দান করেন তবে নিতে পারি। আমি বললাম, তোমাকে দান করতে চাই না, তখন সে প্রফুল্ল চিত্তে পেনিটি আমাকে ফিরিয়ে দিল। দেখলাম—পেনিটি নিজে নিতে তার কোন অসুবিধাই ছিল না তথাপি কর্ত্তব্য বোধে সে ফিরিয়ে দিল।

কয়েকটি লোককে নিয়ে একটি Group ফটো তুলবার মনন করে তাদিগকে বলেছিলাম—তোমরা মাত্র এক শিলিং করে দিলেই প্রত্যেকে একখানি করে ফটো পাবে। ঐ ফটোর জন্যে কিছু বেশী খরচ হয়েছিল বলে পরে তাদিগকে বলেছিলাম, প্রত্যেকে দুই শিলিং করে দিলে ঠিক

হয়। তখন একটি বালিকা আমাকে বলল, "বৃটেনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তুমি একমুখে দুই কথা বলতে পারবে না।" আমি লজ্জিত হয়ে আমার কথাটা ফিরিয়ে নিলাম।

আয়র্লণ্ডে একটা গরীব পরিবারে সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, গৃহিণী একদিন বলছিলেন,—"আমরা যে গরীব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, এইটাই আমাদের আনন্দের হয়েছে— খৃষ্ট গরীবদিগকেই বেশী ভাল বাসেন।" দরিদ্রের পক্ষে উপযুক্ত শান্তির বার্ত্তাই বটে।

এডিনবরায় একটি মিশনারী সভায় এক দিনকার বিষয় ছিল "চীনদেশে স্কটিস্ মিশনের কার্য্য।" একটি বৃদ্ধা ধর্ম্ম-প্রচারিকা তাঁদের সম্প্রদায়ের তরফ থেকে চীনদেশে যে যে কার্য্য করেছেন, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে তাই বক্তৃতা করে শোনাচ্ছিলেন। চীনে তাঁদের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের যা বর্ণনা করলেন—তাতে বাস্তবিকই তিনি অত্যন্ত প্রশংসা পাবার যোগ্যা। সভাভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন বক্তার মুখে শোনা গেল, ম্যাজিক লণ্ঠনের ঐ সুন্দর ছবিগুলি সমস্তই ঐ বক্তৃতাকারিণী মহিলার নিজ হাতের আঁকা। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কিন্তু তিনি তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করতে প্রয়াস পান নাই। মহৎ চরিত্রের পরিচয় নয় কি?

দু'টী স্কুলের ছাত্রী জোড় বেঁধে থিয়েটার দেখতে এসেছে—আমারই পাশে তাদের সিট্ হয়েছিল। তারা দু'জনে মজা করে থিয়েটারের রং-ঢংএ

হাসছিল, আর মাঝে মাঝে চক্‌লেটের বাক্স বের করে তা থেকে চক্‌লেট তুলে দু'জনে খাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, আমার মত একটি ভিন্ন আকৃতি, ভিন্ন প্রকৃতির জীব তাদেরই ধারে গম্ভীর ভাবে বসে থাকায় নিশ্চয়ই তাদের স্ফুর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটছে ; তাদের ঐ বালিকা সুলভ কোমল প্রাণের স্ফূর্ত্তির পাশেই এই গম্ভীর নীরবতার মূর্ত্তি নিশ্চয়ই বিসদৃশ। তাই তাদের সঙ্গে একটু ভাবের বিনিময় করব মনে করলাম ; কিন্তু কি-ই বা কইব আর কি-ই বা করব! তারপর আমার নীরব শুষ্ক ওষ্ঠ, শুষ্ক জিহ্বা তাদের হাতের ঐ চক্‌লেটের বাক্সের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই আমি Excuse me বলেই একখানি চক্‌লেট তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তারা All right বলে আরও তুলে নিয়ে খেতে অনুরোধ করল। এই যে একটা ভাবের আদান প্রদান হয়ে গেল, তারপর তাদের সঙ্গে কত কথা, কত ভাব বিনিময়, কত আনন্দ। দেখলাম—এই যে কোমল প্রকৃতির দু'টি সুন্দরী স্কুলের মেয়ে আর বিদেশী কাল আদমী গম্ভীর প্রকৃতির আমি, এত যে বৈষম্য, এর মধ্যেও সাম্যের একটা ক্ষেত্র আছে।

একদিন পথে একটা কুকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল, বিলাতের কুকুরগুলি একটাও মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পত্তি নয়, কোন না কোন লোকের আদুরে পোষা ; তাই কুকুরটা অনেক দূর আমার সঙ্গে আসতে দেখে আমি ফিরবার জন্যে তাকে তাড়া করলাম, কিন্তু সে কিছুতেই আমার পাছ ছাড়বে না, তারপর যত তাড়া করি ততই আমার গা বেয়ে ওঠে, হাত চাটতে আসে। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না—এমন করে কেন! এই রকম সে প্রায় সিকি মাইল এসেছে, তারপর আমার চারদিকে ঘুরে আমার গতির বাধা দিতে আরম্ভ করল ; কিন্তু বিরক্ত

হচ্ছি না, বেশ সুন্দর ছোট্ট দীর্ঘাকৃতি কালো কুকুরটি। তারপর আমার পকেটের কাছে তার মুখ নিতেই আমার মনে পড়ল, আমি একটা চক্‌লেটের দোকান থেকে কিছু চক্‌লেট কিনে পকেটে রেখেছি—কুকুরটা তাই দেখে সেইখান থেকেই আমার সঙ্গ ধরেছে। আমি একখানা চক্‌লেট দিতেই সে মুখে নিয়েই দে—ছুট। বিলাতের কুকুরটিও দেখলাম সুচতুর বটে!

একদিন লণ্ডন টাওয়ারের ময়দানে বড় বড় দু'টো দাঁড়কাক চরে বেড়াচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমি তাদের একটু নিকটে যেতেই তারা দু'টীতেই লাফিয়ে লাফিয়ে আমাকে এমন তাড়া করেছিল যে আমাকে ভয়ে পালাতে হয়েছিল। এখানে আমার বীরত্বের আলোচনা যিনি করবেন করুন, কিন্তু কাকের সাহসটা কি আর ছোট খাটো!

একদিন লণ্ডনের পথে একটা পরিচিত দুষ্ট ছেলের সঙ্গে দেখা হল—সে বাজার করতে এসেছে। আমাকে পেয়েই বলল—খুড়ো, আমাদের বাড়ীতে চল, মা তোমাকে দেখলে খুসী হবেন—বলেই সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। আমি তার টানাটানির চোটেই রাজি হলাম। পথে বলছে খুড়ো, দেখ কি সুন্দর আইস ক্রীম! তাকে এক পেনির খেতে দিলাম। একটু যেতেই বলছে, দিদির জন্যে কিছু নেবে না কি? আমি আট আনার উৎকৃষ্ট এক বাক্স খেজুর নিলাম, সে প্যাকেট খুলতে বলল—দেখবে কেমন খেজুর; খুলতেই একটা নিয়ে খেল। পথে যেতে যেতে আর একটা চাইল, তারপর আর একটা। তারপর বলছে খুড়ো,

উপরের থাক্‌টা ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেখাচ্ছে, উপরের সব কটা তুলে নিই না কেন, তাহ'লে খেয়েছি বলে টের পাওয়া যাবে না। আমি হেসে হেসে তাও তাকে নিতে দিলাম। তারপর বলছে খুড়ো, চারটে থাকের এক থাক খেলাম, আর এক থাক খেলেও ত দিদি টের পাবে না যে ভাঙ্গা হয়েছে। আমি তার দুষ্টমির দৌড় বুঝবার জন্যে তাও তাকে নিতে দিলাম। খানিকটা গিয়েই সে বলল খুড়ো, আধা প্যাকেট খেজুর দেখে যদি দিদি সন্দেহ করে তবে আমার দোষ দেবে না ত? আমি বললাম, তবে বল আমার দোষ দিব? সে বলল না খুড়ো, অত-শতয় কাজ নেই, সবটা খেয়ে ফেলি। আমিও বুঝলাম, যুক্তিযুক্ত কথা বটে; বাকিটুকু পেয়ে তার স্ফুর্ত্তি দেখে কে! প্যাকেটটীতে এক পাউণ্ড অর্থাৎ আধসের খেজুর ছিল, সবটাই সে পথে মজা করে খেয়ে নিল। তার পর তার মার সঙ্গে দেখা করে এলাম। পকেটে একখানা ছোট নূতন ছুরি ছিল, তার দিদিকে সেইটা দিলাম। ছেলেটি কিন্তু আর কিছু চাইতে সাহস করল না। দুষ্টই বটে!

*

বার্ম্মিংহামের বাইরে এক পল্লীতে রবিবারে বেড়াতে গিয়েছি। ফেরবার সময় ট্রামের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। দু'টি মেয়ে দেখলাম, সাণ্ডে স্কুল (রবিবারের ধর্ম্মশিক্ষার স্কুল) থেকে ফিরছে। আমার ট্রাম আসতে দেরী হচ্ছিল তাই তাদের ধর্ম্মশিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনছিলাম। ট্রাম আসতেই চাপলাম, পাড়াগাঁয়ের ট্রাম, দু' একজন লোক মাত্র ছিল। আমি একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসতেই একটী ভদ্রমহিলা ট্রামে চেপে ঠিক আমারই পাশে বসলেন। তিনি আমাকে বললেন, মেয়েদের সঙ্গে আপনার আলোচনা আমি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, তাতে বড়

খুসী হয়েছি। তারপর তিনি আমাদের ধর্ম্ম প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন; নিজেও কিছু ধর্ম্মকথা কইলেন। তারপর অত্যন্ত নূতন কথা এই যে, বার্ম্মিংহামে আমার ফিরবার টিকিট একটা নয় আনা দিয়ে আমার জন্যে কিনে দিলেন, আর তাঁর নিজের জন্যে নিলেন এক আনার একখানি টিকেট। আমি ধর্ম্মপ্রাণ মহিলার দান প্রত্যাখ্যান করলাম না। আমার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনার একটু সুযোগ নেবার জন্যেই তিনি ট্রামে চেপেছিলেন, তারপর ফিরে গেলেন। এইখানে একটু পল্লীর প্রাণের পরিচয় গেলাম।

ও দেশে ট্রামের বা বাসের পয়সা কেউ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে না। এক দিন এক পেনির পথ এসে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামলাম, কিন্তু টিকেটওয়ালা তখন উপরে থাকায় পয়সা দিতে পারি নাই; হাতের পেনিটি হাতে করেই নামতে হল, কিন্তু পেনিটি আমি পকেটে ফেলতে পারলাম না, পথের একটী বালককে দিলাম। আমাদের এদেশে কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পয়সাটি পকেটে ফেলতে আমাদের মনে কোন দ্বিধা হয় না। দেশ-কাল বুঝে মনের অবস্থাও এতটুকু তফাৎ হয়।

যাদের কোলে শিশু ছেলে, অথচ বাড়ীতে রাখবার লোক নাই, তাদের পক্ষে কোন আমোদ উৎসব দেখতে যাওয়া প্রায়ই জোটে না। বিলাতে এর জন্যে উৎসব বা প্রদর্শনীর সঙ্গে দর্শকদের শিশু সন্তান রাখবার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়। বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে দেখেছিলাম— চমৎকার একটী বাগান-বাড়ী করা হয়েছিল শিশু সন্তান রাখবার জন্যে।

মায়েরা তাদের সন্তান সেখানে রেখে তার জন্যে একটা নম্বর দেওয়া টিকেট নিয়ে যেত, ফিরবার সময় সেই টিকেট ফিরিয়ে দিয়ে যার যার ছেলেমেয়ে নিয়ে যেত। শিশুদের খাওয়ান দাওয়ান বাহ্যে প্রস্রাব করানর সবই সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, তার জন্য সামান্য চার ছ'আনা দিতে হত। একদিন সেই শিশু রাখবার স্থানে গিয়ে দেখলাম, তার মধ্যে চমৎকার ফুলের বাগান, নানা-প্রকার ছেলে-খেলার সরঞ্জাম। সেখানকার কার্য্যকারিণীরা প্রত্যেক শিশুটী নিয়ে আনন্দের সঙ্গে খেলা করছে। শিশুরা খেলা পেয়ে মা-বাপ ভুলে গেছে। কি সুন্দর ব্যবস্থা!

বার্ম্মিংহামে স্যাল্‌ভেসন-আর্ম্মির বার্ষিক ধর্ম্ম সভার অধিবেশনে একদিন আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। আমি চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কয়েকটী বিষয় আলোচনা করেছিলাম—যা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে অনুকূল অথচ নূতন। সভাপতি মহাশয় আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তা হবেই ত—আমাদের স্যাল্‌ভেসন আর্ম্মির প্রতিষ্ঠাতা বুথ সাহেব ভারতে গিয়ে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন, তারই একটা সুফল আমরা আমাদের এই ভারতীয় বন্ধুর নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করলাম। কি আশ্চর্য্য! চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম থেকে যে ভালটুকু পাওয়া গেল তাকেও তাদের বুথ সাহেবের কার্য্যের ফল বলে ধরে নেওয়া হল। নিজেদের গণ্ডির বাইরে যে কিছু ভাল থাকতে পারে এ ধারণা তাদের অনেকেরই নাই।

*

লণ্ডনে একটা ফুলের দোকানের ফটো নিচ্ছিলাম, ভাবলাম, এমন সুন্দর সাজান দোকানখানির ফটো নেবো কিন্তু এর মধ্যে একটা ছোট

সুন্দর মেয়ে থাকলে বড় ভাল হ'ত ; তাই রাস্তায় যে সব স্ত্রীপুরুষ, ছেলে মেয়ে নিয়ে চলছে, তার মধ্যে উপযুক্ত মেয়ে সন্ধান করছিলাম। খানিকটা সময় পরে একটা মনোমত ছোট মেয়ে তার মার সঙ্গে যেতে দেখে তার মাকে বললাম, তোমার মেয়েটীকে ঐ ফুলের দোকানে দাঁড়াতে দেবে, দোকানটীর ফটো নেব ? তখনি সে মেয়েটীকে এনে মাথার চুল, তার পোষাক বেশ গোছ-গাছ করে ফুলের দোকানটীর সামনে বেশ ভাবমত দাঁড় করিয়ে দিল। অপরিচিতের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার আমাদের দেশে আশা করা যায় কি ?

*

রিজেণ্টস্ পার্কের একটী অংশে বহু কাঠবিড়াল, নানা রকমের পাখী স্বাধীন ভাবে চরে বেড়ায়। তারা মানুষ দেখে ভয় করে না, কখন কখন হাত থেকে খাবার নিয়ে খায়। মাত্র কয়েকটী নোটীশ দেওয়া আছে—'কোন জন্তুকে কেহ বিরক্ত করিও না।'—এরই বলে জীব জন্তুরা মানুষকে ভয় করে না। দেশের আইন কানুন সাধারণে কেমন মেনে চলে, তা এ থেকেই বোঝা যায়।

*

একদিন রাস্তায় একটা মেথরকে জিজ্ঞাসা করলাম—চুল কাটাবো কোথায় ? সে আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝল যে বিদেশী ; তখন সে তার ঝাড়ু সেখানেই ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে তিন চার মিনিটের পথ দূরে একটা হেয়ার-কাটার স্যালুনে উপস্থিত করে চুলকাটার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আনন্দে হাসতে হাসতে বিদায় হল। ম্যাথোর কি আর ম্যাথোর !

*

১৯১৯ সালে ১১ই নবেম্বর বেলা এগারটা এগার মিনিটের সময় গত জার্ম্মান মহাযুদ্ধের শান্তি স্থাপন হয়। তাই প্রতি বৎসর ঠিক ঐ দিনে ঐ সময় দু' মিনিট নিস্তব্ধ থেকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবার রীতি আছে। ঐ দিন দেখলাম, ঠিক লোকজন ঘরে বাইরে যে যে অবস্থায় ছিল এগারটা এগার মিনিটের সময়ে একেবারে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে রইল। রাস্তার গাড়ী ঘোড়া, লোকজন সবই স্থির।—বুঝলাম নিয়মানুবর্ত্তিতাই এ সব দেশকে বেশী করে শক্তিশালী করে তুলেছে।

দু'টি ভারি জিনিস নিয়ে আমাকে ট্রেণ থেকে নামতে হবে দেখে ট্রেণের একটি বারো বছরের ছেলে হাঁ করে একটি জিনিস প্লাটফর্ম্মে নাবিয়ে দিয়ে ট্রেণে তার যায়গায় গিয়ে বসল।—এমন অযাচিত সাহায্য ওদেশে খুবই প্রচলিত।

লণ্ডনে এক সময় যে গৃহস্থ বাড়ীতে থাকতাম, সেই বাড়ীর কর্ত্তার মেয়ের নিকট আমাদের বাংলার পদ্মার পোলের গুরুত্ব বর্ণন করছিলাম। পোলটি তৈরীর জন্যে জগতের অনেক বড় বড় জাতিকে জানান হয়েছিল কিন্তু সমর্থ হবে না বলে কেউ এগোয় নাই—তারপর জার্ম্মানীরা গিয়ে করে দিয়েছিল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল—ইংরেজ জাতিকে বলা হয়েছিল? আমি বললাম, হাঁ হয়েছিল। শুনে মেয়েটির মুখ ভার হয়ে গেল; সেদিন আর অন্য দিনের মত হেসে খেলে গল্প করতে পারল না। দেখলাম, তের বছরের মেয়েটির প্রাণও তার জাতির মান অপমানের সঙ্গে গভীর ভাবে বাঁধা।

ঐ পরিবারের কর্ত্তার নিকট একদিন কথাবার্ত্তায় আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা সামান্য বিষয় তুলেছিলাম। সেই কথাটা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে তাঁরা তাঁদের সেই সাধারণ পরিবার থেকে রাশি রাশি বই বের করে দু' ঘণ্টা পরিশ্রম করে নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি বের করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।—সামান্য বিষয়টি নিয়েও যারা এত অনুসন্ধিৎসু, বড় বড় বিষয়ে তারা কত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করে!

*

আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলের একটা বড় ষ্টেশনে একজন সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—অমুকখানে যাব, কোন প্লাটফর্ম্মের গাড়ীতে উঠতে হবে। সে যে প্লাটফর্ম্মের কথা বলেছিল, সেখানে গিয়ে জানলাম, সে প্লাটফর্ম্ম নয়। তখন একজন রেল কর্ম্মচারী আমাকে ঠিক প্লাটফর্ম্মে পৌছিয়ে দিল। একটু পরেই দেখি পূর্ব্বের সেই ব্যক্তি ব্যস্তভাবে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমাকে পেয়েই বলল—আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়েছিলাম, ক্ষমা করবেন। আপনাকে বলার পর আমার একটু সন্দেহ থাকায় ষ্টেশনে জেনে আপনাকে ঠিক সংবাদ দিতে খুঁজছি। কর্ত্তব্যজ্ঞান এমনই থাকা চাই বটে।

দ্বাদশ অধ্যায়

[বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন]

বিবরণ

১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে লণ্ডন নগরে এই বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন সম্পন্ন হয়। এটি বিলাতের, এমন কি সমগ্র জগতের একটি



প্যালেস অব ইণ্ডাষ্ট্রি [২৫৯ পৃষ্ঠা]

বিশেষ বড় রকমের ঘটনা। এমন বিরাট প্রদর্শনী এর পূর্ব্বে পৃথিবীতে আর কোথাও হয় নি। এই প্রদর্শনীটি দেখবার জন্যেই আমি এই সময়

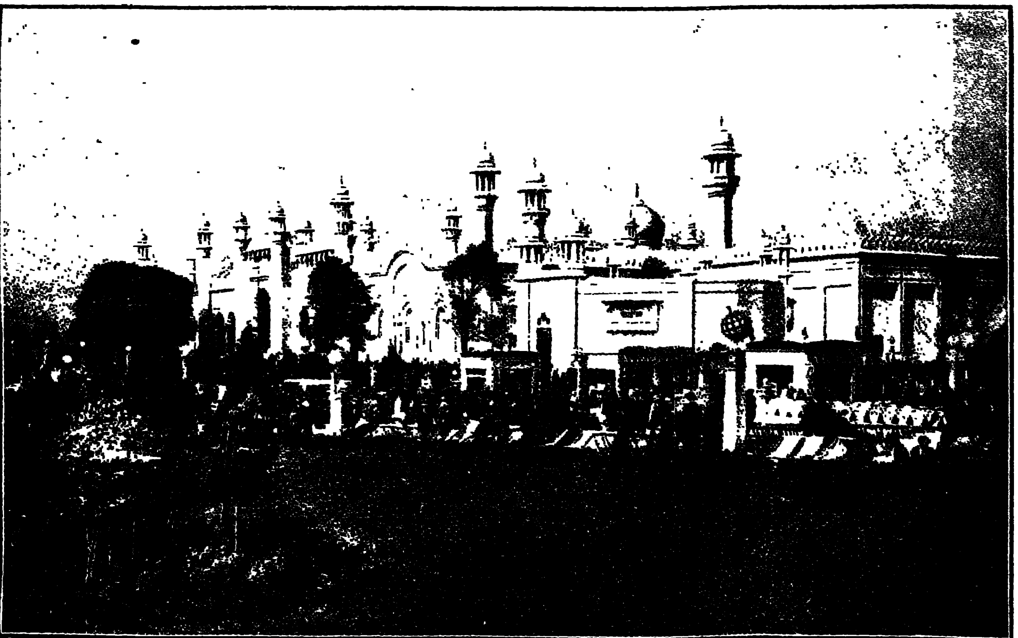
বিলাতে যাওয়া মনোনীত করেছিলাম। এতে আমাদের ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কসের যে ষ্টল হয়েছিল, তার কাজকর্ম্মের বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রদর্শনীটি বসেছিল লণ্ডন সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ওয়েম্ব্লী নামক রমণীয় পার্ব্বত্য উদ্যানের কয়েক মাইল পরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যে। প্রদর্শনী ক্ষেত্র এবং এর ঘর বাড়ী এমনই বিরাট আয়োজনে প্রস্তুত হয়েছিল যে, এটি লণ্ডনের উপপ্রান্তে পৃথক একটি শোভনীয় নগরে পরিণত হয়ে আছে, আর এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর গুরুত্বের সাক্ষ্যরূপে বরাবরই স্থায়ী হয়ে রয়ে গিয়েছে।

সকলেই জানেন, পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের বেশী স্থান নিয়ে ইংরেজের রাজত্ব, এই বিশাল ভূভাগ হতে যেখানকার যা আনা সম্ভব, তা সমস্তই এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই প্রদর্শনীর উদ্যান, রাস্তা, রঙ্গ-ভবন (Stadium), প্রমোদোদ্যান (Amusement Park) প্রভৃতি প্রস্তুত করতেই এককোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পনর কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর—এই ছয় মাসের মধ্যেই দেশ বিদেশ থেকে কমবেশী আড়াই কোটি নরনারী এই প্রদর্শনীর দর্শকরূপে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। যদিও এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন', তথাপি জগতের সমগ্র শিক্ষিত জাতির সহায়তায় এটিকে একটি আন্তর্জ্জাতিক (Inter-national) একজিবিশন বললেও বলা যায়। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নানা জাতি তাদের দ্রব্য সামগ্রী এখানে পাঠিয়েছিল।

প্রায় পনর-ষোল বৎসর পূর্ব্ব হতে এই প্রদর্শনীর কল্পনা আরম্ভ হয়। তারপর ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর পাঁচ ছয় বৎসর এর আয়োজন বন্ধ থাকে; তারপর ১৯২০ সাল থেকে পুনরায় আয়োজন করে



ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ন

২৬ পৃষ্ঠা

১৯২৪ সালের ২৩শে এপ্রিল তারিখে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক এর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।

এই প্রদর্শনীতে বৃটিশ রাজত্বের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির জন্যে পৃথক আকারের এক-একটি Pavilion বা উদ্যান সমন্বিত বিশালায়তন বাড়ী তৈরী হয়েছিল এবং সেই বাড়ীটি নিয়ে সেই সেই রাজ্যের যাবতীয় দর্শনীয় বস্তু সাজানো হয়েছিল।

ক্যানাডা, নিউ ফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ইণ্ডিয়া, বর্ম্মা, নিউজিলণ্ড, হংকং প্রভৃতির এক-একটি প্যাভিলিয়নে উপস্থিত হলে সত্যই মনে হত যেন সেই দেশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ; এই রকম সমগ্র প্রদর্শনীটি ঘুরে এলে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরে এলাম বলে মনে হত। মোট কথা বিভিন্ন দেশের এক একটি প্যাভিলিয়নে ঐ ঐ দেশ সম্বন্ধীয় মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ছাড়া প্যালেস্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রি, প্যালেস্ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং, প্যালেস্ অব্ আর্ট, অ্যামিউজমেণ্ট পার্ক প্রভৃতি কতই যে ছিল, তা বর্ণনাতীত।

এই সব দেখে মনে হ'ত যে সমগ্র পৃথিবীর যত রাজ্যের যা কিছু দেখবার আছে বা থাকতে পারে, তা সমস্তই দেখা হল। বলতে কি, এক বৎসর কঠোর পরিশ্রমে ভূগোল মুখস্থ করে যা না শেখা যায়, এই প্রদর্শনীর উপর একবার চোখ ফেললেই তার বেশী শেখা যেত। প্রদর্শনীর প্রত্যেক ষ্টলের সম্মুখে নানাপ্রকার দ্রষ্টব্য জিনিস সাজানো, আবার তার পাশেই বা পিছনেই কেমন করে সে-সব জিনিস প্রস্তুত হয় তাই দেখানো হয়েছিল। জগতের সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নানাজাতির অধিবাসীর পরিচয় এই প্রদর্শনীতে পাওয়া গিয়েছিল।

এই প্রদর্শনীতে ঘর-বাড়ী, দুয়ার-জানালা, বাগান রাস্তা সমস্তই এক-একটী বিরাট এবং অদ্ভুত কীর্ত্তি। স্থাপত্যের গুরুত্বই বা কত, সে-সব

বাড়ীর কারুকার্য্যই বা কত ! কোন বাড়ী প্রাচীন গ্রীক্‌দের বাড়ীর মত গঠিত হয়েছিল, কোনটা বা মিশরবাসীদের বাড়ীর মত তৈরী হয়েছিল ; কোনটা Gothic styl-এ, কোনটা বা Byzanthian ধরণের। এই প্রদর্শনীতে ইংরেজ রাজত্বের নৌবল, সেনাবল, আকাশবল (Air force) প্রভৃতি বিশেষভাবে দেখানো হ'য়েছিল। সমগ্র বৃটিশ রাজ্যের আদান-



বেঙ্গল কোর্টের একাংশ [২৬২ পৃষ্ঠা]

প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসনপ্রণালী প্রভৃতি এখানে বুঝিয়ে দেখানো হয়েছিল। এরোপ্লেন কেমন করে তৈরী হয়, কেমন করে আকাশে ওড়ে, কেমন করে শত্রুদের [illegible]র বোমাগুলি নিক্ষিপ্ত হয়, তা সমস্তই দেখানো হয়েছিল। প্রদর্শনীর উপর কত এরোপ্লেন এই ভাবে দর্শকদের একই কালে

ভীতি ও আনন্দের সঞ্চার করেছিল। এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে যুদ্ধ কেমন করে হয় তাও মাথার উপরে শূন্যে দেখানো হয়েছিল।

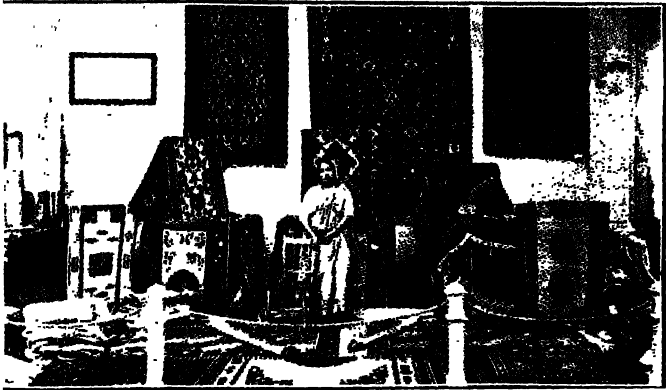
অনেকেই শুনে স্তম্ভিত হবেন যে, এই প্রদশনীর মধ্যে এক জায়গায় একটা কৃত্রিম সমুদ্র গঠিত হয়েছিল। এই বিশাল জলাধারের জলরাশি কলকব্জার বলে এমন ভাবে আলোড়িত হত যে, দেখে মনে হত যেন সত্যসত্যই সমুদ্র সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার উত্তাল তরঙ্গরাশি দেখছি। সেই সমুদ্রের উপরে অনেক জলযুদ্ধও দেখানো হয়েছিল। প্রদশনীর আর এক স্থানে পৃথিবীর জলস্থলময় এক বিশাল চিত্র দেখানো হয়েছিল, তাতে একশো বৎসর পূর্ব্বেকার ইংরেজ রাজত্বের গতি দেখানো হয়েছিল। তারমধ্যে ছোট ছোট খেলনা জাহাজের মত জাহাজগুলো আপনাআপনিই এ বন্দর হতে সে বন্দরে গতিবিধি করছিল। কেমন করে’ ক্রমে ক্রমে এই বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছে, কেমন করে বনজঙ্গল সাফ করে সহর স্থাপিত হয়েছে—তা নানাভাবে দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ইহা ব্যতীত দিবারাত্র কত বায়স্কোপ, ম্যাজিক লণ্ঠন যে দেখানো হত তার ইয়ত্তা নেই। অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইংরেজরা যে সব দেশ অধিকার করেছে, সেটি একেবারে বাস্তবের আকারে অভিনয় করে দেখানো হয়েছিল। কত হতাহত, কত গ্রাম ও নগর পোড়ান’—সত্যমিথ্যার সাহায্যে সব সত্যের মত দেখানো হয়েছিল।

প্রতি দিন নতুন নতুন এতই বিভিন্ন রকমের বিষয় দেখান হত যে, যে যে বিষয় দেখান হবে তার দৈনিক তালিকার দাম ছিল তিন আনা করে। এই মত প্রত্যেক দিনের প্রোগ্রাম সেই দিন সকাল বেলা বিক্রি হত।

এখন আমরা প্রদর্শনীর প্রধান প্রধান [illegible]গুলির কিঞ্চিৎ বর্ণন করি—

প্যালেস্ অব্ ইণ্ডা

সমগ্র গ্রেট বৃটনের মধ্যে কোথায় কি দ্রব্য প্রস্তুত হয় তা এখানে দেখানো হয়েছিল। ডাক্তারি শাস্ত্রের ও রসায়ন শাস্ত্রের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সাজাতে প্রায় ৩৭৫০০ স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। তূলা, কাপড় প্রভৃতি সাজাতে প্রায় ৩২১৮৭ স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। তূলা কেমন করে জমিতে রোপিত হয়, তূলার গাছ কেমন দেখতে, কেমন করে



বাঙ্গালী মহিলার তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল কোর্টের বস্ত্র-বিভাগ [২৬৪ পৃষ্ঠা]

গাছ হতে তূলা তোলা হয়, তূলা হতে কেমন করে সূতা তৈরী হয়, সূতা হতে কেমন করে কাপড় তৈরী হয়, তা সমস্তই বিশদভাবে এখানে বোঝানো হয়েছিল। পশমজাত দ্রব্যাদি (Woolen textile) সাজাতে প্রায় ১৫০০০ স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। ঘড়ি, বাদ্য-যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, কাগজ, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি, সিগারেট, রবর, খেলার সরঞ্জাম,

কাচ চামড়ার দ্রব্যাদি ও আসবাব পত্র, লেশ প্রভৃতির পৃথক পৃথক এক একটি বিভাগ এই ইণ্ডাষ্ট্রি প্যাভিলিয়নে স্থান পেয়েছিল।

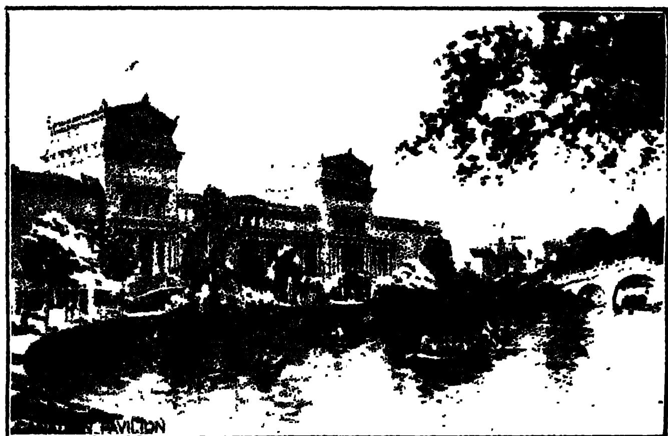
প্যালেস্ অব্ ইঞ্জিনিয়ারিং

এত বড় কঙ্কি্রটের তৈরী বাড়ী পৃথিবীর আর কোথাও নির্ম্মিত হয় নি। এই বাড়ীখানি তৈরী করতে এককোটি স্কোয়ার ফুট জমি লেগেছিল। এই বাড়ীর মধ্যে সত্যিকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইঞ্জিন ও রেলগাড়ী রেল-লাইনের উপর দিয়ে ভীষণ বেগে চলাফেরা করে দর্শকদের মনে আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। এই বাড়ীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য আসল রেললাইন পাতা হয়েছিল। মাথার উপর দৈত্যতুল্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁচটি ক্রেন (Crane) ইঞ্জিন, প্যাসেঞ্জারগাড়ী, মালগাড়ী, সমস্তই শূন্যে তুলে ধরে দর্শকদের ইঞ্জিন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এই বাড়ীর মধ্যে কৃত্রিম ডকের মধ্যে কেমন করে জাহাজ তৈরী হয়, কেমন করে পোল বাঁধা হয়—তা সবই বিশদভাবে বোঝানো হয়েছিল। ইলেক্ট্রিসিটির গুণে যা-কিছু সম্ভব-অসম্ভব হতে পারে, তা সমস্তই এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। ইহা ব্যতীত মোটর গাড়ী, মোটর সাইকেল প্রভৃতি কেমন করে তৈরী হয়—এসবও বুঝিয়ে দেখানো হয়েছিল।

ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ন

বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে যতগুলি বিভিন্ন দেশ সম্পর্কীয় পৃথক পৃথক বাড়ী নির্ম্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের বহির্দৃশ্য

সব চেয়ে সুন্দর হয়েছিল। এই বিশাল মনোরম সৌধটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় মোগল রাজত্বের স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে গড়া হয়েছিল। আগ্রার তাজমহল, মতিমস্‌জিদ, দিল্লীর জুম্মামস্‌জিদএর ভাবগুলি এই প্যাভিলিয়নটিতে প্রকটিত হয়েছিল। সাড়ে তিন একর অর্থাৎ দশ বিঘা জমির উপর এই বৃহদায়তন অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হয়েছিল। এর চতুষ্পার্শ্বের উদ্যান-বাটি নিয়ে মোট চৌদ্দ বিঘা জমি ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের শোভা-



ক্যানাডা প্যাভিলিয়ন [২৭২ পৃষ্ঠা]

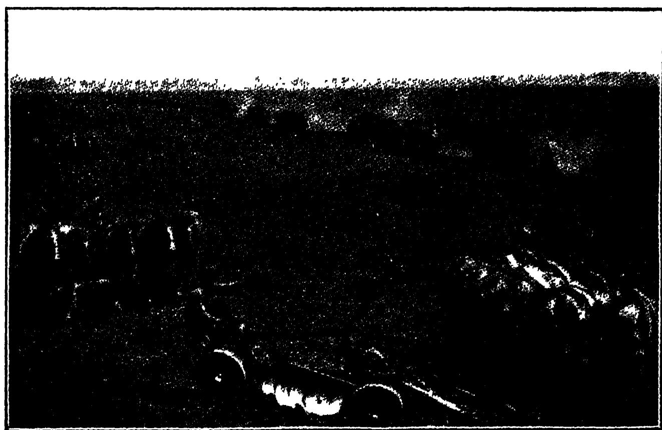
বর্দ্ধন করেছিল। এতে ব্যয় হয়েছিল ২৫,২০,০০০ টাকা। বাড়ীর মাঝখানে একটি জলাশয় ছিল। চারদিকে ভারতের সাতাশটি বিভিন্ন প্রদেশের জন্য এক-একটি পৃথক কোর্ট বা বৃহদায়তন অংশে বিভক্ত হয়েছিল। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, বাংলা, যুক্তরাজ্য, কাশ্মীর—এই কয়েকটি কোর্টই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়ে বোম্বাই, ব্যবসা বাণিজ্য

ও দোকান-পসারের দিক দিয়ে পাঞ্জাব ভাল হয়েছিল। বেঙ্গল কোর্টটি মোটের উপর তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। বিহার ও উড়িষ্যা কোর্ট বাংলার নিকটেই তৈরী হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন বরোদা, ত্রিবাঙ্কোর, জয়পুর, যোধপুর, মহীশূর, ইন্দোর, বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের এক-একটি ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত কোর্ট নির্ম্মিত হয়েছিল। প্রদর্শনীতে ভারতের যে সকল জিনিস গিয়েছিল, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে এর বিবরণ জ্ঞাত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

ভারতের খনিবিভাগ, বনবিভাগ, উৎপন্ন শস্য, রেলওয়ে গতিবিধি, সরকারী সৈন্যবিভাগ—এর একটা পরিষ্কার বিবরণ এই একজিবিশন হতে পাওয়া গিয়েছিল। ভারতীয় কতকগুলি বিশেষ দৃশ্যের ছবি ইণ্ডিয়া প্যাভিলয়নে স্থাপিত হয়েছিল। হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের মডেল, খাইবার পাশের দৃশ্য, ত্রিবাঙ্কুর এবং যুক্তরাজ্যের ভীষণ বন—তন্মধ্যস্থিত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শিকারের দৃশ্য, হরিদ্বারের কুম্ভমেলার যাত্রীসমাগমের, অজন্তা গুহার জগৎবিখ্যাত ভাস্কর-শিল্পের নমুনা, ভারতের ইরিগেশন বা খাল-খনন ও জলসরবরাহের আংশিক দৃশ্য, জয়পুরের প্রস্তর-শিল্প ও কারুকার্য্যময় পিত্তল পাত্রাদি, মহীশূরের চন্দন কাষ্ঠের আশ্চর্য্য মনোহর কারুকার্য্য শোভিত দ্রব্যাদি, ত্রিবাঙ্কুরের গজ-দন্ত, কাশ্মীরের সূক্ষ্ম সূচীশিল্প, ঢাকার মস্‌লীন প্রভৃতি নানাভাবে ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের শোভাবর্দ্ধন করেছিল। ভারতীয় প্রেস-রুমে ভারতের প্রায় যাবতীয় সংবাদপত্র সংগৃহীত হয়েছিল। সেখানে ভারতের পঁচাশি রকম ভাষার নমুনা দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছিল। শিক্ষা, সমবায় বয়েজ-স্কাউট্, থিয়েটার, ভারতীয় খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ক নানা দৃশ্য এই প্যাভিলিয়নে স্থান পেয়েছিল।

ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের অন্তর্গত বেঙ্গল কোর্টে আমাদের বাংলার বহুবিধ

বিষয় যথা কৃষক-পল্লী, কলকাতার ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, খিদিরপুর ডক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি বড় বড় মডেল পৃথক পৃথক কামরায় সজ্জিত হয়েছিল। বাংলার কৃষিজাত সমুদয় দ্রব্যের জন্য একটি বড় ষ্টল হয়েছিল। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের কাপড়, তোয়ালে, রুমাল বেঙ্গল কোর্টে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। সমগ্র বাংলার কাঁসা পিতলের বাসনের একটা বড় ষ্টল হয়েছিল। ঢাকার শঙ্খের কার্য্য



অষ্ট্রেলিয়ার চাস [২৭০ পৃষ্ঠা]

ও তথাকার নবাব বাড়ীর কয়েকটি প্রাসাদের রৌপ্যনির্ম্মিত মডেল বেঙ্গল কোর্টকে অত্যুচ্চ স্থান দিয়েছিল। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের কার্য্য কৃষ্ণনগরের একজন শিল্পীকে দিয়ে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয় গুলিই গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রদর্শিত হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন পরিস্কৃত চামড়া, রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য, বাংলার নানা

ফারমের ঔষধ প্রভৃতি পৃথক পৃথক সেই সেই ফারম কর্ত্তৃক বাংলা থেকে প্রেরিত হয়েছিল।

বাংলা থেকে একমাত্র আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসই সম্পূর্ণ নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল।

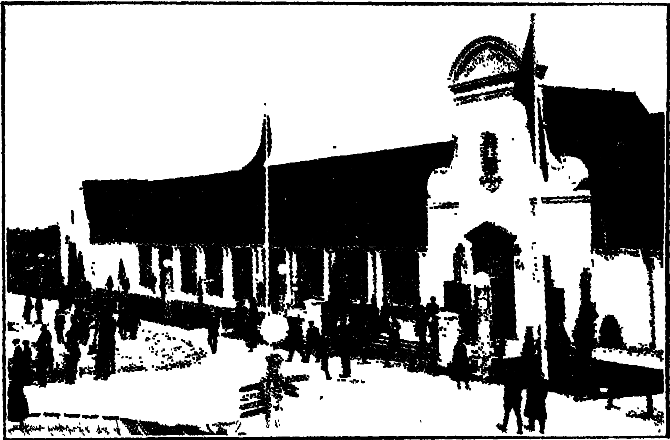
ভারতের যে সমুদয় শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধীয় দ্রব্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হতে ও পৃথক পৃথক প্রদর্শকগণ কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নে উপস্থিত করা হয়েছিল, তার একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে এগুলি আমাদের ভারতবাসীর পক্ষে মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয়।

বঙ্গদেশ—

পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত পাট, শণ, তূলা, রেশম, রংকরা তসর ও গরদ, রেশমজাত দ্রব্য, কার্পেট, কম্বল, মাদুর, মেজে-মোড়া পুরু কাপড়, চরকা ও চরকার সূতা, লেশ ও লেশের নানাপ্রকার সাজসজ্জা, চামড়া, ট্যান্ করা চামড়া ও তৎজাত দ্রব্যাদি, স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্যের আসবাব ও বাসন প্রভৃতি, হস্তী-দন্তের নানাবিধ কারুকার্য্য, স্বর্ণমণ্ডিত হস্তীদন্তের শাঁখা, বালা, তাগা প্রভৃতি। হস্তী-দন্তের মালা, খেলনা, মূল্যবান নানাপ্রকার মূর্ত্তি, সেফ্‌টিপিন, লকেট, পেণ্ডেণ্ট্, শঙ্খের বালা, বাদ্যশঙ্খ, ঝিনুকের ও মহিষশৃঙ্গের নানাপ্রকার দ্রব্য, কাঁসা পিতলের নানাপ্রকার বাসন, মাটির তৈরী মডেল ও নানাপ্রকার মৃৎশিল্প, মশলা, গঁদ, রজন্, ধূনা, নানাপ্রকার তৈল, শাল সেগুন প্রভৃতি কাঠ ও বনবিভাগীয় নানাপ্রকার উৎপন্ন দ্রব্য ; ধান, চাউল, কলাই, সরিষা, যব প্রভৃতি নানা জাতীয় শস্য, খাদ্য, বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি।

বিহার ও উড়িষ্যা-

বস্ত্র ও লেশ, রেশম, চামড়া, চামড়ার তৈরী জিনিস, মহিষশৃঙ্গের নানা-প্রকার খেল্‌না, রূপার বাসন, কটক ও গয়ার পাথরের সূক্ষ্ম খোদাই কাজ, নানাজাতীয় শস্য, পাথুরে কয়লা, নানাজাতীয় আকরিক দ্রব্য, মহুয়া প্রভৃতি।



সাউথ্ আফ্রিকা প্যাভিলিয়ন [২৭২ পৃষ্ঠা]

বোম্বাই-

কৃষি, জলসেচন বিভাগ, শিল্প বিভাগ, হাইড্রো-ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে বম্বে সহরের ধূম দূর করার প্রণালী, বম্বে আর্ট স্কুল ও ইণ্ডিয়ান উলেন মিলের প্রদর্শনী, বম্বে ব্যাক্-বে (Back-bay) খননের মডেল, বম্বে ডকের মডেল, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি।

মান্দ্রাজ—

খাদ্যসম্ভার, তৈল বীজ, আঁশ (Fibres), মশলা, টিনে ভরা মৎস্য, ইক্ষুগুড়, তালের গুড়, মিষ্টান্ন, চাউল, বড় আকারের কলা, তৈল, শুষ্ক নারিকেল, দক্ষিণ ভারতীয় মসলা ও আচার, ধান্য ও যবাদি শস্য, জ্যাম জেলী, নানাপ্রকার মৎস্য, তূলা, রেশম, পশম, ঘাসের মাদুর, নারিকেল কাতা, পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত চর্ম্ম ও চর্ম্মনির্ম্মিত জিনিসপত্র, সাবান, রং, গন্ধদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, এমারতের সরঞ্জাম প্রভৃতি।

কাশ্মীর—

নানাবিধ শস্য, ফল, শুষ্ক ফল, পশু-প্রদর্শনী, বন বিভাগীয় উৎপন্ন দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, ধাতুদ্রব্য, চামড়া, লোম, বস্ত্র, সূচের কারুকার্য্যময় বস্ত্র, মূল্যবান প্রস্তর, মূল্যবান প্রস্তরের উপর খোদাই কাজ, জহরৎ, চিত্রকার্য্য প্রভৃতি।

বরোদা—

রক্ষিত ফল, নানাবিধ তৈলবীজ, কাষ্ঠ, রেশম, উল, তূলা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্য, জরির কাজ, রেশম-সূতায় সূক্ষ্ম সূচীশিল্প, সূতার সূক্ষ্ম সূচীশিল্প, ট্যান্‌করা চামড়া, বেতের কাজ, ইমারত প্রস্তুতের সরঞ্জাম, পিতলের জিনিস, কাঠের জিনিস, খেলনা, মৃৎপাত্র, ফটোগ্রাফ, মানচিত্র ইত্যাদি নানা দ্রব্য।

জয়পুর—

হস্তী-দন্ত, স্বর্ণ, রৌপ্য, মার্ব্বেলপাথর, কাষ্ঠ, কাগজ প্রস্তুতের উপাদান,

জুয়েলারী, লৌহ ইস্পাত পিতল প্রভৃতির উপর এনামেল করা, মৃৎপাত্র, চিত্রশিল্প, জুতা, কম্বল ও রেশমের সূতা প্রভৃতি।



আফ্রিকার অধিবাসী—কাফ্রি বালক [২৭২ পৃষ্ঠা]

বিকানীর—

খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্য, বনবিভাগীয় দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, নানাজাতীয় আকরিক প্রস্তর, উল ও তূলাজাত দ্রব্য, এম্ব্রয়ডরী, রেশমশিল্প, রৌপ্য-শিল্প, হস্তী-দন্তের কাজ, কাঁচ ও মৃৎশিল্প, কাঠের বার্নিস, নানাবিধ পাথরের জিনিস, ধাতুদ্রব্য, পিতল, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি।

মহীশূর—

নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্য, রক্ষিত খাদ্য, বনবিভাগীয় ও আকরিক দ্রব্যাদি, বস্ত্র, চর্ম্ম, চন্দন, তৈল, কালি, সাবান, পিতলের বাসন, পিতল স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য, চন্দনকাষ্ঠের নানাবিধ কারুকার্য্যময় আসবাব, বাদ্যযন্ত্র, হস্তী ধরিবার খোঁয়াড়ের মডেল।

ত্রিবাঙ্কোর—

রক্ষিত মৎস্য, রক্ষিত ফল, নানাবিধ মসলার গুঁড়া, মসলার আরক, সাগু, বার্লি, এরারুট, নানাবিধ আকরিক দ্রব্য, তূলার আঁশ, কলার আঁশের কাপড়, নারিকেলের দড়ি, আঁশের ব্রুশ, জুতা, রাসায়নিক দ্রব্য এবং সুগন্ধি দ্রব্য, কাগজ, রৌপ্য ও স্বর্ণের দ্রব্য, কাঁসার দ্রব্য, কাঠের হস্তী-দন্তের খোদাই কার্য্য।

পাঞ্জাব—

নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্য, তৈল, তৈলবীজ, দাইল, গাজা, আফিং, মসলা, খেজুর গুড়, আচার, চাটনি, পশুর খাদ্য শুষ্ক ঘাস, কৃষিকার্য্যের যন্ত্র কোদাল, কাস্তে, লাঙল প্রভৃতি জলন্ধর ও হোসিয়ারপুরের কাঠের কারুকার্য্য, ডেরাগাজিখার লাক্ষার বাসন, হস্তী-দন্তে নির্ম্মিত নানাপ্রকার পাখী ও জীবজন্তুর মডেল, পিতলের কারুকার্য্য, রূপা ও সোণার জরি, শাল, রেশম, রং, ছবি, খেলার সরঞ্জাম প্রভৃতি।

পাতিয়ালা—

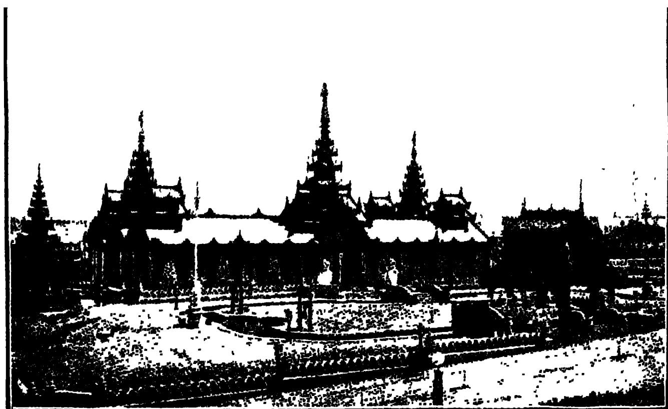
খাদ্য, কাষ্ঠাদির আসবাব, বনবিভাগীয় দ্রব্যাদি, আকরিক দ্রব্যাদি, নানাপ্রকার প্রস্তরের নমুনা, প্রস্তর-জাত দ্রব্যের নমুনা, মৃত জীবজন্তু, বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতুর দ্রব্যাদি।

ভরতপুর—

কৃষিজাত দ্রব্য, বনবিভাগীয় দ্রব্য, রেশমী বস্ত্রাদি, মৃৎপাত্র, প্রস্তরের খোদাই, কাঠের খোদাই করা কারুকার্য্য প্রভৃতি।

কচ্ছ ও কোলাপুর—

কৃষিজাত উৎপন্ন, বস্ত্র, প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি।



বর্ম্মা প্যাভিলিয়ন [২৭৪ পৃষ্ঠা]

যোধপুর—

বস্ত্র, চর্ম্ম, চর্ম্মজাত দ্রব্যাদি, সুগন্ধি দ্রব্য ও নানাবিধ শিল্পদ্রব্যাদি।

কাথিয়াবাড় ষ্টেট—

নানাবিধ পোষাক, হাতীর দাঁতের ছড়ি, হাতীর দাঁতের ও পাথরের মালা, কাঠের আসবাব প্রভৃতি।

ইন্দোর—

কৃষিজাত ফসল, তৈলবীজ, তূলা, খনিজদ্রব্যাদি

খইরপুর (সিন্ধু)—

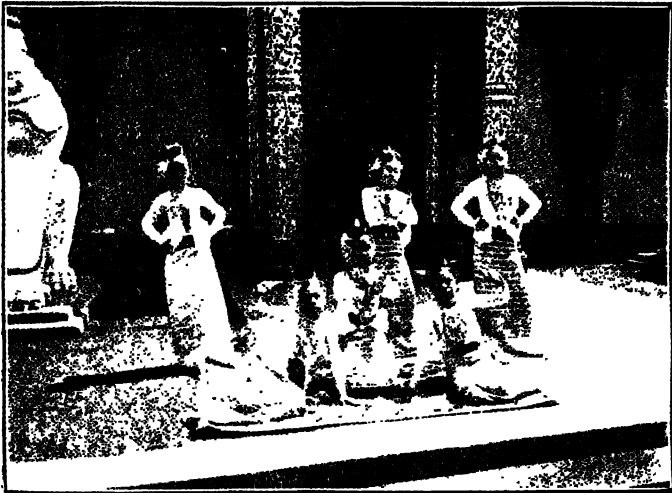
বস্ত্র, নানাবিধ লৌহশিল্প ও মৃৎশিল্প প্রভৃতি।

অষ্ট্রেলিয়া প্যাভিলিয়ন

এই প্যাভিলিয়নটি তৈরী হয়েছিল প্রায় ষোল বিঘা জমির উপরে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। এতে সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। এখানে কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ান রেষ্টুরেণ্ট বা হোটেল খোলা হয়েছিল। এই সব হোটেলে অষ্ট্রেলিয়া-জাত খাদ্য দ্রব্য মাত্রই পরিবেশন করা হত। রুটি, ফলমূল, মাখন, ডিম, মাংস—সবই এখানে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার অনেকগুলি মেরিণো ভেড়া (Merino Sheep) প্রদর্শিত হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান ব্যবসায় গরু-ভেড়া পালন। এই প্যাভিলিয়নে কেমন করে মাখন তৈরী হয়, কেমন করে ডিম ও মাংস অবিকৃত রাখা যায়—সে সব খুব ভাল ভাবে দর্শকদের বোঝান' হয়েছিল। এখানে এমন সুন্দর সুন্দর কতকগুলি বাগান সাজানো হয়েছিল যাতে অষ্ট্রেলিয়ার গাছপালা ছাড়া অন্য কোন গাছপালা দেখতে পাওয়া যেত না, বেড়াবার সময় মনে হত যেন অষ্ট্রেলিয়া দেশের বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছি। এই প্যাভিলিয়নে একটি মাখনের ছোট পাহাড় তৈরী করা হয়েছিল।

নিউজিলণ্ড্ প্যাভিলিয়ন

এখানে নিউজিলণ্ড দ্বীপের সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যই দেখানো হয়েছিল। এর মধ্যে নিউজিলণ্ডের মত বড় বড় বন্য বাগান তৈরী করা হয়েছিল। কেমন করে নিউজিলণ্ডবাসীরা মাছ ধরে ও শুকিয়ে রাখে, তা খুব ভালভাবে দেখানো হয়েছিল। বড় বড় জলাধারের মধ্যে খড়্গা মাছ



বর্ম্মা থিয়েটারে মেয়েদের নাচ [২৭৬ পৃষ্ঠা]

(Guard fish), রাজা মাছ (King fish) প্রভৃতি অদ্ভুত রকমের জীয়ন্ত মাছ দেখানো হয়েছিল। এ-ছাড়া নিউজিলণ্ডের পশম, চামড়া, লোম, রবার, মুরগী, হাঁস, কাঠ প্রভৃতি সকল জিনিসই এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিত হয়েছিল। বায়স্কোপের মধ্য দিয়ে নিউজিলণ্ড দ্বীপের

নৈসর্গিক দৃশ্য, পাহাড়, নদী, প্রান্তর ভূমি প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর ছবি দেখানো হয়েছিল। নিউজিলণ্ডের আদিম অধিবাসী মায়োড়িগণ (Maori) কেমন করে জীবনযাত্রা করে, তাদের আচার ব্যবহার—সবই দেখিয়ে বোঝান হয়েছিল।

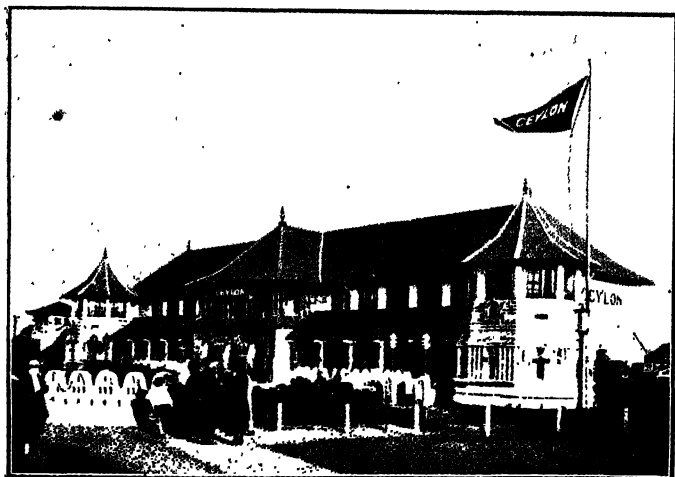
ক্যানাডা প্যাভিলিয়ন

এই বাড়ীখানি দেখতে যেমন প্রকাণ্ড, গুরুত্বেও তেমনি তত বেশী। প্রায় দেড় কোটী টাকা ব্যয়ে এই বিশাল বাড়ী তৈরী হয়েছিল। ক্যানাডার খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য যাবতীয় উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী এখানে সাজানো হয়েছিল। ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেল লাইন'যে কি অদ্ভুত, তা এখানে মডেল করে দেখানো হয়েছিল। সেই রেল লাইনের ট্রেণগুলি প্যাভিলিয়নের ভিতরে দেওয়ালের গা দিয়ে অনবরত যাতায়াত করছিল। মানচিত্রে সমস্ত ক্যানাডা রাজ্য অঙ্কন করে গতিশীল বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে ট্রেন চলা ও প্রত্যেক প্রধান প্রধান ষ্টেশনে ট্রেণ থামাবার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছিল।

সাউথ্ আফ্রিকান প্যাভিলিয়ন

এই বাড়ীটি প্রাচীন ওলন্দাজদের বাড়ীর মত তৈরী করা হয়েছিল। এই বাড়ীর সংলগ্ন উঠানে South African চলন্ত রেলগাড়ী তৈরী হয়েছিল, গাড়ীর মধ্যে খাবার ঘর, শোবার ঘর, বসবার ঘর—সবই ছিল। উঠানের আর একধারে একটা প্রকাণ্ড ঘেরা মাঠে অনেক উটপাখী

পাখীদের ডিম, তাদের পালকের নানা রকম কাজ—সমস্তই বিশদভাবে দেখানো হয়েছিল। বাগানে আফ্রিকার নানা গাছপালা রোপিত হয়েছিল। এ ছাড়া, আফ্রিকার পশম, পালক, ফল, ডিম, মদ, শুকনো ফল, খনিজ ধাতু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিত হয়েছিল।



সিলোন্ প্যাভিলিয়ন [২৭৬ পৃষ্ঠা]

দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হীরক খনির একটা নমুনাও (Model) এখানে তৈরী করা হয়েছিল ; কেমন করে খনি থেকে হীরক তোলা হয়, কেমন করে কাটা হয়, সাফ করা হয়, পালিশ করা হয়, এসব সুন্দর ভাবে বোঝানো হয়েছিল। বায়স্কোপের সাহায্যেও আফ্রিকার অনেক জিনিস দর্শকদের দেখানো ও বোঝানো হয়েছিল।

নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড প্যাভিলিয়ন

নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড উত্তর আমেরিকার একটি দ্বীপ। এই প্যাভিলিয়নে নিউফাণ্ড্ল্যাণ্ডের ফলমূল, খনিজ দ্রব্য, মাছ প্রভৃতি দেখানো হয়েছিল। তা ছাড়া, শিয়ালের চামড়া, সিল মাছের চামড়া, ভালুক-চামড়া, অটার-চামড়া, নেকড়ে-চামড়া প্রভৃতি এখানে রাশিকৃত ভাবে সাজানো হয়েছিল। নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ডের চামড়ার মত সুন্দর চামড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ পালিশ ও ট্যান করা সিল-চামড়াগুলো খুবই চমৎকার।

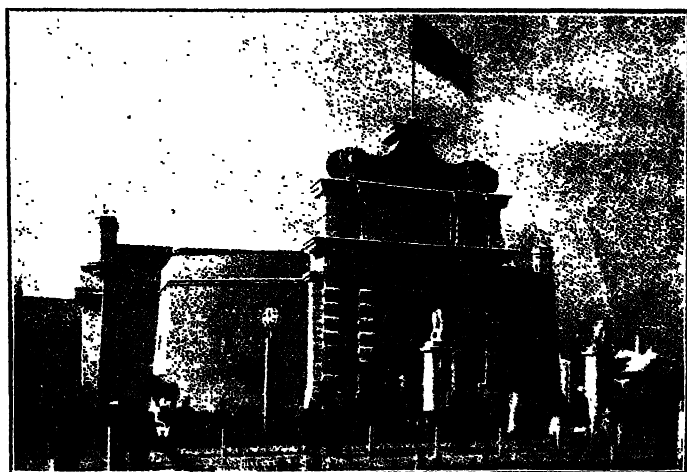
বর্ম্মা প্যাভিলিয়ন

ব্রহ্মদেশের সমুদয় বৈশিষ্ট রক্ষা করেই বর্ম্মা প্যাভিলিয়নটি তৈরী হয়েছিল। ব্রহ্মের প্যাগোডার আকারে অনেকগুলি বাড়ী তার মধ্যে ছিল। তার একটার মধ্যে বুদ্ধের বিরাট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে বুদ্ধের উপাসনার যাবতীয় সরঞ্জাম সেখানে রক্ষিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ আমাদের বাংলার সঙ্গে সংলগ্ন, চাকরী উপলক্ষে প্রায় দুই লক্ষ বাঙ্গালী সেখানে বাস করেন, কিন্তু তথাকার শিল্পবাণিজ্যের কোন সন্ধানই আমাদের কেউ রাখেন না। ব্রহ্মদেশের অনেক শিল্পী এবং ব্যবসায়ী প্রদর্শনীতে ষ্টল করেছিল; অনেকে কেবল একজিবিশনটি দেখতেই এসেছিল। এর মধ্যে শিক্ষিতা নারীই ছিলেন যাট জন।

ব্রহ্মদেশের শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে একজিবিশনে যা যা দেখা গেল, তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করব।

কৃষিজাত দ্রব্য—চাউল, তূলা, চিনে বাদাম, মটর, কলাই, বরবটি, ভুট্টা, এরোরুট, নারিকেল, নারিকেলের অাঁশ, রেশম, চিনি, নানাপ্রকার মশলা, তামাক, নানাপ্রকার ফল ইত্যাদি। এর মধ্যে চাউলই প্রধান. উৎপন্ন। চাউল তৈরীর জন্য আধুনিক উন্নত ধরণের অনেক ছোট ছোট কলে চাউল তৈরী করে দেখানো হয়েছিল।

বন বিভাগে বহু প্রকার কাঠের কড়ি, সেগুন এবং বাহাদুরী কাঠের



মাল্টা প্যাভিলিয়ন [২৭৮ পৃষ্ঠা]

নানাপ্রকার জিনিস, বর্ম্মার বাঁশ থেকে তৈরী কাগজ ও বোর্ড, কাঠের খোদাই করা মনোরম কারুকার্য্য প্রভৃতি স্থান পেয়েছিল।

খনিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাথর, কয়লা, রুবি নামক মূল্যবান লাল জুয়েলারী পাথর, জেড্ নামক হলদে রঙের জুয়েলারী পাথর প্রভৃতি এবং

ভাস্কর্য্যের উপযোগী নানাবিধ মূল্যবান পাথর এখানে উপস্থিত করা হয়েছিল।

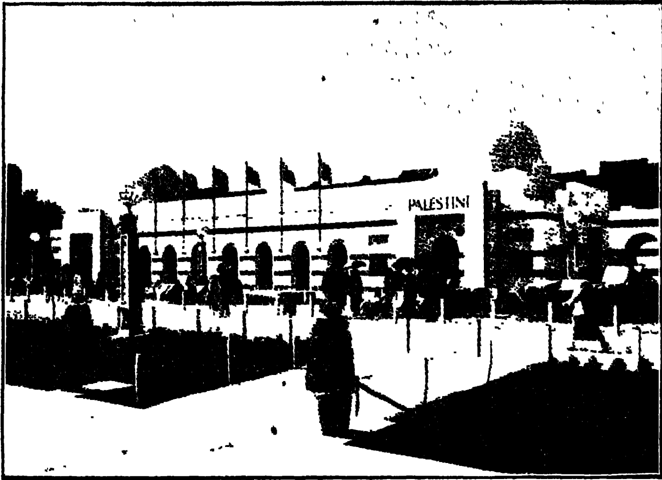
ব্রহ্মের মেটে তৈল, কেরোসিন তৈল, পেট্রোল প্রভৃতি বর্ত্তমানে একটি অতি প্রধান খনিজ দ্রব্য। এই সব তৈল উত্তোলন এবং Refine করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছিল। মোমবাতি তৈরী এখানে দেখানো হয়েছিল।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের নানাবিধ গৃহশিল্পজাত রেশমের দ্রব্য, হস্তিদন্তের কারুকার্য্য, ব্রোঞ্জধাতু এবং রূপার কারুকার্য্য এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। একটি থিয়েটার-হল প্যাভিলিয়নের পাশেই তৈরী হয়েছিল। ব্রহ্মের শিক্ষিত মেয়ে এবং পুরুষরা এখানে অভিনয় করতেন।

সিলোন প্যাভিলিয়ন

এটি সিংহলের অন্তর্গত কাণ্ডি নগরীর বিখ্যাত দন্ত-মন্দিরের অনুরূপ করে তৈরী করে সিংহলের স্থাপত্যের নিদর্শন দেখানো হয়েছিল। প্যাভিলিয়নের দ্বারদেশেই সিংহলের রাজধানী কলম্বো হারবারের ২০ × ১৫ ফিট একখানি চিত্র রাখা হয়েছিল। সিংহলের সমুদ্র থেকে কেমন করে মুক্তা তোলা হয়, কেমন করে পাহাড় থেকে মূল্যবান জহরৎ তোলা হয়—এই সকলের মডেল এখানে দেখানো হয়েছিল। সিংহলের মণিকারদের খুব বড় বড় দুটি ষ্টল এখানে হয়েছিল, তারা জহরতের অনেক অলঙ্কার এখানকার ধনীদের কাছে বিক্রয় করে বিশেষ লাভবান হয়েছে। সিংহলের নারিকেল, নারিকেল আঁশের তৈরী নানারকম জিনিস, নারিকেল তৈল, নারিকেল জাত নানাপ্রকার খাদ্য—এ সব বহুপ্রকার ভাগে ভাগ করে সাজানো হয়েছিল। সিংহলের বিখ্যাত

রবারের কারবারের নমুনা, বিখ্যাত চায়ের কারবারের নমুনা, মৎস্যের কারবারের নমুনা, কর্পূর ও কাষ্ঠ জাত নানাপ্রকার আসবাব, দারুচিনি প্রভৃতি এখানকার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছিল। Candyan Crafts Association সিংহলের পল্লী মেয়েদের হাতের তৈরী লেশ ও সূচীশিল্পের নিদর্শন দেখিয়ে দর্শকগণকে চমৎকৃত করেছিলেন।



প্যালেষ্টাইন প্যাভিলিয়ন [২৭৮ পৃষ্ঠা]

হংকং প্যাভিলিয়ন

এই প্যাভিলিয়নটিতে এলেই মনে হত যেন চীনদেশে এসে পড়েছি; সেই চীনবাসীদের কাঁইমাই ভাষা, সেই শুটকীমাছের গন্ধ। চীনদেশের ঘর বাড়ীর নমুনা, কাঠের খোদাই কাজ, বাঁশের ও বেতের আসবাব, লিচু প্রভৃতি নানারকম রক্ষিত ফল (Preserved Fruits), সুদীর্ঘ

ইক্ষুদণ্ড, নানাপ্রকার এনামেল বাসন খেলনা পুতুল প্রভৃতি এই প্যাভিলিয়নের দ্রষ্টব্য মধ্যে স্থান পেয়েছিল। এখানে চীনেদের যে হোটেলের নিদর্শন দেখানো হয়েছিল, তাতে অনেক বিদেশী দর্শক তাদের পোকামাকড় খাদ্যের রসাস্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল। অনেকগুলি হংকংবাসী চীনে-লোক এই সব কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল।

মাল্টা প্যাভিলিয়ন

মাল্টা ভূমধ্যসাগরের অন্তর্গত একটি ছোট দ্বীপ। এখানকার চামড়ার নানাবিধ দ্রব্য, কাঠের নানাবিধ দ্রব্য, পোষাক, সূচী শিল্প, অলঙ্কার, ঘড়ি প্রভৃতি এই প্যাভিলিয়নের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। প্রাচীন রোমীয়, ফিনিসীয় অনেক ঐতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক দ্রব্য এবং মডেল এই প্যাভিলিয়নের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। প্রাচীনকালের একখানি টেবিল উপস্থিত করা হয়েছিল, সেটি সাতাশ রকম বিভিন্ন কাঠের ১০৫১৬ খণ্ড কাঠে তৈরী, আর তার গায়ে বিভিন্ন রকমের ধাতুর সাজসজ্জা ছিল ১১৮৪ খানা।

প্যালেষ্টাইন ও সাইপ্রাস্ প্যাভিলিয়ন

প্যালেষ্টাইন এশিয়ার পশ্চিম খণ্ডের একটি প্রদেশ, যীহুদি জাতির প্রাচীন বাসভূমি। যীহুদি এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ একে পবিত্র দেশ (Holy land) আখ্যা দিয়ে থাকেন। প্যালেষ্টাইনের দ্রাক্ষা, সুরা, মৃৎশিল্প, পিত্তল তাম্র রৌপ্যাদি ধাতুশিল্প এখানে দেখা গিয়েছিল।

অন্যান্য প্যাভিলিয়ন

এতদ্ভিন্ন ইংরেজ রাজত্বের যে সমুদয় প্যাভিলিয়ন এই বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে স্থান পেয়েছিল তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—



নিউজিলণ্ডের স্বাস্থ্যবতী মায়োড়ি মেয়ে [২৭২ পৃষ্ঠা]

সাউথ আফ্রিকা, ওয়েষ্ট আফ্রিকা, নায়গ্রা, গোল্ডকোষ্ট, কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, জাঞ্জিবার, সোমালিল্যাণ্ড, সুদান, রোডেসিয়া,

সেণ্টহেলেনা, বাহামা, বৃটিশ হণ্ডুরাস, জামেকা, সেণ্টলুসিয়া, সেণ্টভিন্‌সেণ্ট, সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, পেনাঙ, পেবাক, সেলাঙ্গোর, সরওয়াক্, বার্ম্মুদা, বৃটিশ গিয়েনা, জিব্রালটর প্রভৃতি। প্রত্যেক প্যাভিলিয়নগুলিতেই সেই সেই দেশ সম্বন্ধীয় অনেক দেখবার ও শিখবার বিষয় ছিল। এইভাবে সারা জগতের ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, বাণিজ্য, দেশের রীতিনীতি, নানা বিষয়ক দৃশ্যাবলী ও আশ্চর্য্য বস্তু প্রভৃতিতে একজিবিশনটি একটি পূর্ণাঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

এম্পায়ার ষ্টেডিয়ম্ (Stadium)

ষ্টেডিয়ম্ একটি বিরাট দৃশ্যক্ষেত্র। এতবড় দৃশ্যক্ষেত্র পৃথিবীতে আর কোথাও এ পর্য্যন্ত তৈরী হয়নি। পরিধি প্রায় অর্দ্ধ মাইল। দর্শকদের জন্য চারদিকে স্তরে স্তরে ক্রম-উচ্চ আসনের যে গ্যালারী করা হয়েছিল তাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ—চার শ্রেণীতে একলক্ষ লোকের বসবার সিট্ ছিল। অভিনয়ের সময় এই সিট্‌গুলি ভ'রে গিয়ে অনেক লোককে দাঁড়িয়ে দেখতে হ'ত। অভিনয়ের জন্য মাঝখানে বিরাট ক্ষেত্র করা হয়েছিল। কখন কখন বারো হাজার সুশিক্ষিত অভিনেতা অভিনেত্রীর একত্রে অভিনয় এই ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি। দশহাজার গায়কগায়িকার মিলিত সঙ্গীত এখানে শুনতে পেয়েছি। এই সব অভিনয় দেখাবার জন্য ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জ্জেণ্টাইন, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের নানা স্থান থেকে অশ্বারোহী কুস্তিগীর প্রভৃতিও আনা হয়েছিল।

Commander Blake, Nelson প্রভৃতি বীরগণের বড় বড় নৌযুদ্ধের অভিনয়, ভারতীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক লর্ড ক্লাইভের অভ্যর্থনার

অভিনয়, আফ্রিকার অসভ্যজাতির দেশ অধিকার করিবার অভিনয়, এরোপ্লেনের যুদ্ধ, জীবজন্তুর অভিনয়, নানাবিধ বাজি পোড়ান, সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ প্রভৃতি এখানে বিরাট আয়োজনে দেখানো হয়েছিল। এই সমস্ত অভিনয়ের কার্য্যে ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষ থেকে কয়েকটি বড় বড়



পৃথিবীর প্রসিদ্ধ সপ্ত সুন্দরীর একজন—হেলেন অব ট্রয় [২৮৩ পৃষ্ঠা]

হাতী, আরব থেকে নানাপ্রকার ঘোড়া, আফ্রিকা থেকে উট প্রভৃতি আনা হয়েছিল। উপরে এরোপ্লেনের যুদ্ধ হবার সময় কখন কখন আকাশ এমন অগ্নিময় হয়ে যেত যে, দর্শকগণ ভয়ে চীৎকার করে উঠত। কামান

গোলাগুলি ছাড়বার সময় অনেক দর্শক কেঁপে উঠত। অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধাদি দেখাবার জন্য কৃত্রিম বনজঙ্গল, পাহাড় ও ঘরবাড়ী তৈরী করা হয়েছিল। কখন কখন অসভ্যদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়ে দৃশ্যক্ষেত্রকে সত্যসত্যই অগ্নিময় করে তোলা হ'ত।

একদিন দেখ্লাম, ষ্টেডিয়ম্ ক্ষেত্রে পল্লীর বয়স্কাউটদের খেলনা-প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। তাতে পল্লীর ছেলেমেয়েদের কৃত্রিম হাটবাজার, নাচগান, অভিনয়, নাগরদোলা, ঘোড়াকল—সবই ছিল। পল্লীর ছেলেমেয়েদের হাতের তৈরী নানারকম গৃহশিল্পজাত দ্রব্য তাতে উপস্থিত করা হয়েছিল। আর একদিন দেখলাম, প্রকাণ্ড চৌতালা একটা বাড়ী তৈরী করে, তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল, সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ফায়ার ব্রিগেট্ এসে সেই বাড়ীর তেতালা চৌতালা থেকে লোকজন নামিয়ে নিরাপদ করে দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বাড়ীটার আগুন নিভিয়ে দিল। এই উপায়ে বাড়ীতে আগুন লাগলে গৃহস্থের কর্ত্তব্য বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল।

এইরকম ষ্টেডিয়মে তিন-চার দিন ধরে এক-একটা অভিনয় হত। ষ্টেডিয়মের চারদিক থেকে নানারকমের আলো বেরিয়ে আকাশের মেঘগুলিকে কখন কখন লাল নীল রঙে রঙিন করে তুলত। এক বারের দেখবার টিকিটের দাম ছিল শ্রেণীভেদে এক পাউণ্ড থেকে এক সিলিং পর্য্যন্ত।

অ্যামিউজ্‌মেণ্ট পার্ক্

পঞ্চাশ একর অর্থাৎ প্রায় দেড়শো বিঘা জমীর উপর এই অ্যামিউজ্‌মেণ্ট্ পার্ক্ বা প্রমোদক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। অ্যামিউজ্‌মেণ্ট্ পার্কে গান, বাজনা, নাচ, কনসার্ট, খেলাধূলা অসংখ্য প্রকারের ছিল।

তার মধ্যে যে একটি নাচঘর তৈরী হয়েছিল, তাতে দু'হাজার নরনারী একত্রে নাচতে পারত। অ্যামিউজমেণ্ট্ পার্কের একটা বাড়ীর নাম ছিল—Palace of Beauty. পৃথিবীর দশটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর অনুকরণে দশটি সুন্দরী মেয়েকে সেই-সেই ভাবে সাজিয়ে দশটি কামরায় রাখা হয়েছিল। সুন্দরী রাণী ক্লিওপেট্রা (যার জন্য জুলিয়স্ সিজার ও এ্যাণ্টনি প্রভৃতির রাষ্ট্রবিপ্লব), বিয়াট্রিচি (যার জন্য মহাকবি দান্তে পাগল), জেহারাজেদ্ (পারস্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী), মেরী কুইন অফ স্কটস্, এলিজাবেথ উড্ভিল, মিসেস্ সিডন্, নেল গাডইন্, ম্যাডাম্ পম্বাডুর, হেলেন অফ্ ট্রয়, মিস্ '১৯২৪'—এই সব ঐতিহাসিক সুন্দরীদের অনুকরণে এবং তাদেরই সাজ-সজ্জায় ও আসবাবে দশটি মেয়ে দশটি ঘরে স্থান পেয়েছিল। এটা একটা চূড়ান্ত দর্শনীয় হয়েছিল।

প্যালেস্ অফ্ নেপচুন—এতে পৃথিবীর নানাজাতীয় মৎস্য স্থান পেয়েছিল। এই গৃহে সিল মাছের আশ্চর্য্য খেলা, জেলেনীদের কৌশলপূর্ণ সন্তরণ প্রভৃতি সুন্দরভাবে দেখানো হ'ত। বায়স্কোপের সাহায্যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মৎস্য শিকার, সিল মাছ শিকার, তিমি শিকার, তিমির তেল তৈরী প্রভৃতি দেখান হ'ত।

Safety Racer—একটা ছোট রেলট্রেণ অনেকগুলো লোক নিয়ে কৃত্রিম পাহাড় পর্ব্বতের ভিতর দেড় মাইল পথ অতিক্রম করে কখনো ধীর গতিতে, কখনো প্রায় জলপ্রপাতের মত উপর থেকে নীচে প'ড়ে মুহূর্ত্তমধ্যে যথাস্থানে চলে আসত।

River Cave—নৌকার যাত্রী নিয়ে কখন অদ্ভুত গুহার ভিতর দিয়ে, কখন উপর থেকে ভীষণ বেগে নেমে যথাস্থানে চলে আসত।

নাগরদোলা, ঘোড়া-কল, চরকী-কল প্রভৃতি বৈদ্যুতিক কলে চালিত যে কতরকম ব্যাপার ছিল—তার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আর

সেগুলি ছিল লোকে যা কখন দেখেনি এমনই আশ্চর্য্য ও বিরাট রকমে তৈরী।

একজিবিশনের নানা বিষয়

একটি ছিল Never-stop Railway. এটিতে দশ বারখানা গাড়ী ছিল, সারা একজিবিশনের নানা স্থান ঘুরে আসত। দশবারোটি ষ্টেশন ছিল, ষ্টেশনের কাছ দিয়ে খুব মৃদু গতিতে চলত; এই অবকাশে লোকজন ওঠানামা করত। এইরকম অবিরাম গতিতে কয়েকটি পৃথক পৃথক রেলগাড়ী সারা একজিবিশনটি ঘুরে আসত। এ গাড়ী চালাবার জন্য লোকজন ছিলনা—কলে আপনাআপনিই চলত। কেবল টিকিট নেওয়া দেওয়ার জন্য ষ্টেশনে লোক থাকত। এ ছাড়া একজিবিশনের ভিতরে ছোট মোটরবাস্ চলবারও ব্যবস্থা ছিল।

একটি কৃত্রিম কয়লার খনি করা হয়েছিল, তার মধ্যে আধমাইল পথ সুড়ঙ্গ কেটে কয়লা উত্তোলন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের কাজ দেখিয়ে সাধারণের কয়লা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

একটি সভাগৃহ করা হয়েছিল, তাতে প্রতিদিনই বিভিন্ন প্রকারের সভা হ'ত। প্রত্যেক প্যাভিলিয়নের সঙ্গে একটি করে সেই দেশের খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় রেষ্টুরেণ্ট করা হয়েছিল।

প্রত্যেক প্যাভিলিয়নের সঙ্গে সেই দেশ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নানাপ্রকার বায়স্কোপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

একজিবিশনের কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য বড় বড় দুটি ব্যাঙ্ক, তিনটি পোষ্ট আফিস, বিভিন্ন লাইনের ছয়টি রেল-ষ্টেশন এখানে করা হয়েছিল।

প্রতিদিন গড়ে তিনলক্ষ দর্শক একজিবিশন দেখতে আসত। লণ্ডন সহর থেকে অসংখ্য মোটর বাস্ একজিবিশনের জন্য নতুন নতুন লাইন খুলেছিল।

এই ওয়েম্বলীব একজিবিশনটির জন্য লণ্ডন সহর থেকে ওয়েম্বলী পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল ব্যবধানটুকু পূর্ণ হ'য়ে গিয়ে লণ্ডন সহরের আয়তন বৃদ্ধি করেছে, আর এই ওয়েম্বলীর উদ্যানটি পৃথক একটি সুন্দর ছোট সহরে পরিণত হ'য়ে রয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার করা, দেশের অন্ন সমস্যা, বেকার সমস্যার সমাধান করা—এই বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনের সাহায্যে ইংরেজ রাজত্বের এ সম্বন্ধে অনেক প্রসার লাভ হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[পত্রাবলী]

(সহধর্ম্মিণীকে লিখিত পত্রাবলী হইতে)

৭৩, ব্রণ্ডেস্‌বেরী ভিলা, কিলবর্ণ

লণ্ডন

১৮ই জুন, ১৯২৪

তোমার ২৫শে মে তারিখের চিঠি ১৫ই জুন পেয়েছি। বিলাতে এসে কোন অসুবিধায়ই আমাকে পড়তে হয় নি। বর্ত্তমানে একটি মধ্য অবস্থার গৃহস্থের বাড়ীতে আছি। এদের সঙ্গে এমনই ভাব হয়ে গেছে, যেন আমি এই পরিবারেরই একজন। লণ্ডনের রাস্তার দু'ধারে সুরম্য প্রাসাদাবলীর মাঝখান দিয়ে চলতে কতই কি নতুন নতুন দেখ্‌তে পাই; এত নিরবচ্ছিন্ন নতুনত্বের মধ্যেও প্রাণটি কিন্তু পুরাতনের জন্যই ব্যাকুল হয়।

একটা বিশেষ নতুন দেখছি এই যে, এখানে ইংরেজরা আমাকে নবাগত বিদেশী বলে একটু শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। সেদিন লায়ন সাহেব আমার কাছে এসেছিলেন, ইনি কিছুদিন আগে ঢাকা বিভাগের কমিশনার ছিলেন; দেশের কত সংবাদই জিজ্ঞাসা করলেন, কত মধুর আলাপই তাঁর সঙ্গে হল,—একেবারে বন্ধুর মত।

একদিন দেখলাম পরিষ্কার নীল আকাশের উপর একটা প্রকাণ্ড বড় D অক্ষর ফুটে উঠ্‌ল। তারপর বুঝলাম, খুব উপরে ছোট একখানা এরোপ্লেন পশ্চাত-ভাগ থেকে বাষ্প বের করে চ'লতে চ'লতে লিখে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আকাশ জুড়ে 'DAILY MAIL' লেখা হ'য়ে গেল। বাতাসের গতি খুব মৃদু ছিল, ধীরে ধীরে মেঘের অক্ষরে এই লেখাটি অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়ে আকাশেই মিশে গেল। এটা হল এখানকার 'ডেলি মেল' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের একটা বিজ্ঞাপন মাত্র।

এখানে সব কাজেই লোকের বেশ স্ফূর্ত্তি দেখতে পাই। শনিবার বিকালটা বড়ই আনন্দের। শুক্রবারে লোকে বেতনের টাকা পায়, শনিবারে ভাল খায়দায়; অনেকে আমোদ-উৎসব, খেলাধূলা, নাচগানে কাটায়। লোকের বেতন এখানে সপ্তাহ হিসাবে।

গত রবিবারে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র সেন মহাশয়ের আহ্বানে নববিধানীয় উপাসনা দেখতে গিয়েছিলাম। নির্ম্মলবাবু এবং একটি বৃদ্ধা বিদুষী ইংরেজ মহিলা কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ধর্ম্মমতের আলোচনা করলেন। আমরা ভারতীয় লোক পনের-ষোল জন ছিলাম। তার মধ্যে কুচবিহারের রাজপরিবারের মেয়েরাও ছিলেন। একটি সুন্দর বাংলা গান হ'ল, রবীন্দ্রনাথের—"কবে আমি বাহির হ'লাম তোমার গানে, সে-ত' আজকে নয়, আজকে নয় * *"। নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজী ভাবের মধ্যে বাংলা গান—সে বড়ই মিষ্টি লেগেছিল। সভা ভঙ্গের পর নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেনের সঙ্গে এবং আর আর মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। আমাদের মাতৃমন্দির পত্রিকার সম্পর্কে পরিচয়টা অতি সহজেই ঘনিয়ে উঠ্‌ল। বেলা এগারটায় গিয়েছিলাম, তিনটেয় বাসায় ফিরলাম।

বিকাল পাঁচটায় এ-বাড়ীর একটি এগার বছরের ছেলের সঙ্গে কুইন্স-

পার্কে বেড়াতে বের হ'লাম। রবিবারে এখানকার পার্কগুলিতে খুব লোক হয়। আমাদের বাসার আধ মাইল দূরে এই পার্কটি, খুব বড় নয়, তবু চারদিক ঘিরে প্রায় এক মাইল। এখন গরম কাল, তাই বড় ফুলের বাহার। এদেশে ফুলের ব্যবহার একটু উল্টো ধরণের। ফুল আমাদের দেশে দেবতার পূজোয় লাগে, আর এদেশে ফুল নিয়ে লোকে আনন্দ উপভোগ করে—ঘর সাজায়, টেবিল সাজায়, কেউ বুকে পরে, মেয়েরা কেউ কেউ টুপিতে পরে। ফুল এখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। এজন্য ফুল-ব্যবসায়ীদের পৃথক বাগান আছে। আশ্চর্য্য এই যে, পার্কের ফুলগুলি একটাও কেউ ছেঁড়ে না। বাগানটিতে এক ঘণ্টা বেড়াবার পর বাগানের ছেলেদের নিয়ে নানা গল্প আরম্ভ ক'রলাম। দেখতে দেখতে অনেক ছেলেমেয়ে জ'মে গেল। নতুন দেশের মানুষ পেলে এখানকার ছেলে-মেয়েদের বড় আনন্দ হয়;—কথার পর কথা, জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরলাম। অনেক ছেলে আমাদের বাসা পর্য্যন্ত এসে তবে ফিরল। এই রকম করে প্রত্যেক রবিবারটা বিভিন্ন স্থানে বেড়াই।

আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এ-বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে খানিকটা গল্প করি। আজকাল রামায়ণের গল্প ধারাবাহিক ভাবে শোনাচ্ছি। প্রতি দিনই সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েরা গল্প শোনবার জন্য হাজির হয়। এতে আমার কথিত ভাষা শিখবারও সুবিধা হয়। এদের সঙ্গে গল্প করবার সময় আমার দেশের ছেলেমেয়েদের কথা বড় মনে পড়ে। বিলাতের ডাক কলকাতা থেকে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে রওনা হয়, ঊনিশ দিনের দিন সোমবারে লণ্ডনে পৌঁছে। সপ্তাহে সপ্তাহে তোমাদের খবর পেতে আশা করি।

বেঙ্গল কোর্ট, ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ন
বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন, ১০।৭।২৪

ক সপ্তাহ তোমাকে চিঠি দিতে পারি নি, বড্ড কাজে লেগে গিয়েছি। এপ্রিলের মধ্যভাগে একজিবিশন আরম্ভ হয়েছে, এ পর্য্যন্ত কেবল গড়েই উঠছে। আড়াই মাস কাল আমি আমাদের ষ্টলের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জুয়েলারী বিভাগে তত্ত্বাবধান করলাম, এতে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা বেতনও যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে এঁরা আমাকে দিয়েছেন। এখন আমাদের নিজেরই অনেক কাজ বেড়ে গেছে তাই সরকারী কাজটুকু ছেড়ে দিয়েছি। আরও ছ'টি মেয়েকে আমাদের ষ্টলের অলঙ্কার বিক্রির কাজে নিযুক্ত করেছি। এদের প্রত্যেককে সপ্তাহে আড়াই পাউণ্ড বেতন আরও যাতায়াত ব্যয় দিই। প্রায় চারিশত টাকা মাসিক এদের দুজনের জন্য আমার খরচ হয়। আমাদের ষ্টলের দৈনিক বিক্রি এখন গড়ে তিনশো টাকা। বেঙ্গল কোর্টে আমাদের ষ্টলটাই বেশী সুন্দর হয়েছে। সমগ্র ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নে আমরা তৃতীয় দাঁড়িয়েছি।

একজিবিশন ক্রমেই জোর হয়ে উঠছে। আজকাল দৈনিক গড়ে তিন লক্ষ লোক একজিবিশন দেখ্‌তে আস্‌ছে। আমাদের ষ্টলের সম্মুখে অনবরত পঁচিশ থেকে একশো লোক দাঁড়িয়ে দেখে। আশ্চর্য্য এই যে, তিনভাগের দু'ভাগই স্ত্রীলোক। বৌদিদির দুর্ব্বা-বিল্বপত্রাঙ্কিত আশীর্ব্বাদ-পত্রখানি পেয়ে সুখী হয়েছি। তাঁর পত্রে জানলাম, আমার যাত্রার দিন থেকে তুমি নাকি ঘট পেতে কি পুজো আরম্ভ করেছ, অনেক সময় বসে বসে কি ভাবনা কর নাকি! মঙ্গলঘট পেতেছ, ভগবানের স্মরণ করে পূজো করছ, সে ভাল কথাই কিন্তু ভাবনা আবার কিসের? আমি কিন্তু আপন আনন্দে আপনিই মগ্ন রয়েছি, আশা করি তুমিও ভগবানে নির্ভর করে নির্ভাবনায় থাকবে।

একদিন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের স্ত্রী কুইন মেরী একজিবিশন দেখতে এসে আমাদের ষ্টলে এসেছিলেন। আমাদের কয়েকটি অলঙ্কার হাতে করে দেখলেন, প্রশংসাও করলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ দু'দিন একজিবিশনে এসেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে দেখি নি। কিছু দিন আগে এঁর কন্যা আমাদের ষ্টলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, চারদিক থেকে লোক এল তাঁকে দেখ্‌তে; একটুকু সময় দাঁড়িয়েই তিনি চলে গেলেন। একদিন স্পেনের রাণী আমাদের কাছ থেকে আর্মলেট কিনে হাতে পরে গেলেন। একদিন ডেনমার্কের রাজা এসেছিলেন,—লম্বা ঢেঙা বলিষ্ঠ মানুষটি, সাদাসিদে পোষাক; সঙ্গে তিন-চারটি লোক মাত্র। আমাদের বেঙ্গল কোর্টে আসতেই অনেক লোক তাঁকে দেখতে এল; আমাদের কোর্টের একটি মেয়ে সামনে পকেট-ক্যামেরা ধরতেই তিনি বললেন "ও, তুমি বুঝি ফটো নেবে? আচ্ছা নিয়ে নাও, একটু শীঘ্র করে।" দেখলাম রাজার কোন মান অভিমান নাই।

এপ্রিলের মধ্যভাগে একজিবিশন আরম্ভ হয়েছে, এই তিনটি মাস আমাদের ষ্টলে বিশেষ বিক্রি হয়নি। আমাদের 'বীণাপাণি শাঁখা' প্রভৃতি যা এনেছিলাম, তা দেখে এরা প্রশংসা করল বটে, কিন্তু হাতে গয়না পরা এরা পছন্দ করেনা, তাই শাঁখার পরিবর্ত্তে চাইল তাগা। তাগার নাম এদের Armlet. এখানকার আবশ্যক গহনার জন্য দেশে টেলিগ্রাম করতেই আমাদের কলকাতার দোকান থেকে প্রচুর আর্মলেট, সেফ্‌টিপিন, পেন্‌ড্যাণ্ট, হাতির দাঁতের মালা প্রভৃতি তৈরী হয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে আসছে। হাতির দাঁতের তৈরী অনেক রকম হাতি, রথ, নৌকা, গরুর গাড়ী, এবং কালী, দুর্গা, শিব, রাধাকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি অনেক রকম দেবদেবী এসেছে। বুদ্ধমূর্ত্তি খুবই বিক্রী হচ্ছে। বুদ্ধদেবকে সারা জগতেই সম্মান করে।

যে দুটি মেয়ে আমাদের কাজ ক'রছে, তারা বড়ই বিশ্বস্ত। এরা

ছাড়া ইমেলী প্রতি শনিবারে আমার সঙ্গে এসে আমাদের কাজের সাহায্য করে। বয়স মাত্র বারো, কিন্তু বেশ সুচতুর মেয়ে। শনিবারে ইমেলীদের স্কুল বন্ধ থাকে, এদিন একজিবিশন লোকে লোকারণ্য হয়। ইমেলী আমাকে Uncle বলে ডাকে, তাই বেঙ্গল কোর্টের সব মেয়েরই আমি Uncle হয়ে গিয়েছি। আমাদের একটি পাথরের তাজমহলের একটি থাম ছিল ভাঙ্গা, তাই বিক্রি হ'চ্ছিল না, ইমেলী তার গায়ে সুন্দর করে লিখে দাম কমিয়ে নোটিশ দিল—**The finest and richest building in the world, reduced to 15 shillings.** ইমেলীকে দিয়ে আমার খুব সাহায্য হয়। তোমার কথাই কেবল মনে প'ড়ছে। তুমি আস্‌তে চেয়েছিলে—আমি আনলাম না। এলে কত সাহায্যই যে হ'ত আমার—তা বলে শেষ নেই। এত দেখা শুনার আনন্দটাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হত। প্রদর্শনীর ষ্টেডিয়মে যেদিন বাজি পোড়ানর Competition হল, সেদিন দেখে দেখে আনন্দ আর প্রাণে ধরে না। তারপর যখন মনে হল একা-একাই দেখছি, আমার এ আনন্দের সহভাগী কেউ নেই, তখন আবার গভীর দুঃখে মন ভ'রে উঠ্‌ল।

একদিন ছিল এরোপ্লেনের কৃত্রিম যুদ্ধ। সন্ধ্যাকালে চারদিক থেকে কত এরোপ্লেন এল ; তাদের আকাশ জুড়ে ঘোরাফেরার তর্জ্জন গর্জ্জনে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল। কখনো অতি দ্রুত, কখনো অতি ধীর, কখনো সোজা উর্দ্ধমুখী, কখনো সোজা নিম্নমুখী, কখনো কাৎ হয়ে, কখনো চিৎ হয়ে—কত রকমেই এরোপ্লেনের খেলা দেখানো হল। সন্ধ্যার পর তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হল। কী ভীষণ বোমা ছোড়ার শব্দ! বিদ্যুৎ চমকানোর মত আকাশ এক-একবার আলোকময় হয়ে উঠছিল। দু-একটা এরোপ্লেনে তীব্র সার্চ্চলাইট দেওয়া ছিল, তার আলোতে কখনো কৃত্রিম বিপক্ষীয় এরোপ্লেন, কখনো আকাশের মেঘ আলোকিত হয়ে

উঠছিল। ক’একখানা এরোপ্লেনের সারা গায়, পাখায় অসংখ্য বিদ্যুৎ আলোকের বাতিতে মণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। তার কোনখানা লাল, কোনখানা নীল, কোনখানা সবুজ, কোনখানা বেগুনে।

লাল এরোপ্লেনখানি বিপক্ষের প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করেই আলো নিবিয়ে দিল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই বহুদূরে গিয়ে লাল হয়ে ফুটে উঠলো। এইমত পর পর নানা প্রকার যুদ্ধ কৌশল দেখাল। ঐ যাঃ! বিপক্ষের বোমার আঘাতে একখানি এরোপ্লেন ভেঙ্গে আমাদের মাথার উপর পড়ছে, দর্শক আমরা সব ভয়ে কম্পমান; এখনি সর্ব্বনাশ হবে—বাহবাঃ, এই যে আমাদের মাথার কাছে এসে ধাঁ করে উপরে উঠে গেল! কত কি আর লিখব।

একজিবিশনটিতে সারা জগতের যা-কিছু আশ্চর্য্য, তার অনেক দেখা হল। বিভিন্ন দেশের কত কি-ই যে দেখলাম। আমাদের দেশের কাছের তিব্বতের নাচ, বর্ম্মা মেয়েদের নাচ, মান্দ্রাজী ভোজবাজি, লঙ্কার মণিমুক্তা—এসবও এখানে বসেই কত কি দেখ্‌ছি। আমাদের ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নের পাশেই একটা মস্ত বড় ভারতীয় ভোজনাগার হয়েছে। একদিন আমাদের ষ্টলের মেয়েদুটিকে নিমন্ত্রণ করলাম এই হোটেলটিতে। ইমেলীও আমাদের সঙ্গে ছিল, তাকে নিয়ে আমরা চার জন। ভারতীয় ধরণে খাওয়া হবে—সন্দেশ, রসগোল্লা, অমৃতি, গজা কত-কি ছিল, কিন্তু আমাদের সবাকার মনোনীত হল একটু করে পোলাও আর একটু করে হরিণের মাংস, তারপরে একটু আমের মোরব্বা। অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু কেউ বেশী কিছু আর খেল’ না। ঘরেই হোক, আর বড় বড় নিমন্ত্রণেই হোক, এরা পেটপূরে কখনো খায় না। খাবার সময় বেশ আমোদের গল্প আপনিই এসে জোটে এদের।

আমাদের ষ্টলটি বাংলার ধরণে সাজানো হয়েছে। আবার জোন্স বলে যে মেয়েটিকে একখানি পার্শী সাড়ী দিয়েছি, বেশ সুন্দরী বাঙ্গালী

মেয়ের মত মানিয়েছে তাকে। তারপর বাংলার হাতী ঘোড়া রথ নৌকা দেবদেবী দিয়ে ষ্টলটি সাজানো হয়েছে। বেশ সুন্দর হয়েছে আমাদের ষ্টলটি। আরও তিনটি মাস একজিবিশন থাকবে, নভেম্বরের প্রথমে বন্ধ হবে। দেশে গিয়ে তোমাদের একজিবিশনের খবর শোনাবো।

একজিবিশন সম্বন্ধীয় ছবি, মানচিত্র, বই কিছু কিছু তোমাদিগকে পাঠিয়েছি, এবার ছবি আঁকা রুমাল, টেবিল ক্লথ কয়েকখানা এই ডাকে পাঠাচ্ছি ; এগুলি একজিবিশনের স্মৃতি ব'লে যত্নে রেখে দিয়ো।

১৮, এডেলাইড্ রোড, লণ্ডন।
২২শে আশ্বিন, বিজয়াদশমী, ১৩৩১

আজ বিজয়ার দিনে সুদূর প্রবাস থেকে তোমাদিগকে বড়ই মনে প'ড়ছে। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। দেশের ছোট বড়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকেই আজ মনে প'ড়ছে। এই শরতের দিন—দেশের ধানের ক্ষেত, পদ্মের বন, শেফালী কুঞ্জ—এ দেশে কল্পনায় আনাও দুঃসাধ্য। দেশের পকেট ডাইরী বই একখানি সঙ্গে আছে, তাই বাংলা দিন কালের খবর রাখি।

এপ্রিলে এখানে পৌঁছেছিলাম তখন বৈশাখের প্রথম। এসে দেখি তখনও এখানে শীতকালের জের রয়েছে ; বেলা ন'টা পর্য্যন্ত কুয়াসায় পথ-ঘাট ঢাকা থাকত। এখন এই আশ্বিন মাস—এখনও আমার শোবার বিঁছানায় দুটো লেপের কমে চলে না। সূর্য্যদেব দক্ষিণের এক কোণে উঠে কোণেই অস্ত যান, তাও মেঘ বৃষ্টির দিনে দর্শন মেলে না। আকাশ ভরা জলকো মেঘ আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি প্রায় লেগেই আছে। শুনে আশ্চর্য্য বোধ করবে আজকাল এখানে আঠার ঘণ্টা দিন আর ছ'ঘণ্টা মাত্র রাত্রি।

জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে পূরো শীতের দিনে হবে ঠিক এর উল্টো। এ-দেশের নতুন কথা শুনতে চেয়েছ, কোন্‌টা লিখব আর কোন্‌টাই বা না লিখব।

কাল দেখলাম স্বামী স্ত্রীতে চলেছেন ; পথে স্ত্রীর পায়ের জুতোয় একটুখানি কাদা লেগে গেল। স্বামী বেচারী তখন নিজের পকেট থেকে ধবধবে সাদা রুমালখানা বের করে স্ত্রীর পা ধরে যত্নের সঙ্গে কাদা মুছে দিল। তারপর দু'জনে মশ্ মশ্ করে চলল। আমরা যদি কালে ভদ্রে কখনো তোমাদের পায়ের কাঁটা তুলে দিয়েছি, তবে একটা প্রণাম ত পেয়েছি নিশ্চয়ই, এদের ও-রকম কিছুই নেই।

গত রবিবারে বিশ মাইল দূরে **'Harrow on the Hill'** নামে একটা পাহাড়ে' অঞ্চল দেখতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের উপর বেশ নির্জ্জন মনোরম স্থানটি। উপরে একটা মস্ত বড় গির্জ্জা ঘর আছে, তার গায়ে কাঁচের জানালায় প্রাচীন শাস্ত্রীয় বহু রঙিন ছবি আঁকা রয়েছে। অনেক দূর থেকে গির্জ্জার চূড়াটি দেখা যায়। স্বাস্থ্যকর স্থান বলে একটা ভাল স্কুল আর তার সঙ্গে বড় বোর্ডিং আছে। খুব কুয়াসার দিন ছিল, সারাদিন সেই কুয়াসার মধ্যে ঘুরলাম। এতে ঠাণ্ডা লাগে বটে কিন্তু অসুখ করে না। পাহাড়ের উপর থেকে গ্রামের মধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দু'ধারে গাছের শ্রেণী, গাছের হলুদ রঙের পাতাগুলি সমান ভাবে প'ড়ে রাস্তাটি রঙিন হয়ে রয়েছে। রাস্তার দু' পাশের ঘাসের জমী বাঁকা বাঁকা ইট দিয়ে সীমানা করা, ঘাসের জমি থেকে পাতাগুলি যত্নে কুড়িয়ে এনে রাস্তার উপর দেওয়া হয়েছে ; রাস্তাটি যেন হলুদ রঙের গালিচায় মোড়া।

বিদেশে তুমি আমাকে খুব হুসিয়ার থাকতে লিখেছ, বিশেষতঃ টাকাকড়ি সম্বন্ধে। হুসিয়ার অবশ্য থাকতেই হবে, তবে দেশের ব্যবস্থার কথা তোমাকে একটু শোনাই। সেদিন এক বৃদ্ধ ইংরেজের কাছে শুনলাম, তাঁর একগাছি উৎকৃষ্ট লাঠি তিনি লণ্ডনের পথে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

Lost Property officeএ খবর দিতেই আফিস থেকে তাঁর ডাক পড়ল। তারপর হারানো জিনিসের গুদামে লাঠি বিভাগে গিয়েই দেখলেন—সারি সারি সাজান হারানো লাঠি নম্বর দেওয়া রয়েছে, তার মধ্যে তাঁর গাছটিও পাওয়া গেল।

প্রদর্শনীতে ভারতীয় একটি দোকানদারের প্রতি একজন ইংরেজ একটু কটু কথা প্রয়োগ করেছিল। আশে পাশে অনেক ইংরেজ ছিল, তারা এই ইংরেজটির অন্যায় হয়েছে বলে স্বীকার করল। ভারতীয় দোকানদারটি তাকে বলল—"তোমার এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।" ইংরেজটির সঙ্গে তার স্ত্রীও ছিল, তারা দু'জনে পরামর্শ করে বলল, বাড়ী গিয়ে পত্র দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থনা জানাবে। তারা ঠিক ক্ষমা চেয়ে পত্র দিয়েছিল।

সেদিন বিকেলে একটা সুন্দর ছোট পার্কে বেড়িয়ে এলাম। পার্কের দরজার বাইরে দেখলাম একটা লোক সদর রাস্তার উপর একা একা চেঁচিয়ে ধর্ম্মের বক্তৃতা দিচ্ছে, শোনবার লোক একটাও নেই। ভাবলাম, লোকটা পাগল নাকি? ব্যাপারটা বোঝবার জন্য তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি একাই হলাম তার শ্রোতা। সন্ধ্যা হয়েছে—পার্কের লোক দু' একটা করে বেরুচ্ছে,—চলতে চলতে তার দু'এক কথা শুনে যাচ্ছে। দুষ্ট ছেলে দু'একটি তার বক্তৃতার দু'এক কথার বিকৃত অনুকরণ করে তামাসা করছে। তারপর বাগান থেকে যখন বেশী লোক বের হল, তখন তাদের মধ্য থেকে দু-চারজন দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বহু লোক দাঁড়িয়ে তার ধর্ম্ম-বক্তৃতা শুনল। তার বক্তৃতার কথাগুলি ছিল ছোট ছোট, যারা পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল দু-একটা উপদেশের কথা তাদের কাণেও ঢুকছিল।

সেদিন অলিম্পিয়ার বার্ষিকমেলার উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। ছেলেদের নিয়ে আমোদ-উৎসব দেখতে আমার কত আনন্দ তা ত জানই। যাবার সময় আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা বড়ই মনে পড়ছিল। পথে

পিকাডিলির একটা ভোজনাগারে খেতে বসেছি, দেখলাম ন' বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে—হোটেলের কর্ত্তার। কর্ত্তাকে বললাম,—অলিম্পিয়ায় যাচ্ছি, তোমাদের খুকীকে আমার সঙ্গে নিতে দেবে? হোটেলওয়ালা আমার পরিচয় জেনেই মেয়েটিকে উপরে তার মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে পাঠাল। কয়েক মিনিট পরেই দেখি, তার ছোট ভাইটিকেও সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি সেজেগুজে এসে হাজির। সহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে তাদের নিয়ে উৎসবে গেলাম। নাগরদোলা, ঘোড়া-কল কতই রকমে রকমে; সার্কাস জীবজন্তুর খেলা, বাজি পোড়ানো, আগুনের খেলা—কতই অদ্ভূত রকমের দেখা গেল। খরচ হল আমার ষোলটাকা। সেদিনকার উৎসবটিতে এই ছেলেমেয়ে দুটি নিয়ে বড়ই আনন্দে কাটালাম।

লণ্ডনে আমোদ উৎসব লেগেই আছে। ভাল কিছু দেখতে পেলে আনন্দ হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা দুঃখও হয় আপনার জনকে না দেখাতে পেরে। সকল রকমে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ভগবানের কলমে লেখেনি। * *

আমি এখন নিজেই একটি বাসা করে আছি। চিঠিপত্র খুব বেশী বেশী করে লিখো, তোমাদের চিঠিপত্রগুলোই আমার এই বিদেশের প্রিয় সঙ্গী।

১৮, এডেলাইড্ রোড,
লণ্ডন, ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৪

তোমার ২৫শে অক্টোবরের চিঠি কাল পেয়েছি। এবার এই ডাকে দেশের বন্ধু বান্ধবের এত চিঠি পেয়েছি যে, সবগুলির উত্তর দেওয়ার সময়ই হবেনা। তোমার পত্রে দেখলাম, এখানে দিনের মধ্যে কতবার ঠকি আর সাহেবদের কাছে কতবার বকুনি খাই তার হিসাব চেয়েছ। মানুষ সব চেয়ে বেশী বকুনি খায় গৃহিণীর কাছে, সেখানেই যখন ওটা আমার ভাগ্যে জোটেনা, তখন অন্যখানে আর আশা করতে পারি কেমন

করে ? তবে এই বিঘোর বিদেশে কোন কোন কাজে যে ঠক্‌তে হয়না— এমন বলা চলেনা।

প্রথম এখানে এসে যখন একটা বড় হোটেলে ছিলাম, তখন প্রথম দিনেই স্নানের ঘরে স্নানের জল গরম করবার গ্যাসের পাইপ নিভাতে গিয়ে ভুল করে এমন একটা কল খুলে ফেলেছিলাম যাতে হোটেলের উপর তলাকার রান্নার চুলো পর্য্যন্ত নিভে গিয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্নানের ঘরও হিম জলে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল। উপরকার লোক ছুটে এল তখনি আমার স্নানের ঘরে। আমি ত লজ্জায় মরি ; লোকটা কিন্তু কোন কিছুই না বলে কলটি ঠিক করে দিয়ে চলে গেল।

প্রথমে এখানে বিলাতী টুপি প'রতাম না। মান্দ্রাজী ধরণের টুপী—যা দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম তাই প'রতাম। একদিন ঝিমঝিমে বৃষ্টিতে চলছি আর টুপীর জল চোখ মুখ বেয়ে পড়ছে—তিনটি যুবতী একত্রে চলছিল— তারা আমার এই দশা দেখে হেসে ফেলল। পরদিনই এখানকার প্রচলিত ফেল্টের টুপী কিনলাম। তাতে বৃষ্টির জল পিছন দিকে গড়িয়ে পড়ে যায়।

এদেশের মেয়েদের সঙ্গে খুব মেশামেশি করি জেনে তুমি ইঙ্গিতে আমাকে একটুকু ঠাট্টা তামাসা করেছ। এটা খুব সত্যি কথা, আমাদের দেশের অনেক যুবক এখানে এসে মেম্ বিয়ে করে রয়েছে। কিন্তু যারা করেছে তারা যে বড় ভুল করেছে, তাদের গার্হস্থ্য জীবন থেকে তা বুঝতে পারে।

এদেশের মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক কথা উঠে থাকে। কিন্তু এখানে যতদূর দেখছি, তাতে বোঝা যায় মন্দের খবরটা আমাদের দেশে একটু অতিরঞ্জিত হয়েই পৌছায়। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই সর্ব্বত্র সমান গতিবিধি বটে, মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে নাচঘরে একত্র নাচেও বটে, তথাপি এদের কোন মন্দের লক্ষণ দেখা যায়না। আমি এ দেশের বুড়ো অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা করেছি, যুবক যুবতীদের যেভাবে মিলতে

দেওয়া হয় তার দ্বারা সমাজের কু-ফলের আশঙ্কা আছে কিনা। অধিকাংশ স্থলেই উত্তর পেয়েছি—'যেখানে মন্দের আশঙ্কা আছে সেখানে অভিভাবকরা বাধা দিয়ে থাকেন।' বেশ বুঝলাম, অপ্রত্যক্ষে এরও একটা শাসনের ব্যবস্থা আছে। তুমি বোধ হয় অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস কর, আমি কোন মন্দ সংসর্গে যোগ দিই না। এদেশে অনেকেই একটু আধটু মদ খায়, বিশেষতঃ শীতের দিনে। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ সত্ত্বেও কোনদিন আমি ওটা স্পর্শ করিনি।

এখানে কি খাই দাই, কি ভাবে চলিফিরি—অনেক জানতে চেয়েছ। আমার বিশেষ কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আজকাল সকাল সকাল ন'টার মধ্যে ষ্টোভে দুটো ভাতেভাত করে খাই, সঙ্গে একটু গরম দুধ খাই।

আমাদের বেঙ্গল কোর্টের ঘোষ বাবু একদিন আমাকে বলছিলেন—মিষ্টার নন্দী, আপনি নিজে হাতে রান্না করে খান, এতে আমাদের বড় লজ্জা করে। আমি আপনাকে অবস্থাপন্ন গণ্যমান্য লোক বলে এদের কাছে জানিয়েছি, এতে এরা মনে করতে পারে আমাদের বাঙ্গালী ধনীরাও বুঝি নিজ হাতে রান্না করে খায়। আমি বললাম, কেন আপনি আমাকে বড় লোক বলে পরিচিত করতে গেলেন? আপনাদের জমিদারীর একজন প্রজা বললেই ত সব দিক শোভন হত।

এখানে দুধ, পাউরুটি, চাউল, আলু, মাখম, চিনি প্রভৃতি সাধারণ খাদ্যগুলি যাতে সকলেই কম দামে পেতে পারে সরকার থেকে তার ব্যবস্থা করা আছে। এজন্য এই দুর্ম্মূল্যের দেশেও এগুলির দাম আমাদের দেশের চেয়ে খুব বেশী নয়। এক পাউণ্ড ওজন বললে আমাদের দেশের প্রায় আধসের বোঝায়। এই এক পাউণ্ড বা আধসের পরিমাণ জিনিসের দাম—দুধ চার আনা, পাউরুটি তিন আনা, চাউল চার আনা, আলু তিন আনা, চিনি চার আনা। ডিম, মাংস প্রভৃতি আমাদের দেশের চেয়ে তিন

চারগুণ বেশী দাম। কলা, কমলালেবু, আঙ্গুর, আপেল প্রভৃতি পাঁচ-ছয়গুণ দাম বেশী। এছাড়া বহু রকমের তৈরী খাদ্য আছে সেগুলির দাম খুবই বেশী—তবুও অনেকেই খায়।

মধ্যাহ্নের খাবার এখানে প্রায় সকলেই বাইরে কর্ম্মস্থলে গিয়ে খায়। আমিও তাই খাই। মধ্যাহ্নের হোটেলের খাবার সাধারণতঃ স্যুপ, মাংস, সিদ্ধ তরকারী, রুটি, পুডিং, কেক, বিস্কুট, ফল, বাদাম প্রভৃতি। রাত্রিতে কখনো হোটেলে, কখনো ঘরে রান্না করে খাই। এদেশে পোলাওএর মত একটা গরীবয়ানা রান্না আছে, রাত্রিতে প্রায়ই আমি তাই করি। এতে একপোয়া ভেড়ার মাংস, এক ছটাক চাউল, আধপোয়া আলু, তার সঙ্গে দু-একটা পিঁয়াজ এক সঙ্গে সিদ্ধ করে মাখম, গোলমরিচের গুঁড়া ও নুন মিশিয়ে খাই। তোমরা নিশ্চয় হাসবে—এ রকম খাওয়ার কথা শুনে।

আজ এই পর্য্যন্ত।

এস, এ, হোষ্টেল
৮৩.জ্যামেকা রো, বার্ম্মিংহাম।
৭ই জানুয়ারী, ১৯২৫

তোমার ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের লণ্ডনে প্রেরিত পত্র, বার্ম্মিংহামে এসে আমার হাতে পৌঁচেছে। কতদিনে দেশে ফিরব, দেশের বন্ধু-বান্ধবেরা অনেকেই তা জানতে চেয়েছেন; এবার তোমার চিঠিতেও সেই কথা। কিছুকাল স্কট্‌লণ্ড্ ও আয়র্লণ্ডে কাটিয়ে দু'সপ্তাহ হ'ল বার্ম্মিংহামে এসেছি। এখানে একটু দীর্ঘ দিন থাকতে ইচ্ছে আছে। শিল্প সম্বন্ধে কিছু দেখে যাব,—বার্ম্মিংহাম শিল্প বাণিজ্যের অতি প্রকাণ্ড সহর।

বড়দিনের আমোদ উৎসব এখানে দেখলাম—এক একটি দোকান কি সুন্দর সাজানো হয়েছে; কত রকমেই আলো দেওয়া হয়েছে তাতে। আমাদের হোষ্টেলের পার্শ্বেই একটা প্রকাণ্ড ছ'পেনীর দোকান, অর্থাৎ

তার অধিকাংশ জিনিসের দামই প্রতিটা ছ' পেনী করে। ঘরটিতে ষাট-বাষট্টিটি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগে অনবরত ছু'টি করে মেয়ে জিনিস বিক্রী করছে। এই রকম প্রায় সওয়াশো'র উপর মেয়ে এই দোকানের বিক্রীর কাজে নিযুক্ত রয়েছে। একবার ভেবে দেখ—কত বড় দোকানটি আর কি পরিমাণ তার বিকিকিনি।

সেদিন গরীব ছেলেমেয়েদের বড়দিনের উৎসব-সভা দেখলাম। সাড়ে তিন হাজার ছেলেমেয়ে এসেছিল। বার্মিংহামের সমস্ত স্কুলগুলির গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য নিমন্ত্রণের কার্ড দেওয়া হয়েছিল, যারা ঠিক গরীব তারাই ঐ কার্ড পেয়ে এসেছিল। আমি এক শিলিংএর টিকিট কিনে দর্শক হয়ে প্রবেশ করেছিলাম। প্রোগ্রামে দেখলাম, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রদ থিয়েটার, ম্যাজিক বা ভোজবাজি, বক্সিং বা ঘুসিখেলা, অস্ত্র-খেলা, নাচগান—অনেক রকমের আয়োজন আছে। সহরের নামকরা ছোট ছোট গায়ক গায়িকাদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—তাদের নাচগান করবার জন্যে। তাদের যোগ্যতা অনুসারে প্রাইজ দেওয়া হল। আমি ত দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ব্যবসায়ী থিয়েটার ওয়ালাদের চেয়ে স্কুলের ছেলেমেয়েদের এই উৎসবটি আমার ঢের ভাল লাগল। আমোদ প্রমোদের শেষে ছেলেদের জলযোগ হল। চা খাবার জন্যে যে এ্যালু-মিনিয়মের গেলাস ছিল, সেগুলি তাদের একেবারেই বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে। সভা ভঙ্গের পর তাদের একে একে বের হবার পদ্ধতি দেখলাম—বড়ই সুনিয়ন্ত্রিত। তারপর বের হবার পথে প্রত্যেকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে একটি করে থলি পেল। তার মধ্যে নানা রকমের কেক, বিস্কুট, ফল, রুমাল, জলছবি, আয়না, চিরুণী, সুগন্ধি দ্রব্যাদি ভরা ছিল। এই উৎসবটি প্রতি বৎসরেই হয়ে থাকে সহরের কি নাম এক সর্ব্বপরিচিত 'খুড়ো'র দেওয়া টাকায়। এই রকম গরীবদের জন্য অনেক সুব্যবস্থা আছে।

শীত ক্রমেই বেশী পড়ছে। কাল সারা দিন বরফ পড়েছিল। কখনো গুঁড়ো বৃষ্টির মত বিন্দু বিন্দু করে, কখনো কুয়াসা হয়ে উড়ে গাছপালার গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। কখনো কখনো এতই বরফ পড়ে যে বাড়ীঘর পথঘাট ঢেকে একেবারে সাদা হয়ে যায়। বরফের দিনে বুড়োরা ঘরের মধ্যে লুকোয়—আগুনের কাছে, আর ছেলেমেয়েরা বাইরে এসে বরফের উপর ছুটোছুটি খেলা করে, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ দুহাতে তুলে চেপে বল তৈরী করে গায়ে ছোড়াছুড়ি করে; একে বলে Snow Ball খেলা।

এখানে এসে এক বুড়ীর বাড়ীতে ছিলাম এক সপ্তাহ। বাড়ীখানিতে সে আর তার স্বামী থাকে। সদর দরজায় তাদের দর্জ্জির কারখানা। স্বামী দর্জ্জির কাজ করে, বুড়ী ঘর আর কারখানা সব দিকে কর্ত্রীত্ব করে। বুড়ী লেখাপড়া জানেও বুড়োর চেয়ে ভাল। এদের অবস্থা আগে ভাল ছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময় বাড়ীঘর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বুড়ী যখন যুদ্ধের কথা আর উপর থেকে আগুন গোলাগুলি পড়ে তাদের বাড়ীখানি ধ্বংস হবার বিবরণ আমাকে শোনাত, তখন চ'খে তার জল ঝ'রত।

আজকাল এই হোটেলটিতে আছি, গৃহস্থ বাড়ীতে থাকার চেয়ে কম খরচে চলছে। বার্ম্মিংহামে আমার কিছু বেশী দিন থাকতে ইচ্ছা আছে। এখানকার কলকারখানা গুলোর কিছু কিছু দেখবার জন্যে। এখানকার কারখানা-ওয়ালা প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সৌজন্যে আপনাআপনিই মন এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কত হিজিবিজিই না তোমাকে লিখলাম, জানি না এসব তোমার কেমন লাগবে। বার্ম্মিংহামের কাজ শেষ করেই আবার লণ্ডনে যাব, তার পরেই হয়ত দেশে ফিরতে হবে। মনে রেখো কোন বিলাতী উপহার তোমাদের জন্য নেওয়া হবে না। তবে নেব কিছু কিছু ছোট ছোট গৃহশিল্পের যন্ত্রপাতি— তাই হবে তোমাদের উপহার।

পরিশিষ্ট

আমি আমার এই গরীবয়ানা ভ্রমণের মধ্য দিয়ে বিদেশ ভ্রমণকারীর জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে যা যা আবশ্যক মনে করেছি সংক্ষেপে তার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করব।

ভারতের বাইরে যে কোন স্থানে যেতে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আফিস থেকে পাসপোর্ট (অনুমতি পত্র বা নিদর্শন পত্র) নিতে হয়। অন্ততঃ এক মাস আগে থেকে তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ব্রহ্মদেশ, মায় সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যেতে পাসপোর্ট আবশ্যক হয় না।

কয়েকটি কোম্পানী আছে, তারা ভ্রমণকারীদের পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণের সুব্যবস্থা করে দেয়; তথাপি নিজের বন্দোবস্তে যাওয়াই ভাল। ঐ সব কোম্পানীর মধ্যে **Thomas Cook & Sons** এর কাজ খুব প্রসারিত। এদের আফিস ও ব্যাঙ্ক সমগ্র পৃথিবীর অনেক বড় বড় সহরে আছে।

কলকাতা থেকে লণ্ডন জাহাজ ভাড়া সিটি লাইনে খোরাক সমেত দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৫২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাতশত টাকা এবং দুই বৎসরের রিটার্ণ টিকিটে ৭৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক হাজার টাকা। করাচী, বম্বে, কলম্বো থেকে যেতে কম ভাড়ায় পৃথক লাইন আছে।

খরচের জন্য সামান্য পরিমাণ টাকা সঙ্গে রেখে বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে তা থেকে আবার কিছু টাকার **Letter of credit** বা **Travellers' cheque** কিনে নেওয়া বিশেষ সুবিধাজনক। এতে টাকা হারিয়ে যাবার বা চুরি হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। অথচ সব বড় বড় সহরের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা নেওয়া চলে।